আল্লামা জামাল আল বাদাবী'র

# ইসলামের সামাজিক বিধান

(ইসলামী শিক্ষা কোর্স সিরিজের তৃতীয় ভল্যুম)

অ নু বা দ

ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ

ড. শারমিন ইসলাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# দি পাইওনিয়ার-এর উপদেষ্টার কথা

ইসলামের সামাজিক শিক্ষার পরিধি অনেক ব্যাপক। এ ব্যাপকতার তুলনায় যথেষ্ট আধুনিক ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়নি। তবে অল্প হলেও ইসলামের সামাজিক বিধানের উপর এমন কিছু বই রচিত হয়েছে যেগুলো এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা প্রসারে অনেক অবদান রেখেছে এবং এ সংক্রান্ত নানান প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। অনূদিত Islamic Teaching Course Vol (III) এ রকমের একটি বই।

বইটি মূলতঃ ড. জামাল আল-বাদাবী প্রদত্ত ধারাবাহিক বক্তৃতার লিখিত রূপ। এতে তিনি ইসলামের সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থার উপর সবিস্তার আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে ইসলামে নারীর অবস্থান, এ সংক্রান্ত নানান প্রশ্নের সঠিক জবাব, নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

বর্তমান সমাজে ইসলামের অগ্রগতির জন্যে ইসলামে নারীর সঠিক অবস্থান সুস্পষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার, সম্মান ও মর্যাদাদানের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। ড. জামালের বইটি এ ব্যাপারে অনেক বিভ্রান্তি দূর করেছে এবং শিক্ষিত মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ এবং ড. শারমিন ইসলাম সবার জন্য একটি কল্যাণকর কাজ করেছেন। এজন্য তারা ধন্যবাদের যোগ্য। অনুবাদটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় আমি দি পাইওনিয়ার-এর সকল সদস্যদেরকে মোবারকবাদ জানাই।

**শাহ আব্দুল হান্নান**<br>
উপদেষ্টা<br>
দি পাইওনিয়ার, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## প্রকাশকদের পক্ষ থেকে

অবনত চিত্তে মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি যে অনূদিত Islamic Teaching Course Vol (III) প্রকাশের মাধ্যমে সর্বমহলের পাঠকদের সামনে আমরা বইটি উপস্থাপন করতে পেরেছি।

আমরা ড. জামাল আল বাদাবী ও তাঁর লেখার সাথে পরিচিত হই **দি পাইওনিয়ার**-এর উপদেষ্টা ও আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব শাহ আব্দুল হান্নানের মাধ্যমে । তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আমাদেরকে বইটি পড়িয়েছেন এবং অনুবাদ করে সাধারণ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় **দি পাইওনিয়ার**-এর সাবেক সভাপতি ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ এবং **দি উইটনেস**-এর সদস্যা ড. শারমিন ইসলাম বইটি অনুবাদের কাজে হাত দেন এবং আমাদেরকে সুন্দর একটি অনুবাদ উপহার দেন।

এ অনুবাদটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। ইতিপূর্বে **দি পাইওনিয়ার** "Gender Issue : An Islamic Approach" নামে ইসলামে নারীর অধিকারের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। বর্তমান বইটিতেও ইসলামে নারীর অবস্থানের উপর বিশদ আলোচনা আছে। আশা করি আমাদের এ দু'টি প্রকাশনা এ সংক্রান্ত পাঠকের নানান প্রশ্নের জবাব দানে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রকাশনায় যারা বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাদের উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

**মো. হাবিবুর রহমান**
সভাপতি
দি পাইওনিয়ার, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# লেখকের ভূমিকা থেকে

ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সবার জিজ্ঞাসার উত্তর রয়েছে এই সিরিজে। ইসলামী শিক্ষা সিরিজের এই তৃতীয় ভল্যুমে ইসলামের সামাজিক শিক্ষা আলোচিত হয়েছে। এর প্রথম ভল্যুমে আলোচিত হয়েছে তাওহিদ, রেসালাত, আখেরাত, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ এবং বাইবেল ও বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উল্লেখ সংক্রান্ত আলোচনা। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এই সিরিজের দ্বিতীয় ভল্যুমে। চতুর্থ ভল্যুমে আলোচিত হবে ইসলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কুরআনের অলৌকিকত্বের বিষয়ে পঞ্চম ভল্যুমে একটি বিষয় সূচিও থাকবে।

মূল ইংরেজি বইতে ইংরেজি ভাষীদের জন্য ইসলামী শব্দগুলোর পার্শ্বে তার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা গ্রুপ স্টাডি উভয় ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতেই এই বই ব্যবহার করা যাবে। এই বইটি মূলতঃ অডিও ক্যাসেটের আলোচনারই লিখিত রূপ। কাজেই এই অধ্যয়নের সাথে ক্যাসেট সংগ্রহ করে শুনলে বুঝতে সহজ হবে। বইটি পড়ে যদি কোনো অসুবিধা বা অস্পষ্টতা দেখা দেয় তবে মূল ক্যাসেটটি শুনলে আশা করা যায় তা দূর হবে।

জামাল আল বাদাবী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# অনুবাদকের ভূমিকা

ড. আল্লামা জামাল বাদাবী সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। মিশরে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী বর্তমানে কানাডার হ্যালিফ্যাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। ইসলাম ধর্মের সরলতম ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন মতবাদের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে জামাল বাদাবীর প্রশ্নোত্তর সিরিজ পাশ্চাত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী লোকেরা আল্লামা বাদাবীর হৃদয়গ্রাহী ও অভেদ্য যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশিত ইসলামের আহ্বানে খুব সহজেই প্রভাবিত হচ্ছে। জামাল বাদাবীর অনুপম উপস্থাপনা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মত সমাজে ইসলামের দ্রুত প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জনাব শাহ আবদুল হান্নানের মাধ্যমে আমরা জামাল বাদাবীর লেখার সাথে পরিচিত হই। এই প্রশ্নোত্তর সিরিজ তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো শুরু করেন। তাঁর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণাতেই আমরা এ বই অনুবাদের কাজে হাত দিই। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি অনুবাদের প্রতিটি অংশ পড়ে দেখে তার প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে মোঃ আতিকুর রহমান আহাদ মূল্যবান শ্রম ও মেধা ব্যয় করে বইটিকে আরো সুন্দর ও পরিমার্জিত করেছেন। এজন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

দি পাইওনিয়ার ও দি উইটনেস-এর ভাই ও বোনেরা এ বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের আরো ঋণী করেছেন।

এ অনুবাদ সম্পর্কে সচেতন পাঠকের যে কোনো সংশোধনী, সমালোচনা ও মন্তব্য আমাদের প্রেরণা যোগাবে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর পথে কবুল করুন।

ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ
ড. শারমিন ইসলাম

# ইসলামের সামাজিক বিধান

## সূচি

# জি-১ মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা-১

**প্রশ্ন ঃ**

১. এই কোর্সের পূর্বের সিরিজ সমূহের সাথে মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার সম্পর্ক কি?

২. ইসলামের সামাজিক বিধানের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিন?

৩. প্রায় সব ধর্ম বিশ্বাসেই মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে এসেছে, এক্ষেত্রে ইসলামের পৃথক কোন বিশেষত্ব আছে কি?

৪. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিষয়টি কিভাবে ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পর্কিত?

৫. ইসলামের নৈতিক বিধান কিভাবে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের সাথে সম্পর্কিত?

৬. আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী কুরআনে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে? এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনার সাথে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার কোন পার্থক্য আছে কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. বর্তমান প্রসঙ্গ ও পূর্ববর্তী সিরিজ সমূহের সম্পর্ক

ইসলামী শিক্ষা সিরিজের প্রথম পাঁচটি পর্ব মূলতঃ তাওহীদ, রেসালাত ও প্রথাগত ইবাদত (Worship)-এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ পর্বে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, অন্যান্য ধর্মের মত কিছু আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এই দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থায় নির্দেশনা রয়েছে বিশ্বাস (ঈমান) ও ইবাদত (Worship) সংক্রান্ত বিষয়ে, নৈতিক বিষয়ে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সহ মানব জীবনের সব বিষয়ে। কাজেই আগের সিরিজগুলোর আলোচনার ধারাবাহিকতাই বর্তমান সিরিজ।

## ২. ইসলামের সামাজিক বিধানের প্রধান ক্ষেত্রগুলো

ইসলামের সামাজিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে আমরা দু'টো প্রধান ভাগে আলোচনা করতে পারি ঃ

ক) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইসলামের বিশ্বাস, নৈতিক শিক্ষা ও মূলনীতিসমূহ সমাজ জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে। এসব বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত আছে মানুষের মাঝে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতিসমূহ।

খ) পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইসলামী বিধানের আলোচনার মাধ্যমেও আমরা ইসলামের সামাজিক নীতির ধারণা পেতে পারি। কারণ পরিবারই হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক ইউনিট।

## ৩. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা সম্পর্কে ইসলামী বিধানের বিশেষত্ব

মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা সম্পর্কে ইসলাম ও অন্যান্য মতাদর্শের মাঝে প্রধান সামঞ্জস্য হচ্ছে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাস। ওহীপ্রাপ্ত ধর্ম-বিশ্বাসীগণ (খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান) মনে করেন যে মানুষের উৎপত্তি আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ) থেকে। যারা এর বিপক্ষে বলেন (বিবর্তনবাদীগণ), তাদের মত হলো মানুষ বানর বা অন্য প্রাণীর উন্নত সংস্করণ। মুসলিমরা এ ধারণায় দীক্ষিত যে, সকল মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। এক্ষেত্রে মানবতাবাদ বিষয়ে ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মমতের পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মের ন্যায় ইসলাম এটা সমর্থন করে না যে, মানুষকে বিভিন্ন বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত করে জন্ম দেয়া হয়েছে। বরং ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে প্রত্যেক মানুষকেই আল্লাহ মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে তৈরি করেছেন।

খ) দ্বিতীয়ত ইসলাম এ ধারণা দেয় যে আল্লাহ কেবল কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতির প্রভু নন। তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন (জগৎসমূহের প্রভু) এবং রাব্বুন নাস (সমগ্র মানবজাতির প্রভু)। এখানেই ইসলামী মানবতার বিশ্বজনীনতা।

গ) অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী নেহায়েৎ গল্পের মতই বর্ণিত হয়েছে। তাতে শিক্ষণীয় তেমন কিছুই নেই। অথচ কুরআনে তাঁদের ঘটনাগুলো এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মাধ্যমে সমগ্র মানরজাতির একই উৎস থেকে সৃষ্ট হবার এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা জন্ম নেয়।

## ৪. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা ইসলামের ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পৃক্ত

তৌহিদ তথা একত্ববাদই ইসলামের সারকথা। একক সত্ত্বা আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা এই ধারণা থেকেই তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির মধ্যে সমতা, একতা ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়। কারণ একই স্রষ্টা সকল মানুষ তা সে সাদা, কালো, নর বা নারী যেই হোক সকলকেই সৃষ্টি করেছেন। সবাই সেই একই প্রভুরই বান্দা। অন্যদিকে যদি আল্লাহর ক্ষমতা ও আধিপত্যের এক বা একের অধিক শরীক থাকত তাহলে মানুষের সমতা ও ভ্রাতৃত্ব সম্ভব হতো না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও একতার ক্ষেত্রে একত্ববাদ (তৌহিদ) অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ভূমিকার দাবীদার।

শুধু একত্ববাদই নয়, ইসলাম আরও শিক্ষা দেয় যে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত নবী রাসূল যেমন, নূহ (আঃ), ঈসা (আঃ), মুসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রত্যেকেই ছিলেন পরস্পর ভাইয়ের মতো। তাঁরা সবাই ছিলেন মানব জীবনের জন্য আদর্শ স্বরূপ। তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল স্ব-স্ব উম্মতদের পথপ্রদর্শক রূপে। তাঁরা সবাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন ঃ

ক) আল্লাহর উপর ঈমান সংক্রান্ত জ্ঞান।

খ) আত্মজ্ঞান - পৃথিবীতে আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

গ) জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান।

ইসলামের এ শিক্ষা থেকে এটা নিশ্চিত হয় যে, যারা এসব নবী ও রাসূলগণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন ও তাদের অনুসরণ করেন তারা সবাই একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

## ৫. ইসলামের নৈতিক বিধান এবং মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা নয়। বরং জীবনের সমস্ত দিক একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিক বিধান, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন এগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই মানব ভ্রাতৃত্ব ও একতা সম্পর্কিত ইসলামের শিক্ষা নৈতিক শিক্ষার উপরই ভিত্তি করে গঠিত। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তিগতভাবে মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার, সুদগ্রহণ ইত্যাদি নিষেধ করে। এই নিষেধাজ্ঞার একটা সামাজিক সুফলও আছে। কারণ যারা এসব কাজ করে তারা শুধু তাদের নিজেদের ক্ষতিই করছেনা বরং সমাজেও এর কুপ্রভাব পড়ছে। একইভাবে ইসলাম যে নৈতিক গুণাবলীর কথা অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুখের জন্যই নয় বরং সমষ্টিগত সামাজিক কল্যাণের জন্যও বটে। সমাজে মানুষ যদি দায়িত্বশীলতা, ক্ষমা, সহানুভূতি এসব গুণের চর্চা করত এবং বিশ্বাসী হত তাহলে সমাজে তার সুফল পরিলক্ষিত হত। একইভাবে এ গুণগুলোর অনুপস্থিতি সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

## ৬. হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে

কুরআনে বর্ণিত হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিধানের ভিত্তি প্রদান করেছে। সমগ্র কুরআনের মূলভাবের একটা অংশ হলো এ কাহিনী। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়গুলো হলো ঃ

ক) কুরআন আদি পাপের দোষ শুধুমাত্র বিবি হাওয়া (আঃ)-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়নি। আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) উভয়কেই সমভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার জন্য দোষারোপ করা হয়েছে। সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে এ ঘটনার বিশেষ ব্যঞ্জনা রয়েছে। কারণ মানুষের অধঃগমনের জন্য শুধুমাত্র মানবজাতির একটা অংশকে (মহিলা) দোষী করা হয়নি, যা বাইবেলে লক্ষ্য করা যায়। এভাবে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন পুরুষ ও নারীর সমতার বিষয়টিকে তুলে ধরেছে।

খ) কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায় আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পান। এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে ইসলামে আদি পাপ বলতে কোন কথা নেই। যেমন কোন কোন ধর্মে ধারণা করা হয় যে মানবজাতির আদি পাপ হযরত হাওয়া (আঃ) করেছিলেন যার শাস্তি স্বরূপ মানুষ দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কুরআন থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা নিছক শাস্তিস্বরূপ মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠাননি। বরং আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর মিশন সফল করতে প্রেরিত হয়েছেন।

এভাবেই আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী আনুগত্য ও আনুগত্যহীনতার পরিণতির প্রতীকী বর্ণনা হিসেবে এসেছে। সাথে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং তিনি মানুষকে উত্তম সৃষ্টি হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাদেরকে এ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য নির্দেশনাসহ প্রেরণ করেছেন। এভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান এবং লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, গোত্র ও জন্ম পরিচয়ের উর্ধ্বে তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

**সূত্র নির্দেশিকা ঃ**

প্রশ্ন ঃ ৬ আল কুরআন - ২০ঃ১২২

# জি-২ মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সমতা-২

**প্রশ্ন ঃ**

১. কুরআনে আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী কিভাবে বর্ণিত হয়েছে? এই বর্ণনার সাথে মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সমতার বিষয়টি কতটুকু সংযুক্ত?

২. মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সমতার বিষয়ে কুরআনে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্ধৃতি আছে কি?

৩. সমতার এই মৌলিক কাঠামোতে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করার কোনো মানদণ্ড ইসলামে আছে কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) সংক্রান্ত কুরআনের কাহিনীর সাথে মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার সম্পর্ক

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর প্রসঙ্গ কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় এসেছে। সূরা বাকারার ২৮ থেকে ৩৮ আয়াতে বিস্তৃতভাবে পুরো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মানব-মানবীর ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে ঃ

ক) আল্লাহ মানুষ তৈরির আগেই পৃথিবী তৈরি করেছেন এবং এতে মানুষের স্বচ্ছন্দ অবস্থানের পরিবেশ ও উপাদান নিশ্চিত করেছেন। কাজেই পৃথিবীতে মানুষের আগমন আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত ইচ্ছা। এটা কারো কোনো পাপের ফল নয়।

খ) যখন আল্লাহ্ সকল ফেরেশতাদের ডেকে বললেন যে তিনি দুনিয়াতে তাঁর খলিফা (দূত, প্রতিনিধি) প্রেরণ করতে চান তখন ফেরেশতারা শঙ্কা প্রকাশ করল যে এরা হয়ত দুনিয়াতে অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হবে। এখন প্রশ্ন হলো ফেরেশতার পূর্ব থেকেই এমন ধারণা কেন করল। এর একটা উত্তর হতে পারে এই যে ফেরেশতারা যখন জানল মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করা হবে তখন তারা ধারণা করল পার্থিব পাপের কবলে তারা পড়তে পারে। প্রথম মানব-মানবী মাটি থেকে তৈরি হয়েছেন এবং তাদের থেকেই সমগ্র মানবজাতির সৃষ্টি। সেহেতু এই মানবকূল এর মধ্যে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা কেউ অতি মানব এমন দাবি করা অবান্তর।

গ) যখন ফেরেশতারা মানুষের সম্ভাব্য অবাধ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন তখন আল্লাহ বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ মানুষকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন যা ফেরেশতাদের দেননি। কুরআনের মতে এ জ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীর সব বস্তুর নাম, আল্লাহর বিধান বোঝার ও পালন করার যোগ্যতা এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য করার সামর্থ্য। হক অথবা বাতিল যে কোনো পন্থা গ্রহণের স্বাধীনতাও মানুষকে দেয়া হয়েছে। এসব জ্ঞানের ব্যাপারেও কোনো মানুষেরই অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার কোনো সুযোগ নেই।

ঘ) আল্লাহকর্তৃক ফেরেশতাদের আদম (আঃ)-কে সেজদা দানের (সম্মান প্রদর্শনের) আদেশের মধ্যে সার্বিকভাবে সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিষয়টিই নিশ্চিত হয়েছে।

ঙ) এসব আয়াতের মাধ্যমে জাতীয়তা, লিঙ্গ বা অন্যান্য ভিত্তিতে মানুষের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিটি বাতিল প্রমাণিত হয়। আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী এই শিক্ষাই দেয় যে সকল মানুষের উৎপত্তির স্থল একই এবং একই মিশন সাধনের জন্য তাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। তাদের সবাই সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আবার তাদের সবাই শয়তানের প্ররোচনায়ও পড়তে পারে। এক্ষেত্রে কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়।

## ২. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিষয়ে কুরআনের সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি

কুরআনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতির মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যকার সাম্যের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, মানুষকে সম্বোধন করার ব্যাপারে কুরআনে সাধারণত 'ইয়া আইয়ুহাননাস' (হে মানবজাতি) এই বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মানুষের মাঝে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, মুসলিম ও অমুসলিম কোনো ভেদ করা হয়নি। আল্লাহ সবাইকে সমভাবে সম্বোধন করেছেন। এ ধরনের সম্বোধন এই ধারণারই জন্ম দেয় যে একই স্রষ্টা সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, সূরা বাকারার ১৬৮ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহে সকল মানুষের সমান ভোগাধিকার রয়েছে।

তৃতীয়ত, কুরআন নর ও নারী উভয়ের সমান মর্যাদা ঘোষণা করে মায়ের বিশেষ সম্মান দিয়েছে। কুরআন স্পষ্টভাবে নর ও নারীর একক উৎসস্থলের কথা বর্ণনা করে উভয়ের সমঅধিকারের কথা বলেছে। সর্বশেষে বলা যায় কুরআনে বার বার সকল মানুষকে শেষ বিচারের দিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার কথা বলেছে। কেউ সেদিন বিচার এর উর্ধ্বে থাকবে না। এটাও মানব সাম্যেরই ঘোষণা দেয়।

## ৩. মানুষের মর্যাদা বিষয়ক কুরআনের মানদণ্ড

এটা স্পষ্টভাবেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক মানদণ্ডে সকল মানুষই এক। রঙ, জাতীয়তা, গোত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু ভালো আর মন্দ কখনই এক হতে পারে না। এজন্যই ইসলামে ভালো আর মন্দের ভিত্তিতে মানুষকে মর্যাদা দেবার এক অনুপম মানদণ্ড দেয়া হয়েছে।

"(আল্লাহর দৃষ্টিতে) তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন (সৎকর্মশীল)।"

অর্থাৎ আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে সততা এবং খোদাভীতি (আরবীতে তাকওয়া)। তাকওয়া বলতে ব্যাপক অর্থে সকল

ভালো কিছুকেই বোঝায়। এ সততা মানে বিশ্বাসের সততা, নৈতিকতায় উত্তম এবং অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় উত্তম হওয়া। কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন 'যেন তারা পরস্পরকে জানতে পারে'। এক্ষেত্রে বাইবেলে বর্ণিত মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করার কারণটি তুলনা করে দেখা যেতে পারে। বাইবেল বলে যে, আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও ভাষায় ভাগ করেছেন, এই ভয়ে যে নচেৎ তারা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে যাবে। (বাবেল টাওয়ার নির্মাণ কাহিনী প্রসঙ্গ) অথচ কুরআনে এই ভেদটি একটি নেয়ামত হিসেবে এসেছে যাতে মানব বৈচিত্র্য পূর্ণতা পেতে পারে বিভিন্ন ভাষাগোত্র ও জাতীয়তার সম্মিলনে।

**সূত্র নির্দেশিকা ঃ**

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ২ঃ২৮-৩৮, ৩৮ঃ৭১, ৭ঃ১১

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ২ঃ২১, ২ঃ১৬৮, ৪ঃ১-২, ১৯ঃ৯৩-৯৫

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৪৯ঃ১৩, ৩০ঃ২২

# জি-৩ মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা-৩

**প্রশ্ন ঃ**

১. মানব ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

২. ইসলামে বর্ণিত সমঅধিকার অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবার কোনো উদাহরণ আছে কি?

৩. যদিও কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করেছে কিন্তু তবুও বেশ কয়েক জায়গায় বিশেষভাবে মুসলিম বা বিশ্বাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এমন ধারণার উদ্রেক হতে পারে কি যে কুরআনে মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার ধারণা উপেক্ষিত হয়েছে?

৪. যারা মুসলমানদেরকে জন্মগত মুসলিম, নওমুসলিম (ইসলাম গ্রহণকারী) অথবা পিতা মুসলিম হবার সুবাদে মুসলিম এমনভাবে ভাগ করতে চায় তার সমর্থনে ইসলামে কোনো যুক্তি আছে কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতা বিষয়ে রাসূলের (সঃ) দৃষ্টিভঙ্গি

মানব ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বিষয়ে রাসূল (সঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি সকল ক্ষেত্রেই পরিষ্কার। যথাঃ

ক) যে সময়টাতে চার্চ নিজে খোদায়ী কালামের একক ব্যাখ্যাদাতা ছিল এবং তারা নিজেদেরকে আল্লাহর মুখপাত্র হিসেবে দাবি করত সে সময় মুহাম্মদ (সঃ) শেখালেন যে যদিও আলেমরা সম্মানিত ব্যক্তি; কিন্তু তাদের কথা খোদায়ী কথার সমতুল্য হতে পারে না। সেজন্য ইসলামে চার্চের মত কোনো ইনস্টিটিউট নেই। রাসূল (সঃ) এটা নিশ্চিত করেছেন যে ধর্মে সাধারণ জনগণের উপর প্রাধান্য প্রদানকারী এমন জনগোষ্ঠী নেই।

খ) তিনি আরও শিখিয়েছেন যে নবী রাসূলগণ সহ সকল মানুষই সমান। তিনি তাঁকে পূজা করতে নিষেধ করতেন।

গ) তিনি শিখিয়েছেন যে সব মানুষ সমান বিধায় কোনো মানুষ অপর কোনো মানুষকে সেজদা করতে বা তার কাছে মাথা নত করতে পারবে না। শুধু আল্লাহর কাছেই মানুষ মাথা নত করবে।

ঘ) তিনি যখন কোনো সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন তখন সামনে আসন নেবার জন্য লোকজনকে ঠেলাঠেলি না করে নিকটতম জায়গায় বসে পড়তেন। তিনি বর্ণ, গোত্র, পোশাক, সম্পদ এসবের বিবেচনায় মানুষকে ভাগ করার বিরুদ্ধে বলতেন। মানব সমতার বিষয়ে তাঁর শেষ বাণী পাওয়া যায় তাঁর বিদায়হজ্বের ভাষণে - "হে

মানবজাতি তোমাদের আল্লাহ এক, পিতা এক, সুতরাং কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধুমাত্র খোদাভীতির ভিত্তিতেই তোমাদের মর্যাদার পার্থক্য হতে পারে।" এটা লক্ষ্য করার মত যে প্রথম যাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান এবং জাতীয়তা থেকে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি আরবের একজন বিশিষ্ট ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বিল্লাল (রাঃ) ছিলেন একজন নিগ্রো ক্রীতদাস, শুহাইব (রাঃ) ছিলেন রোমান, সালমান (রাঃ) ছিলেন পার্শী। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সবাই সম ভ্রাতৃত্বের অংশীদার হয়ে গিয়েছিলেন। কোন কোন কুরাইশ নেতা রাসূল (সাঃ) কে বলতেন যে আমরা তোমার দ্বীন কবুল করতাম যদি গরীব এবং নীচ ব্যক্তিরা এটা কবুল না করত। তাদের এই কথার জবাবে রাসূল (সাঃ) বলতেন, "হে আল্লাহ আমি যেন একজন দরিদ্র হিসেবেই জীবন ধারণ করি, মৃত্যুবরণ করি এবং হাশরের দিনে দরিদ্রদের সাথেই অবস্থান করি।"

## ২. সমঅধিকার অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে কি?

কুরআনে এবং রাসূল (সঃ)-এর জীবনে অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও সমঅধিকার দেবার প্রমাণ আছে। কুরআনে দুর্ঘটনাবশত কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে যে ক্ষতিপূরণ দেবার বিধান রয়েছে তা মুসলিম অমুসলিম উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কুরআন এবং হাদিসে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের জানমাল ইজ্জতের মর্যাদা মুসলিম নাগরিকের মতই সমভাবে দেয়া হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে আঘাত করে সে যেন আমাকেই আঘাত করে।"

প্রথম দিকের মুসলিম শাসকরা রাসূল (সঃ)-এর এই আদেশ বুঝতেন এবং যথাযথভাবে পালন করতেন। আবু ইউসুফ প্রণীত 'খারাজ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত ইহুদী, খ্রিস্টানসহ সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। এসব প্রমাণাদির আলোকে ওইসব মনীষী (যেমন, প্রফেসর ডাব্লিউ সি স্মিথ), যারা বলেন ইসলামে অমুসলিমের মর্যাদা রক্ষার কোন নির্দেশনা নেই তাদের কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ইসলামে মুসলিম অমুসলিম সুসম্পর্ক ও সমঅধিকার রক্ষার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

## ৩. যেসব ক্ষেত্রে কুরআন শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের সম্বোধন করেছেন তার ব্যাখ্যা

যদিও ইসলাম সকল মানবকে একসাথেই বলেছে আল্লাহর আনুগত্য করার কথা কিন্তু তবুও কখনো কখনো শুধু বিশ্বাসীদের সম্বোধন করতে হয়েছে তাদের বিশেষ কাজ যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুমীনদের ভ্রাতৃত্ব প্রকৃত অর্থে মানব ভ্রাতৃত্বের কোন বিকল্প বা প্রতিপক্ষ নয় বরং এটা ব্যাপকভাবে মানব ভ্রাতৃত্বের সীমার মধ্যেই বিশেষভাবে মুমীনদের জন্য প্রযোজ্য। তার উপর ইসলাম মুসলমানদের জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা ও সম্মান প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। মুসলিম অমুসলিম উভয়ের স্বার্থ ব্যবহারের জন্য একক নৈতিক বিধান ইসলামে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এক খোদা, এক শেষ নবী, এক কিতাব এবং আখেরাতে বিশ্বাসীদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলাম শিক্ষা দেয় সহনশীলতার। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ চাইলে গোটা মানব সমাজকে এক জাতিতে পরিণত করতেন।

## ৪. জন্মগত মুসলমান, নওমুসলিম এবং পিতা অথবা মাতা মুসলিম হবার সুবাদে মুসলমান-এমন বিভক্তির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ঃ

সকল মানুষই জন্ম নেয় মুসলিম হিসেবে। সকল শিশু আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের (ফিতরা) অঙ্গীকার নিয়েই জন্ম নেয়। এই সুবাদে সব শিশুই মুসলিম। যখন একজন ব্যক্তি তার পিতা মাতার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তখন প্রকৃতপক্ষে সে তার মূল ধর্মেই ফিরে আসে। কাজেই জন্মগত মুসলমান, নওমুসলিম আর পিতা অথবা মাতার মুসলিম হবার সুবাদে মুসলিম-এমন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুসলমানদের ভাগ করা ইসলাম সম্মত নয়। বিশ্বাস হচ্ছে বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে। কোন মুসলমানকে কাফের ঘোষণার অধিকার কারো নেই। কেউ এ ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে বাধা দেবার অধিকারও কারো নেই।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ রাসূল (সঃ) বলেন, "যে কেউ তার জন্য মানুষকে অপেক্ষমান রেখে গৌরববোধ করে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তোমাদের চেহারার সৌন্দর্য, পোশাক, শক্তি, সম্পদ কিছুই দেখেন না। তিনি তোমাদের হৃদয়কে দেখেন। যার হৃদয় ধার্মিক আল্লাহ তাকেই দয়া করেন। তোমরা সবাই আদম (আঃ)-এর সন্তান। তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন।"

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ১৮ঃ২৮

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৯২

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ২ঃ২৫৬, ৩ঃ৭৫, ১০ঃ১৯

প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ৩০ঃ৩০, ৯ঃ১১

# জি- ৪ বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব (ইসলামের ভ্রাতৃত্ব)

**প্রশ্ন ঃ**

১. আরবী ভাষী মুসলমানদের অনান্য ভাষাভাষীদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে কি? পবিত্র ভূমি ও মদীনার আশে-পাশের বাসিন্দাদের কোন বিশেষ মর্যাদা আছে কি?

২. উম্মাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং এটা 'জাতি' শব্দের প্রচলিত ধারণা থেকে পৃথক কিভাবে?

৩. ইসলামের ভ্রাতৃত্ব (brotherhood of faith) বা উম্মাহর ধারণা সময়ের এবং ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে কিভাবে?

৪. রক্তের সম্পর্ক কি ইসলামের ভ্রাতৃত্বের উপরে স্থান পায়?

৫. ইসলামের ভ্রাতৃত্বকেই সবার আগে স্থান দিয়েছে এমন কোন মানব সমাজের উদাহরণ আছে কি?

**উত্তর ঃ**

### ১. আরবী ভাষী হওয়ার বা পবিত্র মক্কা ও মদীনার আশে-পাশের অধিবাসী হবার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষ মর্যাদা আছে কি?

যদিও আরবী জানার মধ্যে সুস্পষ্ট কল্যাণ নিহিত আছে কারণ এ ভাষাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে, তবুও এমন ধারণা ভুল যে কোন মুসলমান যিনি আরবী জানেন না তিনি আরবীভাষীর চেয়ে কোনভাবে নিম্ন মর্যাদার। আল্লাহর বাণী হিসাবে কুরআন বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত। কোন ভাষা এমনকি আরবীও এমন মর্যাদার অধিকারী নয়।

একইভাবে রাসূল (সঃ)-এর পুণ্যভূমিতে থাকতে পারা সৌভাগ্যের এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমান হিসেবে সেখানকার অধিবাসীরা অন্য এলাকার মুসলমানদের উপর কোন রকম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারেন না। ইসলাম সব ধরনের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অস্বীকার করে। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের জ্ঞান অর্জন এবং জীবনে তার অনুসরণ (তাকওয়া)।

### ২. 'উম্মাহ' শব্দের অর্থ এবং 'জাতি' শব্দের প্রচলিত ধারণা থেকে এর পার্থক্য

'জাতি' বলতে প্রচলিত ধারণায় কোন নির্দিষ্ট ভাষাভাষী অথবা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জনগণ অথবা একই ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। পক্ষান্তরে উম্মাহ বলতে এমন এক গোষ্ঠীকে বুঝায় যার অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের সকল বিশ্বাসীরা। এটা জাতির চেয়ে অনেক উদার ও ব্যাপক ধারণা। ইসলাম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর দুটো মহাযুদ্ধসহ প্রায় সব বিপর্যয়ের মূল কারণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এক হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেন, "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আসাবীয়া (fanatical parochialism বা nationalism) (জাতীয়তাবাদ) প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয়।" জনৈক সাহাবী যখন আসাবিয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন তখন

রাসূল (সঃ) বলেন, "আসাবিয়া হচ্ছে যখন এক জাতি আর এক জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে এবং তাদের অধিকারকে অস্বীকার করে, যখন কোন জাতির লোকজন তাদের লোকদের অন্যায় এবং ভুলগুলোকে সমর্থন দেয় শুধুমাত্র জাতীয়তার কারণে।"

## ৩. ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কিভাবে কাল (সময়কে) অতিক্রম করে

কুরআনে বর্ণিত উম্মাহ শব্দ শুধুমাত্র গোটা বিশ্বের সকল দেশের সকল ঈমানদারকেই অন্তর্ভুক্ত করেনা বরং তা পৃথিবীর আদি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কালের সকল ঈমানদারকে সংযুক্ত করে। এভাবে কুরআনে যখন বলা হয় সকল ঈমানদার ভাই ভাই তখন তা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। সকল বিশ্বাসী একই ভ্রাতৃত্ব এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী-রাসূল ও সকল ঐশী কিতাবকে স্বীকৃতি দিয়ে লাভ করেছে বিশ্বজনীনতা। আর সব সংকীর্ণ মতবাদ যা শুধু কোন বিশেষ গোত্র বা বিশেষ নবীর অনুসারীকেই স্বীকৃতি দেয় সেসব থেকে ইসলামের পার্থক্য এখানেই।

## ৪. রক্তের সম্পর্ক কি ইসলামের ভ্রাতৃত্বের উপর স্থান পায়

ইসলামে রক্তের সম্পর্কসহ অন্য সকল সম্পর্কের উপরে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থান পায়। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি যেহেতু আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং ভালবাসা সেহেতু এই ভ্রাতৃত্বের উপর রক্তের সম্পর্ককে স্থান না দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে (যদিও রক্তের সম্পর্ককে রক্ষা করা এবং একে সম্মান করার ব্যাপারে মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে)। মুমিনদের ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং রক্তের সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে বলা হয়েছে। যদি কারো রক্তের সম্পর্কিত ব্যক্তি বা স্বামী বা স্ত্রী অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সেই সম্পর্ককে বিশ্বাসের উপর স্থান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি অবিশ্বাসী আত্মীয় সম্পর্কে হাশরের ময়দানে সুপারিশও করা যাবে না।

## ৫. রক্তের সম্পর্কের উপর ইসলামের ভ্রাতৃত্বকে স্থান দেয়ার উদাহরণ

কুরআনে এমন চারটি উদাহরণ আছে। প্রথম উদাহরণ হচ্ছে হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকায় অবিশ্বাসী ছেলে আরোহণ করেনি। দ্বিতীয় উদাহরণ যেখানে সন্তান বিশ্বাসী পিতা অবিশ্বাসী যেমন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁর মূর্তি নির্মাতা পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তৃতীয় উদাহরণ হযরত লুত (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রীর। এখানে লুত (আঃ) বিশ্বাসী আর তাঁর স্ত্রী অবিশ্বাসীদের দলে। চতুর্থ উদাহরণ ফেরাউন এবং তাঁর স্ত্রী। ফেরাউনের হুমকি সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাসী স্ত্রী ঈমান পরিত্যাগ করেননি। এসব উদাহরণে দেখা যায় বিশ্বাসী নবী বা বান্দাগণ তাদের অবিশ্বাসী স্বামী স্ত্রী বা সন্তানের সাজা রোধ করতে পারেনি।

### সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৪৯ঃ১০, ৫৯:১০, ২৩ঃ৫১-২, ২১ঃ৯২
প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ৯ঃ২৪, ৩১ঃ১৫
প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ১১ঃ৪৬, ৯ঃ১১৪, ৬৬ঃ১০-১১

# জি- ৫ সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধু নির্বাচন

**প্রশ্ন ঃ**

১. ইসলামী সমাজব্যবস্থায় বন্ধুত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা কি?

২. ইসলামের শিক্ষায় বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান আছে কি?

৩. এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি যেখানে মুসলমানদের খোলাখুলি মেশা ঠিক নয়?

৪. কোনটাকে ইসলাম বন্ধুত্বের সঠিক ভিত্তি মনে করে?

৫. কোন কোন কাজ বন্ধুত্বকে নষ্ট করে?

**উত্তর ঃ**

## ১. ইসলামী সমাজে বন্ধুত্বের তাৎপর্য ও ভূমিকা

শুধুমাত্র ইসলামের তাগিদেই নয় বরং সামাজিক দিক থেকেও বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ এই যে, একজন ব্যক্তির মানসিক গঠন, চিন্তাশক্তি ও আচার আচরণ বিকাশে বন্ধুত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উপরন্তু, বন্ধুত্ব একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশে ও নৈতিক উন্মেষের সাহায্য করে। সুতরাং এ থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, একটা সমাজের সাফল্য নির্ভর করে সেই সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বন্ধুত্ব যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয় তবে এটা আশীর্বাদ স্বরূপ। যদি এ সম্পর্ক অন্যান্য নগণ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয় তবে এটা বেশী দিন স্থায়ী হয়না। কুরআন ও হাদিস যে বন্ধুত্ব মানুষকে অপেক্ষাকৃত ভাল মুসলমান বানাবার পরিবর্তে তাকে সত্য সরল পথ হতে বিচ্যুত করে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন, "ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জীবনধারা ও চিন্তাচেতনা অনুসরণ করে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকেই বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক হও।"

কুরআন এ ব্যাপারে সতর্ক করে এভাবে যে, শেষ বিচারের দিন অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই নিদারুণ মনস্তাপে ভুগবে। কারণ তারা অনুধাবন করবে যে, এ ধরনের বন্ধুত্বের কারণে তারা সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়েছিল। অন্যত্র আল্লাহতাআলা সতর্ক করেছেন এভাবে যে, যে অবিশ্বাসী বন্ধুগণ কেয়ামতের দিন শত্রুতে পরিণত হবে।

## ২. ইসলামের শিক্ষায় বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান আছে কি

যদিও ইসলাম সবিস্তারে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের কথা বলে তথাপি একে কোন একক ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস বলা যায় না। ইসলামের শিক্ষা হলো দুনিয়াদারী থেকে

সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকা উচিৎ নয়। কুরআনের বরাত দিয়ে নবী করিম (সঃ) বৈরাগ্যবাদকে নিন্দা করেছেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বৈরাগ্যবাদের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে সারাজীবন উৎসর্গ করা ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উপনীত হওয়া যায় তথাপি এটা ইসলামের আদর্শ নয় কারণ এটা সমাজ পরিবর্তনের বদলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুক্তির প্রচেষ্টা মাত্র। অপরদিকে ইসলাম মানুষকে পারস্পরিক মেলামেশায় উৎসাহিত করে। ইসলাম বিশ্বাসীদের একে অপরকে জানার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম ও সহযোগিতায় উৎসাহ দেয়।

ইসলামের অনেক ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে করা যায় না বরং দলবদ্ধভাবে করতে হয় (যেমন ঃ জানাযার নামাজ, হজ্ব, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি)। উপরন্তু, রাসূল (সঃ) দৈনিক নামাজসমূহ জামায়াতে পড়ার তাগিদ দিয়েছেন যদি মাত্র দু'জন লোক হয় তবুও।

## ৩. যে সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের খোলাখুলি মেশা ঠিক নয়

যে সব লোক ঈমানকে ঠাট্টার বিষয় মনে করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে সে সব লোকের সাথে মুসলিমরা মিশতে বাধ্য নয়। এসব লোক থেকে দূরে থাকার জন্য ইসলাম শিক্ষা দেয়। কোন অবস্থাতেই এদের সাথে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট চক্র বা সমাজ যদি খারাপ হয় এবং কারও পক্ষে যদি এতে ঢুকে এর অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় তবে তার উচিৎ ঐ গোষ্ঠী বা সমাজ ত্যাগ করা। যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তির এমন সামর্থ্য বা মেধা থাকে যা দ্বারা সে ঐসব খারাপ কাজ বা অপকর্ম শুধরাতে পারে তাহলে তার উচিৎ হবে সে চেষ্টা চালিয়ে ঐ সমাজ বা গোষ্ঠীকে সঠিক পথে আনা, যদি সে ব্যর্থ হয় তবে সে সঙ্গ ত্যাগ করাই তার জন্য যথার্থ। নবী করিম (সঃ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন ধরনের লোক সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি উত্তর দিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জান, মাল ও সময় ব্যয় করে লড়াই করে। এরপর সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে অসৎ ও অনাচারপূর্ণ সমাজ থেকে নিজেকে পৃথক রাখে।"

এটাই সত্য যে, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও কিছু লোক অবশ্যই থাকবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের রজ্জুকে আঁকড়ে থাকবে। তাঁর দেয়া অপরিবর্তনীয় নৈতিক আচরণের নিয়মনীতিকে অনুসরণ করবে ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিশ্বাসীদের দল গঠন করবে। কেউ বিচ্ছিন্ন থাকার চেয়ে এটাই হবে বেশী বাঞ্ছিত।

## ৪. ইসলামের দিক থেকে নিখুঁত বন্ধুত্বের ভিত্তি

কুরআন ও রাসূলের হাদিস থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যে বন্ধুত্ব আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস এবং তাঁর পথ অন্বেষণের উদ্দেশ্য থেকে সৃষ্ট তাই নিখুঁত ভিত্তির উপর স্থাপিত। অপরদিকে, যে বন্ধুত্ব কোন বিশেষ স্বার্থরক্ষা, সামাজিক শ্রেণী বা

ভৌগোলিকতার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত সেটা নিখুঁত নয়। হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহতায়ালা বলেছেন, যারা একে অপরকে আমার জন্যে ভালবাসে তাদেরকে কেয়ামতের দিন আমি আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব যেদিন আমি ছাড়া আর কোন আশ্রয়দাতা থাকবে না।

## যে সব পন্থা বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায়

কুরআন ও রাসূলের হাদিস অনুসারে, আট প্রকার নির্দিষ্ট পন্থা বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয় ঃ

ক. দুর্নীতি, শঠতা ও অহংকার বর্জন। কারণ এগুলো মানুষের হৃদয়ের আন্তরিকতা ও সরলতাকে ধ্বংস করে।

খ. সামাজিক সৌজন্যবোধ, যেমন, একজন মুসলিম তার সহচরকে তার নাম ও কোথা থেকে সে এসেছে জিজ্ঞাসা করা।

গ. যদি কেউ কোন ভাই বা বোনকে আল্লাহতাআলাকে বিশ্বাসের কারণে ভালবাসে তাহলে সে যেন অন্যদেরকে সেটা জানায়।

ঘ. ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়ীতে যাওয়া। এটা বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায়। বেহেশতের শুভ সংবাদ তাদের জন্য যারা বন্ধুর বাড়ী যায়, অন্য কোন কারণে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই।

ঙ. উপহার সামগ্রী আদান প্রদান।

চ. ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়া।

ছ. ভোজের দাওয়াত গ্রহণ করা।

জ. নিঃস্বার্থ হওয়াঃ নবী করিম (সঃ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজের জন্য যা পছন্দ কর তোমার ভাই-এর জন্যও তা পছন্দ না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মুমিন নও, বিশেষতঃ যদি সেই ভাই অভাবী হয়।

## ৫. বন্ধুত্ব রক্ষার্থে যে সব কাজ পরিত্যাগ করা দরকার

ক. কোন মুসলিম ভাইকে ব্যঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা।

খ. তাকে শ্লেষ না করা এবং তার অনুভূতিতে আঘাত হানা থেকে বিরত থাকা।

গ. যে নাম সে পছন্দ করেনা সেই নামে তাকে না ডাকা।

ঘ. বন্ধুদের গীবত না করা ও গোয়েন্দাগিরি এড়িয়ে চলা।

ঙ. বিনয়ী হওয়া ও চালবাজি বর্জন করা।

চ. বন্ধুর কোন কাজের পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ বর্জন করা।

ছ. এমন কাজ বর্জন করা যা ভ্রাতৃত্বের পথে হুমকীস্বরূপঃ অর্থাৎ মদ্যপান, জুয়াখেলা, ঠকবাজী ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী বিধানের দিকে খেয়াল রাখা।

জ. তিন বা তিনের অধিক লোক একত্রিত হলে যে কোন দু'জনের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মেতে উঠা ঠিক নয়, বিশেষ করে যদি সে কথোপকথন অন্যরা শুনতে না পায়।

ঝ. যদি বাদানুবাদ দেখা দেয়, তবে একজন দায়িত্ববান মুসলমানের কর্তব্য হবে সেটা মিটমাট করা।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ২৫ঃ২৭-৩০, ৪৩ঃ৬৫-৬৭

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৫৭ঃ২৭

যখন এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-কে বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল তখন উত্তরে তিনি বললেন, যে বিশ্বাসী ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে, তাদের মাঝে কাজ করে ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হয় যদিও তারা তাকে অবজ্ঞা করে বা আহত করে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেয়, যে মানুষের সাথে মিশেনা এবং তারা আঘাত করলে ধৈর্য ধারণ করতে পারেনা।

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৬ঃ৭০

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৪৯ঃ১১

# জি-৬ সামাজিক দায়িত্ব- ১

**প্রশ্ন ঃ**

১. ধর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

২. ইসলাম যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির নির্দেশনা দেয়না বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিশুদ্ধির নির্দেশনা দেয়, এর সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি?

৩. সমাজকে পরিশুদ্ধ করার কোন উপায় ইসলামে নির্দেশিত আছে কি?

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)-এর ব্যাখ্যা কি?

৫. একজন মুসলিম কিভাবে সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে? এ ব্যাপারে কুরআনে নির্দিষ্ট আদেশ আছে কি?

৬. পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে- এর অর্থ কি?

৭. সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ নীরবতা ও এড়ানোর চেষ্টা দেখা যায়। এটা কি গ্রহণযোগ্য?

**উত্তর ঃ**

## ১. ধর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং এই সম্পর্ককে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে। এটা এমন এক সম্পর্ক যা কালক্রমে ব্যক্তির গোটা জীবনের সকল তৎপরতাকে প্রভাবিত করে, পরিশুদ্ধ করে। ইসলাম নিছক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানাদি সর্বস্ব ধর্ম নয়। এটা শুধু মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্কই নিয়ন্ত্রণ করেনা; বরং মানুষে মানুষে সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও সামাজিক দায়িত্ব ছাড়া ইসলাম অসম্পূর্ণ। যে এটা ছাড়া ইসলামকে কল্পনা করে তার উদাহরণ এমন যে, কেউ বলল আমার একটি বাড়ী আছে, আসলে তার শুধু মাত্র একটি বাড়ির ভিত্তি (Foundation) আছে।

## ২. ইসলাম যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধি নয় বরং গোটা সমাজের পরিশুদ্ধির নির্দেশনা দেয় কুরআন থেকে তার পক্ষে দলিল

এর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে কুরআনের সকল আদেশ নির্দেশ এবং শিক্ষা সকল মানব বা মুমিনদের সম্বোধন করে বহুবচনে বলা হয়েছে, এক বচনে বলা হয়নি। নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে যে এককভাবে সম্ভব নয়। একই ভাবে যাকাত সংক্রান্ত, মদপান ও জুয়া থেকে বিরত থাকা সংক্রান্ত আদেশসহ প্রায় সব আদেশ নিষেধ বহুবচনে

জারী হয়েছে। এসব উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে ইসলাম মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবন এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে যা চূড়ান্তভাবে সমাজকেও শুদ্ধ করে।

## ৩. ইসলামের নির্দেশনায় সমাজ পরিশুদ্ধির উপায়

ইসলামের এজন্যে তিনটি পন্থা রয়েছে ঃ

ক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মগঠন যা ব্যক্তিকে শুধুমাত্র দেশের বা সমাজের আদর্শ নাগরিকই করেনা বরং পৃথিবীর আদর্শ নাগরিকে পরিণত করে।

খ. পরিবার, রাজনৈতিক সংগঠন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিটি পরিচালনার সুষম বিধান ইসলামে রয়েছে এবং এই তিন-এর সমন্বয়ে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

গ. কুরআনে সকল মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সৎ কাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজে বাধা দিতে।

## ৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাখ্যা

“আমরু বিল মারুফ ওয়ানাহি আনিল মুনকার” সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। যে সব বিশ্বাসী নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে অন্যায়কে প্রতিরোধ করে ও ন্যায় কায়েম করে তারা আল্লাহর দয়া লাভ করবে। যে সমাজ এই কাজ করবে তা আল্লাহর দৃষ্টিতে সফল সমাজ। কাজেই এটা নিশ্চিত হচ্ছে যে এই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ ইসলামের একটি মৌলিক বিধান, যার মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে তাদের মিশন পূর্ণ করবে। কুরআন মুসলমানদের আরও সতর্ক করে দেয় যে, অতীতে যে সব জাতির ভাল লোকেরা তাদের খারাপ লোকদের অন্যায় কাজে বাধা দেয়নি সেসব জাতির ওপর যখন আযাব দেয়া হয় তখন খারাপদের সাথে ভালদেরও রেহাই দেয়া হয়নি। প্রকৃত মুমীনরা সমাজ সংস্কারে সতত তৎপর থাকেন।

## ৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পন্থা

রাসূল (সঃ) বলেন, “তোমাদের কেউ কোন অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তাঁর হাত দিয়ে তাতে বাধা দেয়। এর সামর্থ্য না থাকলে সে যেন কথা দিয়ে চেষ্টা করে, তাও সামর্থ না থাকলে অন্তরের মাধ্যমে। এবং এটাই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম প্রকাশ”। (আননববী উদ্ধৃত ‘৪০ হাদিস-এর ৩৪ নং হাদিস)

## ৬. উপরের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থার ব্যাখ্যা

উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে এটা বোঝা যায় যে, রাসূল (সঃ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ থেকে দুর্বলতম পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে–

প্রথমতঃ কাজের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ (হাত); দ্বিতীয়তঃ কথার মাধ্যমে (যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা); তৃতীয়তঃ হৃদয়ের মাধ্যমে (যেখানে মুসলমান অন্যায় দেখে কষ্ট পাবে কিন্তু কোন কিছু করতে ক্ষমতাহীন)। যখনই কোন মুসলিম কোন অন্যায় দেখবে তখনই সে তার অবস্থা এবং সময়ের আলোকে এই হাদিসের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি দেখে একদল শিশু একটি পশুকে অত্যাচার করছে তখন তার উচিৎ হবে প্রথমতঃ পশুটিকে মুক্ত করা। কারণ বাচ্চাদের পশুর প্রতি নমনীয় হবার উপদেশ দেয়ার চেয়ে সেটা অগ্রাধিকার পাবে। আবার কেউ যদি তার বন্ধুকে মদ্যপান করতে দেখে তবে সেখানে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে আন্তরিকতার সাথে তাকে বুঝানোটাই বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে। সাথে সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত অসৎদের শুধু মুখের কথায় পথে আনা যাবে না, এজন্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও প্রতিরোধ আবশ্যক হবে।

## ৭. নীরবতা ও দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে নীরবতা কখনই বিশ্বাসীদের জন্য সঠিক পথ হতে পারেনা। রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য বিশ্বাসীদের বিষয়ে উদাসীন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সাধারণতঃ তিনটি কারণে মানুষ দায়িত্ব এড়াতে চায়।

ক. বন্ধুত্ব হারানোর ভয়ে।

খ. অন্যায়ের মোকাবেলায় একা হয়ে যাবার ভয়ে।

গ. নীরবতা অথবা দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টায়।

প্রথম যুক্তি এজন্যে গ্রহণযোগ্য নয় যে, নিজের দোষ ধরিয়ে দেয়া যারা পছন্দ করেনা তাদের আচরণ ইসলাম সম্মত নয়। এমন বন্ধুত্ব হারানোতে কোন ক্ষতি নেই। আর দ্বিতীয় যুক্তি এজন্য গ্রহণীয় নয় যে, সবাই এই যুক্তি অনুসরণ করলে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ভাল কিছু হত না। মানুষের ভাল প্রচেষ্টায় সাফল্যের মালিক আল্লাহ। কিন্তু প্রচেষ্টা ঠিকমত করা মানুষের দায়িত্ব। তৃতীয় যুক্তিকে কেউ এভাবে যায়েজ করতে চায় যে নিজের পরিশুদ্ধি ও মুক্তি হলেই তা যথেষ্ট। কিন্তু এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ যদি মনে করে অন্যায়কারীরা অন্যদের আক্রমণ করছে, কাজেই আমার ভয়ের কিছু নেই তবে তা হবে তাদেরকে নিজ দরজা পর্যন্ত আসার সুযোগ করে দেয়া। এটা ঠিক যে অনেক সময় ব্যক্তিগত চেষ্টায় সমাজ থেকে অন্যায় উৎখাত করা যায় না। এজন্য সমন্বিত চেষ্টা দরকার।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৪ঃ আল কুরআন ৯ঃ৭১, ৩ঃ১০৪, ৩ঃ১১০

প্রশ্ন-৭ঃ খলীফা ওমর (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ যেন তাকে দয়া করেন, যে আমাকে আমার ভুল ধরিয়ে দেয়।" আল-কুরআন ৮ঃ২৫

# জি- ৭ সামাজিক দায়িত্ব- ২

**প্রশ্ন ঃ**

১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিধান কি কুরআনে বর্ণিত 'ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই' মূলনীতির বিরোধী নয়?

২. কোন মুসলমান যদি দাবী করে যে অমি নিজে সৎপথে আছি, এ অবস্থায় অহেতুক খারাপ লোকদের সাথে লড়তে যাবার দরকার নেই?

৩. ইসলামে এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি যার কারণে কেউ আল্লাহর কথাকে ইচ্ছেমত নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না?

৪. সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে বিধিবদ্ধ ইবাদত (Worship)-এর সাথে সম্পৃক্ত? এ দুটোর মধ্যে কোনটা অগ্রাধিকার পাবে?

৫. সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে কাজে পরিণত হয় তার উদাহরণ দিন।

৬. সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি।

৭. সত্যিকার ইসলামী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের সাথে 'ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই'- এই মূলনীতির কথিত বিরোধ প্রসঙ্গে

এটা একটা মহৎ বিধান যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য মানুষকে জোর জবরদস্তি করার অনুমতি মুসলমানদেরকে কুরআন দেয়নি। প্রত্যেকেরই তার স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ইসলামে ও ইসলামী রাষ্ট্রে আছে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর মাধ্যমে এই স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়না। কোন সমাজই তার মধ্যে দুর্নীতি পাপাচারকে অবাধে চলতে দিতে পারেনা। অসৎ দুর্নীতিবাজ লোকের হাতে সমাজকে জিম্মি করে দিয়ে তাদের রক্ষার জন্য ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই বলার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলামে বর্ণিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমে দুষ্ট দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের কবল থেকে সমাজের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, ইজ্জত ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়।

## ২. বিভ্রান্তদের প্রতি বিশ্বাসীদের আচরণ

কুরআনে একটি আয়াত আছে যে, অবিশ্বাসীরা কি করল তা মুমীনদের দেখার বিষয় নয় (৫:১০৫)। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি যে ঈমান আনেনি, আবার তার কাজ বা তৎপরতা দিয়ে সে সমাজের কোন ক্ষতিও করছেনা, মানুষের অধিকারও নষ্ট করছেনা, এ অবস্থায় তার ব্যাপারে মুমীনদের করবার কিছুই নেই। কিন্তু যদি একজন অবিশ্বাসী তার তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী সমাজের বা ধর্মের গোড়ায় আঘাত হানে তবে তার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা ইসলাম সম্মত নয়। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতের যুগে যখন কিছু

মুসলমান পূর্বে উল্লিখিত আয়াতের কথা বলে নিষ্ক্রিয় থাকতে চেয়েছিল তখন তিনি তাদেরকে রাসূল (সঃ)-এর এই হাদিস বলে সতর্ক করে দেন যে সমাজে ক্ষতিকর কিছু হতে থাকলে মুসলমানরা যদি নিষ্ক্রিয় বসে থাকে তবে আল্লাহর আযাব সবাইকে গ্রাস করবে।

## ৩. আল্লাহর কথাকে নিজ স্বার্থে ইচ্ছেমত ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইসলামের ব্যবস্থা

যে কোন ধর্মের ক্ষেত্রে এই গ্যারান্টি দেয়া কঠিন যে, তার অনুসারীদের কেউ স্রষ্টার কথাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবেনা। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে এক্ষেত্রে ইসলামে এমন এক অনুপম ব্যবস্থা আছে যাতে কেউ তার অপকর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে এটা বলতে পারবেনা যে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় এমন কাজ করেছে। ইসলামের মূলনীতি সমূহের আলোকে এমন ব্যক্তির কাজ এবং দাবী যে অবৈধ তা প্রমাণ করা যায়। ইসলামে একমাত্র অহী (প্রত্যাদেশ যা নবী রাসূলরা লাভ করেন) ছাড়া আল্লাহর সরাসরি আদেশ লাভের সুযোগ কারো জন্য নেই।

আল্লাহর সরাসরি আদেশ একমাত্র কুরআনেই আছে যার ব্যাখ্যা রাসূল (সঃ)-এর হাদিসে পাওয়া যায়।

## ৪. সামাজিক দায়িত্ব ও আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার

ইসলামে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শুধু নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। কুরআনে সৎপন্থা (হক্ব) বলতে বুঝায় আল্লাহর প্রতি ঈমান, দরিদ্রদের দান ও যাকাত আদায় (সামাজিক ন্যায় বিচার), নামাজ, রোজা (আনুষ্ঠানিক এবাদত), ওয়াদা রক্ষা করা, সংযম, অধ্যবসায় ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়া। যেহেতু এগুলো সবই ইসলামের বর্ণিত হক্ব-এর অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ইসলামে সামাজিক দায়িত্ব ও আনুষ্ঠানিক এবাদতকে পৃথক করার সুযোগ নেই।

## ৫. সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে কাজে পরিণত হয়

সামাজিক ঐক্য ও সংহতিই মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধকে সম্মিলিত করে বৃহৎকাজে পরিণত করে। নিম্নলিখিত উপায়ে সমাজে ঐক্য ও সংহতি আসে ঃ

ক. **পরিবার ঃ** কারণ পরিবার হচ্ছে সমাজের একক। পরিবারের সদস্যদের মাঝে ঐক্য, ভালবাসা এবং আকর্ষণ সমাজে সঞ্চালিত হয়। আবার পরিবারগুলোতে বিরাজমান অবিশ্বাস ও অশান্তি সমাজকেও আক্রান্ত করে। ইসলাম পরিবার রক্ষার উপর জোর দেয়।

খ. **কর্মক্ষেত্র ঃ** প্রত্যেক মুসলিম কর্মক্ষেত্রে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

গ. **সমাজ ঃ** সমাজে প্রত্যেক মুসলমান নিজেকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে চিন্তা করে এর স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।

ঘ. সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করবে।

ঙ. **সামাজিক সচেতনতা ঃ** রাসূল (সঃ) বলেন, "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খেয়ে ঘুমাতে যায়।"

## ৬. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ পৃথিবী এবং মানব জাতিকে যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন তার বর্ণনা দিতে 'আদল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই একই শব্দ মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও সামাজিক ভারসাম্যের ব্যাপারে আদেশ দেয়ার সময় ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের কুরআন আদেশ দেয় রাষ্ট্র পরিচালনায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে, আর্থিক ন্যায়নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে, সমাজের এক অংশ যেন আরেক অংশের উপর শোষণ অবিচার না করে তা নিশ্চিত করতে। বিচারকদের ন্যায়বিচার করতে।

## ৭. সত্যিকার ইসলামী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ঃ

ক. সমাজের তথা জগতের মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে।

খ. আল্লাহর আধ্যাত্মিক বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হবে।

গ. সমাজ চালিত হবে আল্লাহর দেয়া মানব কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক মিশন সফল করতে।

ঘ. সমাজ হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়নীতি সমৃদ্ধ। তাতে আত্মিক ও পার্থিব উভয় দিকে উন্নতির ব্যবস্থা থাকবে। সমাজে প্রতিটি সদস্যের মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ২ঃ২৫৬

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৫ঃ১০৫

রাসূল (সঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে আল্লাহ সমাজের ঐসব লোকদেরকে শাস্তি দেবেন যারা সমাজের দুষ্ট লোকদের দমন করতে কোন চেষ্টা করেনা এবং যারা মানুষের উপর জুলুম করে।

প্রশ্ন-৩ ঃ 'আল্লাহর ইচ্ছা'- এই দাবীতে যা খুশী তা করার সুযোগ ইসলামী সমাজে নেই। কারণ এখানে এ জাতীয় যে কোন দাবীর সমর্থনে ইজমা (উম্মতের ঐকমত্য) প্রয়োজন। ইজমা মানে উম্মার অধিকাংশ আইন প্রণেতা ও বিশেষজ্ঞের ঐক্যমত্য। ইজমার মাধ্যমে গৃহিত সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তি নিজ হাতে বাস্তবায়ন করতে পারেন না; তা বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ২ঃ১৭৭

রাসূল (সঃ) বলেছে, যে ব্যক্তি এতিম অথবা অক্ষম লোকের দেখাশুনা করে সে আল্লাহর পথে জেহাদরত অথবা সারারাত নফল এবাদতরত এবং সারাদিন রোজারত মানুষের সওয়াব পাবে।

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ৫ঃ২

রাসূল (সঃ) বলেন, সমগ্র দুনিয়ার মুমীনরা যেন এক শরীর, তার কোন অংশে ব্যথা হলে সমগ্র শরীরে সে ব্যথা অনুভব হবে

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৮২ঃ৭, ৪ঃ৫৮

# জি- ৮ দাস প্রথার অবসান প্রসঙ্গ- ১

**প্রশ্ন ঃ**

১. রাসূল (সঃ) যখন তাঁর মিশন শুরু করেন তখন ক্রীতদাস প্রথা কোন অবস্থায় ছিল?

২. ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে ইসলামের মানবিক আবেদন সম্পর্কে বলুন।

৩. ক্রীতদাসদের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত এবং তাদের অধিকার রক্ষায় ইসলামে আর কোন শিক্ষা আছে কি?

৪. এসব শিক্ষা মুসলমানদের উপর কি কোন লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল?

৫. ব্যক্তি পর্যায়ে আহ্বান ছাড়া দাস প্রথা উচ্ছেদে ইসলামে কোন আইনগত ব্যবস্থা ছিল কি?

৬. ইসলাম সরাসরি দাস প্রথা উচ্ছেদ করেনি কেন?

৭. রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় যেমন মদপান নিষিদ্ধ করা হল, তেমনি তাঁর জীবদ্দশায় দাস প্রথা উচ্ছেদ করা হল না কেন?

**উত্তর ঃ**

## ১. রাসূল (সঃ)-এর মিশনের শুরুতে দাস প্রথার অবস্থা

সপ্তম শতকে যখন রাসূল (সঃ) তাঁর মিশন শুরু করেন তখন দাস প্রথা বহুলভাবে চালু ছিল, যদিও তার ধরণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ছিল। তিনভাবে ক্রীতদাস সংগৃহীত হত। যথা- ১. যুদ্ধবন্দী, ২. অপহরণ, ৩. ঋণগ্রস্ত মানুষ যখন ঋণ পরিশোধ করতে পারত না তখন মহাজনরা তাদের দাস বানাত। এটা ছিল এমন এক সময় যখন দাসরা পণ্যের মত ব্যবহৃত হত। নির্মম নির্যাতনের শিকার হত। মালিক তার দাসকে ইচ্ছেমত মারার এমনকি হত্যা করার অধিকার রাখত। রোমানদের মধ্যে তো দাস হত্যা একটি আনন্দদায়ক খেলা ছিল। এমন সময়ে ইসলামের অভ্যুদয় শুধু দাসপ্রথার উচ্ছেদেরই সূচনা করেনি বরং মানুষের অন্তরে এমন পরিবর্তন আনে যা দাস এবং তার মালিক উভয়ের মধ্যে সমতার অনুভূতি নিয়ে আসে। উভয়ের মাঝে মানব সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

## ২. দাসপ্রথা উচ্ছেদে ইসলামের মানবিক আবেদন

**প্রথমতঃ** ইসলামের মূলকথাই হচ্ছে সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবে না। ইসলাম অর্থ আল্লাহতে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শান্তি অর্জন।

**দ্বিতীয়তঃ** কুরআন বলে সকল মানুষ এক আত্মা থেকে সৃষ্ট। একথা আবার হাদিসে এভাবে সমর্থিত হয়েছে যে সকল মানুষ হচ্ছে আদমের (আঃ) থেকে উদ্ভুত এবং আদম

(আঃ) মাটি থেকে সৃষ্ট। এ থেকে মানব সমতা ও ভ্রাতৃত্বের যে দর্শন উৎসারিত হয় তা মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্বের ধারণাকে উৎখাত করে। সর্বোপরি ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে আল্লাহ শুধুমাত্র বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই মানুষকে বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও জাতিতে ভাগ করেছেন; কারো উপর কারো প্রভুত্বের জন্য নয়। তদুপরি আল্লাহর দৃষ্টিতে সে শ্রেষ্ঠ যে বেশী তাকওয়া (খোদাভীতি) সম্পন্ন। রাসূল (সঃ) মুমীনদের ভাল বংশের অবিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করার চেয়ে বিশ্বাসী দাসীকে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামের এসব ব্যবস্থা মানুষের মন থেকে দাসপ্রথার অনুকূল দর্শনকে ভ্রাতৃত্ব ও সমতার অনুভূতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা মূলতঃ অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা।

## ৩. দাসদের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত ইসলামের শিক্ষা

কুরআন ও হাদিসে দাসদের সাথে সুব্যবহার সংক্রান্ত অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। কুরআনের আয়াতে আল্লাহর উপর বিশ্বাসের সাথে দাসদের সাথে সুব্যবহারের কথা এক বাক্যে এসেছে। কুরআন দাসপ্রথাকে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবেই নির্দেশিত করে। এক হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেন, দাসরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে পরিস্থিতি উল্টো করেও দিতে পারতেন (অর্থাৎ মালিক নিজে দাস এবং দাস মালিক হতে পারত)। ইসলাম দাসদের নির্দিষ্ট যে সব অধিকার দেয় তা হচ্ছে–

ক. তাদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখতে এবং তা চর্চা করতে।

খ. খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার। মালিক যা খাবে এবং পরবে দাসদেরও তা খেতে এবং পরতে দিতে হবে। তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ দেয়া যাবে না। যদি মালিকের কোন কঠিন কাজ থাকে তবে দাসকে ঐ কাজ করতে মালিক নিজে সাহায্য করতে হবে।

গ. মালিক তার দাসের প্রতি ক্ষমাসুলভ হবেন।

ঘ. একজন প্রাক্তন ক্রীতদাস মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হতে পারেন এবং তিনি নামাযে ইমামতি করতে পারেন। এক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা সব মুসলমানের দায়িত্ব।

ঙ. রাসূল (সঃ) শিখিয়েছেন যে, কেউ তার দাসদের আমার দাস বা আমার লোক এভাবে না ডেকে আমার পুত্র বা আমার কন্যা এভাবে ডাকবে।

## ৪. এসব শিক্ষা কিভাবে মুসলমানদের আচরণ পরিবর্তন করে

ইসলামের মানবিক আবেদন যে তৎকালীন আরববাসী মুসলিমদের আচরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথমদিকের ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত বেলাল (রাঃ) যিনি ছিলেন একজন

হাবশী গোলাম। তাঁর মালিক যখন ইসলাম কবুল করায় তাঁর উপর চরম অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাকে দ্বিগুণ দামে কিনে নেন এবং মুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে তিনি সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন। একদিন মানুষ দেখলেন আবুবকর (রাঃ) তার ক্রীতদাসের চেয়েও কমদামী পোশাক পরে আছেন। লোকজন যখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বললেন যে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ কিন্তু ক্রীতদাস তো যুবক। তার ভাল কাপড় পরতে শখ হয়েছে তাই তিনি নিজে কমদামী কাপড় পরে ক্রীতদাসকে দামী কাপড় দিয়েছেন। একবার সাহাবী আবুযর (রাঃ) একজন কাল মানুষের ঝগড়ার এক পর্যায়ে রেগে বললেন, তুমি একজন কাল মায়ের পুত্র। এ কথা শুনে রাসূল (সঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "কাল এবং ফর্সা মায়ের পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।" রাসূলের এই নসীহত শুনে সাহাবী আবুযর (রাঃ) এত অনুতপ্ত হলেন যে তৎক্ষণাৎ বালুতে শুয়ে নিজের মুখে ঐ কাল ব্যক্তিকে পা রাখতে বললেন।

এছাড়া আরও বলা যায় তৎকালীন ধনী মুসলিমরা দাস কিনতেন তাদের মুক্ত করার জন্য। আর অনেক প্রাক্তন দাস ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেছিলেন।

## ৫. দাস প্রথা উচ্ছেদে ইসলাম গৃহীত আইনগত ব্যবস্থা

ক. দাসদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। দাস পরিবারের কারো বিরুদ্ধে আক্রমণ মোকাবেলায় পুরো পরিবার ব্যবস্থা নিতে পারত।

খ. দাস মুক্ত করাকে আখেরাতে মুক্তির অন্যতম উপায় বলে উল্লেখ করে কুরআন দাস প্রথা উচ্ছেদের সূচনা করে।

গ. বিভিন্ন পাপের জরিমানা (কাফ্‌ফারা) হিসেবে কুরআন দাসমুক্তিকে উল্লেখ করে। যেমন- অনিচ্ছাকৃত হত্যা, ওয়াদা ভঙ্গ, ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ এবং আদজিহার-এর মাধ্যমে তালাক। এভাবে যখনই কেউ এসব পাপ করত তখন সে তার কাফফারা হিসেবে দাসমুক্ত করত। এছাড়াও এ বিধান ছিল যে কেউ ঠাট্টাবশতঃ কোন দাসকে যদি বলত, তুমি মুক্ত হবে সে মুক্ত হয়ে যেত।

## ৬. ইসলাম এককথায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেনি কেন

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখেছি যে সপ্তম শতকে বিশ্ববাসী দাসপ্রথা এক দৃঢ় আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই অষ্টাদশ শতকে আমেরিকায় যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদ করা হল তখনকার গৃহযুদ্ধ এবং কর্মচ্যুত দাসদের নির্মম বেকারত্ব ও দারিদ্রের কথা আমরা ভুলে যাইনি। কাজেই দাসপ্রথা উচ্ছেদের আগে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কাজ দরকার ছিল। এ ব্যাপারে ইসলাম সফল ছিল। ইসলাম মানুষের মনকে দাসপ্রথার প্রতিকূলে নিয়ে যায়। তার উপর দাস এর উৎস- ইসলাম বন্ধ করে দেয়।

যেমন, মানুষকে দাসত্বের জন্য অপহরণ নিষেধ করা হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ শোধে রাষ্ট্র এগিয়ে আসে আর যুদ্ধবন্দীদের মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের সাথে বিনিময় ও পণ্যের মাধ্যমে মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এসব কারণে ইসলামের অভ্যুদয়ে দাসের উৎস বন্ধ হয়ে যায়।

## ৭. রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হল না কেন

যদিও রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় মদপান নিষিদ্ধ হয় তবুও তাঁর জীবদ্দশায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়নি। কারণ মদপান ছিল একটি ব্যক্তিগত সমস্যা, যা ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার আগেই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে দাসপ্রথা ছিল একটি গভীর সামাজিক সমস্যা, এমনকি রাসূলের (সঃ) মৃত্যুর এক প্রজন্ম পরেই অনেক মুসলমান দাসদের ব্যাপারে ইসলামের আইন ভঙ্গ শুরু করে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৪ঃ১, ২ঃ২২১, ৪ঃ২৫

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৩৬, ২ঃ২৫৬

রাসূল (সঃ) বলেন, "আমি তোমাদের দু'টি বিষয় মনে রাখতে বলি- একটি নামাজ এবং অন্যটি তোমাদের ডান হাতের মালিকানাভুক্তদের (অর্থাৎ দাসদের সাথে সুব্যবহার)।"

প্রশ্ন-৫ ঃ এক হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি দাসকে হত্যা করে আমরা তাকে হত্যা করব, যে দাসকে কষ্ট দেয় আমরা তাকে কষ্ট দিব, যে দাসকে খোজা করে (Sterilize) আমরা তাকে খোজা করব।"

# জি- ৯ দাসপ্রথার অবসান প্রসঙ্গ- ২

**প্রশ্ন ঃ**

১. এটা কি সত্য যে ইসলাম যুদ্ধবন্দী ছাড়া আর সব দাসের উৎস বন্ধ করেছিল?

২. যদিও ইসলাম দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেনি তবুও এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাতে বোঝা যায় ইসলাম এটাকে একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বহাল রেখেছিল?

৩. দাসী (Concubines) প্রশ্নে ইসলামের অবস্থান কি?

৪. ইসলামে দাসের পক্ষে নিজকে মুক্ত করার কোন সুযোগ ছিল কি? নাকি সে মালিকের ইচ্ছার অধীন ছিল?

৫. মুক্তিমূল্য গ্রহণের বিনিময়ে দাসের মুক্তি দিতে মালিক কি বাধ্য?

৬. কিভাবে একজন দাস তার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবে?

**উত্তর ঃ**

## ১. যুদ্ধবন্দী ছাড়া আর সব দাসের উৎস কি ইসলাম বন্ধ করেছিল

এটা সত্য যে ইসলাম শুরুতেই যুদ্ধবন্দী ছাড়া আর সব দাসের উৎস বন্ধ করে। যদিও মুসলমানরা কখনও শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে না। তারা জাতীয়তা ও প্রভুত্ব কায়েমের জন্য অথবা তাদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতেও যুদ্ধ করে না। তারা এ উদ্দেশ্যেও অন্য রাজ্য আক্রমণ করেনা যে সেখান থেকে মানুষ ধরে দাস বানাবে। ইসলামী আইনে শুধু দুটো ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমোদন আছে–

ক. আগ্রাসন প্রতিহত করতে।

খ. নির্যাতিত মানুষকে উদ্ধার করতে।

এসব যুদ্ধে মুসলমানরা যাদের বন্দী করত তারা মূলতঃ আগ্রাসী বা হামলাকারী। কাজেই এদের বন্দী করার যৌক্তিক কারণ আছে। এদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ছিল যে এদের সাথে প্রথমতঃ সৎ ব্যবহার করতে হবে। দাসত্বই তাদের একমাত্র পরিণতি ছিল না। মুসলিম বন্দীর সাথে বিনিময়, অর্থমূল্যে মুক্তি এবং মুসলমানদের লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা ছিল। তারপরও এটা বলা যায় যে তখন এমন একটা যুগ যখন জেলখানা গড়ে উঠেনি। ফলে যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন মুসলিমের জিম্মায় দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

## ২. ইসলাম যে দাসপ্রথাকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নিয়েছিল তার প্রমাণ

প্রথমতঃ ইসলাম যুদ্ধবন্দী ছাড়া আর সব দাস সংগ্রহের উৎস নিষিদ্ধ করে। অতঃপর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কুরআন নীচের দুটো ব্যবস্থার যে কোন একটি নিতে বলে–

ক. তাদের নিঃশর্ত মুক্তি ও ক্ষমা।

খ. অর্থের বিনিময়ে অথবা মুসলিম যুদ্ধবন্দীর বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেয়া অথবা মুসলমান সমাজের উন্নয়নে তাদের মেধা বা শ্রম খাটাবার বিনিময়ে মুক্তি দেয়া।

## ৩. দাসীদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন সেমেটিকদের মধ্যে এই প্রথা ছিল। নারীদের এই বিশেষ দাসত্ব ইসলামে অন্য সব দাসত্বের মতই গ্রহণযোগ্য নয়। দাস প্রথা অবসানে ইসলাম যেমন ব্যবস্থা নিয়েছে, তেমনি এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার ব্যাপারেও ইসলাম একই ব্যবস্থা নিয়েছে।

ইসলাম নারী যুদ্ধবন্দীদের সাথে সাথে পুরুষ যুদ্ধবন্দীদের মতই সুব্যবহার করতে বলেছে। নারী যুদ্ধবন্দীদের বিপদের সম্ভাবনা বেশী কারণ তারা প্রায় সবাই পিতা/স্বামী/ ভাইকে যুদ্ধে হারায়। ফলে তারা যুদ্ধ শেষে আর্থিক নিরাপত্তার সংকটে পড়ে পতিতাবৃত্তির শিকার হতে পারে। এসব বিপদের কথা চিন্তা করেই ইসলাম তাদের সাথে অনুমোদিত বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। এই অনুমোদিত বসবাসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. অনুমোদিত বসবাসের সুযোগটা প্রায় বিয়ের অনুরূপ কিছু আলেম মনে করেন যে, বিবাহ ছাড়া এরকম মিলনের অনুমতি ইসলামে নেই।

(দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ আসাদ- 'দি মেসেজ অব দি কুরআন', টিকা ২৬, সুরা নিসা – অনুবাদক) মহিলা যুদ্ধবন্দী প্রায় সকল বিষয়েই স্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করত।

খ. বৈধ বিয়ের সাথে এর একটি মাত্র পার্থক্য ছিল যে এখানে স্ত্রীর মতামত (কবুল)-এর প্রয়োজন থাকত না। যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

গ. মহিলা 'বন্দী' হিসেবে থাকত না বরং সব ধরনের চলাফেরার স্বাধীনতাই পেতেন, এবং ভরণপোষণের নিশ্চয়তাসহ নিরাপত্তা পেতেন।

ঘ. প্রাচীন যুগের মত মহিলা বন্দী অগণিত সৈনিকের ভোগ লালসার শিকার হত না বরং একজন স্বামী-সংসার দুটোই পেত। এতে মহিলা বন্দী এবং সৈনিক উভয়েই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হত।

ঙ. দাসীদের মত এদের সন্তানরা দাস হত না বরং মহিলা বন্দীর কোন সন্তান হলে সে হত মুক্ত এবং তার স্বামীর/ আশ্রয়দাতার মৃত্যুর পর সেও মুক্তি পেত।

## ৪. দাসের পক্ষে নিজকে মুক্ত করার সুযোগ

সর্বপ্রথম ইসলামই 'মুকাতাবা' নামে এক স্কীম ঘোষণা করে। যার মাধ্যমে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে আলাপ করে উভয়ে সম্মত একটি মুক্তিমূল্য ঠিক করবে এবং ক্রীতদাস ধীরে ধীরে উক্ত অর্থ পরিশোধ করে মুক্ত হবে। এভাবে মুকাতাবা দাসমুক্তির সূচনা করে।

## ৫. মুক্তিমূল্য গ্রহণের বিনিময়ে দাসের মুক্তি দিতে মালিক কি বাধ্য

(মালিক কি পূর্বের চুক্তি অমান্য করতে পারে)

কুরআনের যে আয়াতে মুকাতাবার বিনিময়ে দাসমুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে আদেশ সূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তাদের মুক্তি দাও'; এমন বলা হয়নি যে, 'তাদের মুকতাবার বিনিময়ে মুক্তি দিতে পার'। বরং কুরআনে মালিককে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন দাসকে তার মুক্তিমূল্য অর্জনে সাহায্য করে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর একজন সহযোগীকে যিনি মুকাতাবা অস্বীকার করতে চাচ্ছিলেন, তাকে অবিলম্বে দাস মুক্ত করার আদেশ দেন। যদি কুরআনের আইনে এমন বাধ্যবাধকতা না থাকত তবে খলিফা এমন আদেশ করতেন না।

## ৬. দাস কিভাবে তার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবে

কুরআন যাকাত বিতরণের কিছু নির্দিষ্ট খাত উল্লেখ করেছে যার একটি হল 'ক্রীতদাসকে মুক্ত করা' কাজেই প্রত্যাশী ক্রীতদাস যাকাতদাতা মুসলমানদের কাছ থেকে সহজেই যাকাত সংগ্রহ করে তার মুক্তিমূল্য অর্জন করতে পারত।

### সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দী মুশরিকরা মুসলমানদের ব্যবহারে এত মোহিত হয়েছিল যে তাদের অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৪৭ঃ৪

প্রশ্ন-৩ ঃ রাসূল (সঃ)-এর হাদিসে আছে, যদি কোন ব্যক্তি তার অধীনা যুদ্ধবন্দীকে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে মুসলমান বানায় এবং তাকে মুক্ত করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করে, তবে সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ২৪ঃ৩৩

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৯ঃ৬০
হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় জনৈক ক্রীতদাস তাঁকে এসে জানায় যে সে মুকাতাবার অর্থ সংগ্রহ করতে পারছে না। তখন আলী (রাঃ) জনগণের কাছ থেকে তার মুক্তির প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে দেন।

# জি-১০ ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব- ভূমিকা

**প্রশ্ন ঃ**

১. পরিবারের গুরুত্ব কি এবং ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থায় এর অবস্থান কোথায়?

২. ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব আলোচনায় মূলতঃ কোন বিষয়গুলো আসে?

৩. ইসলামী মতে পরিবারের সংজ্ঞা কি?

৪. এটা কি সত্য যে মুসলিম পরিবার মূলতঃ একটি বর্ধিত পরিবার (Extended Family)?

৫. কেউ যদি বলে যে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য ও সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে কোন আইনের প্রয়োজন নেই তবে তার উত্তর কি হবে?

৬. ইসলামের পারিবারিক কাঠামোতে রক্ত সম্পর্কের ভূমিকা কি?

৭. কোন পালিত সন্তানের পিতৃপরিচয় পাওয়া না গেলে পালনকারী পরিবারের নামে তার নাম রাখা যাবে কি?

৮. সন্তান পালক নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ?

৯. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের মূল উদ্দেশ্য ও কাজ কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব

ইসলাম পরিবারকে সমাজের একক (The cornerstone of the social system) হিসেবেই চিন্তা করে। পরিবারের শান্তি, ঐক্য ও সংহতি সমাজকেই সুসংহত ও শান্তিময় করে। আবার পরিবারের বিপর্যয় সমাজে বিপর্যয় আনে। পরিবারের দুর্বলতা শুধুমাত্র কিশোর-অপরাধ, ড্রাগ-মাদকাসক্তি, অবাধ যৌনাচার ও তালাকেরই সৃষ্টি করেনা বরং সমাজ ব্যবস্থারও ধ্বংসের সূচনা করে।

## ২. ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় মূলতঃ যেসব প্রসঙ্গ আসে

ক. পরিবারের সংজ্ঞা, রক্তের সম্পর্ক (Lineage) এবং পালিত সন্তান সংক্রান্ত।

খ. পরিবারের ভিত্তি এবং কেন্দ্র হিসেবে নারীর ভূমিকা।

গ. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব।

ঘ. পরিবারের গঠন।

ঙ. পরিবারে পিতা-মাতা ও সন্তানের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

চ. পারিবারিক সমস্যা : বৈবাহিক সমস্যা, তালাক ও পুনর্বিবাহ

ছ. ইসলামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন।

## ৩. ইসলামে পরিবারের সংজ্ঞা

ইসলামে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতিকে এক পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে এক পরিবার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে প্রায়ই মানব জাতিকে 'আদমের (আঃ) সন্তান' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এরপর ঈমানদারদের এক পরিবারের সদস্য হিসেবে বলা হয়েছে। উম্মাহ্ অর্থ যারা এক আল্লাহ এবং তাঁর কিতাবসমূহ ও নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনেন। সর্বোপরি ইসলামে পরিবার বলতে বিবাহিত ও রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধদের বোঝানো হয়েছে।

## ৪. মুসলিম পরিবার কি প্রকৃত অর্থে বর্ধিত পরিবার (Extended Family)

নিউক্লিয়াস পরিবারের ধারণাটি আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের। যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরাই থাকেন। বর্ধিত পরিবারের ধারণাটি প্রাচ্য দেশীয় যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সন্তান, পিতামাতা, পিতামহ, মাতামহ এবং কখনো কখনো এক বাড়ীতে বাসরত জ্ঞাতি ভাইদের পরিবারসমূহ। মুসলিম পরিবার-নিউক্লিয়ার পরিবার অথবা বর্ধিত পরিবার- কোনটি হবে এমন কোন আদেশ ইসলামে নেই। এখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান ও সন্তানের পিতামহ-মাতামহ (First degree relatives) নিয়েই সাধারণতঃ পরিবার গঠিত হয়। এছাড়া দ্বিতীয় ধারা (Second degree relatives) বা তৃতীয় ধারার (Third degree relatives) আত্মীয়রাও একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। ইসলামে প্রথম ধারার আত্মীয়দের অধিকারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান আছে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাজহাবে (Schools of jurisprudence)-এ বিভিন্নভাবে উল্লিখিত।

## ৫. পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে আইনের প্রয়োজন কেন

যদিও পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব কি হবে তা মানুষ সহজাতভাবেই অবহিত, তবুও এই সহজাত প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিকভাবে চালিত করতেই আইনের প্রয়োজন আছে। পরিবারের সকল সদস্যদের অধিকার রক্ষার গ্যারান্টি হিসেবেই আইন আবশ্যক। নচেৎ কোন সন্তানের প্রতি বেশি আবেগবশতঃ বাবা-মা অন্য সন্তানকে বঞ্চিত করেও বসতে পারেন। মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবারের সকল সদস্যের ন্যূনতম অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। এজন্য ইসলামে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক-সহজাত অনুভূতি ও আইন-উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে তৈরী হয়।

## ৬. ইসলামের পারিবারিক কাঠামোতে রক্ত সম্পর্কের ভূমিকা

মুসলিম পরিবারে রক্তের সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এ থেকেই পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিধান সৃষ্ট। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে কেউ তার পালক সন্তানকে নিজের সন্তানরূপে দাবী করতে

পারবে না। কোন পালক সন্তানও নিজকে তার পালক পিতা-মাতার সন্তান বলে দাবী করতে পারবে না।

এক্ষেত্রে ইসলামের আর দু'টি বিধান হচ্ছে যে ঃ

ক. কেউ তার নিজ পরিবারের নামে পালিত সন্তানের নাম রাখতে পারবে না।

খ. কেউ প্রাচীন যুগের 'আজ-জিহার' পন্থায় তালাক দিতে পারবে না (স্বামী রাগের বশে স্ত্রীকে বলবে তুমি আমার মায়ের মত তাহলে তালাক হয়ে যাবে) কারণ এটা হচ্ছে মিথ্যাচার।

## ৭. পালিত সন্তানের পিতৃপরিচয় পাওয়া না গেলে পালক পিতা-মাতার পরিবারের নামে তার নাম রাখা যাবে কি?

কুরআন পালক সন্তান পালনকারী মুসলমানদের আদেশ দেয় 'তাদের পিতৃ পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে'। যদি তাদের পিতৃপরিচয় না থাকে তবে কুরআন বলে, 'তারা তোমাদের ঈমানী ভাই, এবং তোমাদের পোষ্য, তাদের দয়ার সাথে লালন কর। কিন্তু তাদের পরিবারের নামে নাম রাখা ঠিক নয়।

## ৮. সন্তান পালক নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ?

যদি পালক নেয়া বলতে কেউ এটা বোঝাতে চান যে তিনি সন্তান দত্তক নেবেন, তাকে নিজের সন্তান পরিচয়ে বড় করবেন, তাকে নিজের সন্তানের মত সম্পদে উত্তরাধিকার দেবেন- তবে এই অর্থে সন্তান পালক নেয়া অবৈধ। কারণ এক্ষেত্রে পালিত সন্তানের নিজ বংশ পরিচয় লুকান হয় বা হারিয়ে যায় এবং নিজ সন্তান ও আত্মীয়দের হক নষ্ট করা হয়। আর যদি পালক নেয়া বলতে কেউ এটা বোঝান যে, কোন অসহায় ও এতিম বাচ্চাকে দয়াবশতঃ লালন পালন করে বড় করা হল তার পূর্ব পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে, তবে এটা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু বৈধই নয় বরং পরম সওয়াবের কাজ। আল্লাহ এমন ব্যক্তিদের জন্য বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও পালিত শিশু সম্পদে উত্তরাধিকার পায়না তবুও পালনকারী ইচ্ছে করলে তার সম্পদের কিছু অংশ (সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ) দান করতে পারেন।

## ৯. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের মর্যাদা ও বিশেষত্ব ঃ

ক. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধুমাত্র মানুষের ঐচ্ছিক বা স্বতঃস্ফূর্ত কোন প্রতিষ্ঠান নয় বরং আল্লাহ নির্ধারিত আধ্যাত্মিক ইনস্টিটিউশন। পরিবারের নামে কোন কোন সমাজে যে সব বিকৃত চর্চা চলছে (যৌথ বিবাহ, সমকামী বিবাহ ইত্যাদি) ইসলামে তা নিষেধ।

খ. পরিবার এবং বিয়ে ইসলামে এক পবিত্র বন্ধন হিসেবে স্বীকৃত, যা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

গ. পরিবারের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস আল্লাহ তায়ালার বিশ্বাস ও আনুগত্যকে অতিক্রম করতে পারবে না।

ঘ. ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে 'সমমর্যাদা' (equality) প্রদান করে। স্বামী-স্ত্রী সম্মতির ভিত্তিতে আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে পরিবারের সকল দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারেন।

## ১০. পরিবারের কাজ ও লক্ষ্য ঃ

ক. সন্তান জন্মের মাধ্যমে মানব বংশধারা রক্ষা।

খ. একমাত্র বৈধ যৌনানন্দ লাভের সুযোগ দিয়ে সমাজ এবং ব্যক্তির নৈতিক জীবন রক্ষা করা।

গ. সন্তানের সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি।

ঘ. মানুষের মানবিক এবং আবেগপ্রসূত চাহিদা পূরণ।

ঙ. সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চ. মানুষকে কঠোর পরিশ্রমী করা, দায়িত্ব অনুভূতি জাগ্রত করে পরিবারের স্বার্থে ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরী করা।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৪ঃ১, ৪৯ঃ১০

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৩৩ঃ৪-৬

প্রশ্ন-৭ ঃ আল কুরআন ৩৩ঃ৫

রাসূল (সঃ) তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ)-এর নাম দিয়েছিলেন যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ। কিন্তু যখন পালিত সন্তানকে নিজ পরিবারের নামে নাম না দেবার আদেশ আসে তখন তাঁর নাম তাঁর পিতার নামে রাখেন যায়েদ ইবনে হারিস।

# জি- ১১ প্রাচীন সভ্যতা সমূহে নারীর অবস্থান

**প্রশ্ন ঃ**

১. প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন কোথায়?

২. প্রাচীন প্রাচ্য দেশীয় সভ্যতা সমূহে নারীর অবস্থান কেমন ছিল?

৩. প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা সমূহে নারীর অবস্থান কি কিছুটা ভাল ছিল?

৪. প্রাচীনকালে মধ্যপ্রাচ্যে নারীরা কি মর্যাদা পেত?

৫. নারীর প্রতি এই বিশ্বজনীন নেতিবাচক আচরণের কোন ব্যতিক্রম কি প্রাচীন সভ্যতার কোথাও দেখা যায়?

৬. বাইবেল এবং কুরআনে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

**উত্তর ঃ**

### ১. বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন প্রসঙ্গে

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রদানে তৎকালীন সকল সভ্যতার চেয়ে ইসলাম যে কত অগ্রগামী ছিল তা অনুধাবন করার জন্যেই বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। যেহেতু ইসলাম ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান সেহেতু এমন হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

### ২. প্রাচীন প্রাচ্য দেশীয় সভ্যতা সমূহে নারীর অবস্থান

নারীদের প্রতি প্রাচীন চীনাদের আচরণের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে হু সুয়ান নামক কবির লেখায়, "নারী হওয়া বড় দুঃখের, পৃথিবীতে কোন কিছুই নারীর মত এত সস্তা নয়।" কনফুসিয়াস বলেন, "নারীর মূল কাজ আনুগত্য, শৈশব কৈশোরে পিতার, বিয়ের পর স্বামীর এবং বিধবা হবার পর পুত্রের।" তিনি আরও বলেন যে, এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র (অথচ ইসলামে আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র আনুগত্য হারাম)। বৌদ্ধ ধর্মেও নারীকে নীচ এবং পাপে পূর্ণ হিসেবেই দেখানো হয়েছে, বলা হয়েছে নারীর মত ভয়াবহ আর কিছুই নেই।

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা আরও খারাপ ছিল। বেদ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়া অথবা কোন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নারীর কোন ভূমিকা ছিলনা। বিধবা হবার পর পুনর্বিবাহ বা সম্পত্তির অধিকার তো দূরের কথা, স্বামীর সাথে এক চিতায় সহমরণই ছিল তার একমাত্র পরিণতি।

### ৩. পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর অবস্থান

গ্রীক সভ্যতায় নারী ছিল পিতা, ভাই বা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের অধীনা কেননা তাদেরকে minor মনে করা হত। বিয়ের সময় তাদের মতামতের কোন প্রয়োজন হত না এবং পিতার কাছ থেকে সে যেত তার স্বামী নামক প্রভুর ঘরে। রোমান সভ্যতায় নারী যে

পৃথকভাবে কিছু করতে সক্ষম তাই বিশ্বাস করা হত না (regarded as 'babes')। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা অনুসারে কোন মহিলা বিয়ে করলে স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পদের মালিক হত তার স্বামী। সেই সম্পত্তি আর সে ফেরত নিতে বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করতেও পারত না। মহিলারা কোন উইল বা চুক্তি করতে পারত না; এমনকি নিজের সম্পদের ব্যাপারেও না।

## ৪. প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে নারীর অবস্থান

প্রাচীন আরবে হিব্রু এবং আরবী রীতি চালু ছিল। প্রাচীনকালে আরবরা যখন শুনতো তার কন্যা সন্তান হয়েছে তখন রাগে তাদের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করতো। এটা ছিল এমন একটা যুগ যখন কন্যাশিশুদের জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা হত। ধারণা করা হত যে কন্যাশিশু পিতার অসম্মানের কারণ হবে। পক্ষান্তরে পুত্রের জন্ম সংবাদে তারা আনন্দে মতোয়ারা হত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানরা পিতার বিধবা স্ত্রীদেরও মালিক হত।

## ৫. বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি এই নেতিবাচক আচরণের ব্যতিক্রম

এটা ঢালাওভাবে বলা ভুল হবে যে সকল প্রাচীন সভ্যতাই সকল ক্ষেত্রে নারীকে অবমূল্যায়ন করত বা তার প্রতি নেতিবাচক আচরণ দেখাত। এর কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয় ছিল। কোন কোন সভ্যতায় ভদ্রঘরের নারীদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। স্বীয় অধ্যবসায় ও মেধার গুণে কোন কোন নারী সমাজে বিশেষ প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত বেশ কিছু সভ্যতায় দেখা যায় প্রভুকে নারীর আকৃতিতে কল্পনা করা হয়েছে। মিসর, বেবিলন, গ্রীস, সুমারিয়া ও রোমে একজন মহিলা দেবীর পূজা করা হত যার থেকে অন্য দেব-দেবীর সৃষ্টি। এসব মিথলজির সাথে বাইবেলে বর্ণিত গড-দি-মাদার এবং তাঁর 'পবিত্র পুত্রের' মিল লক্ষ্য করা যায়।

## ৬. বাইবেল ও কুরআনে নারীর তুলনামূলক অবস্থান

বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর অবস্থান আলোচনার পর তিনটি প্রধান ধর্মে যথা ইহুদী, খ্রীস্টান ও ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। এখানে ভূমিকায় এতটুকু বলা যায় যে, এই তিন ধর্মে প্রদত্ত নারীর অধিকারে কোথাও কোথাও মিল আছে, আবার কোথাও অমিল আছে। কিন্তু ইহুদী ও খ্রীস্টান প্রচার মাধ্যমে ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে এত বেশী নেতিবাচক প্রচারণা পাশ্চাত্যে রয়েছে যা পাশ্চাত্যের বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিচ্ছে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২-৪ ঃ Encyclopaedia Britannica
Marriage East and West by- 'David and Vera Mace History of Civilizations.- Vol. 13. E.A Allen

প্রশ্ন-৫ ঃ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় এই দেবীর নাম ছিল আইসিস (Isis), ব্যাবিলনে তিয়ামাত (Tiamat), গ্রীসে দোমত্রি (Demetre) এবং রোমে ম্যালেন (Malen)।

# জি- ১২ ইহুদী, খ্রীস্টান এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থে নারী- ১

**প্রশ্ন ঃ**

১. কুরআন এবং বাইবেলে বর্ণিত নারীর মর্যাদা ও অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনায় কোন্ কোন্ বিষয় আসে?

২. বিবি হাওয়া (আঃ)-এর জন্ম সংক্রান্ত বিষয়ে দু'টো ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় কি কি মিল এবং অমিল আছে?

৩. প্রথম পাপের জন্য কে দায়ী ছিল? আদম (আঃ) নাকি বিবি হাওয়া (আঃ)?

৪. প্রথম পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট সরীসৃপ (সাপ)-এর কথা কি শুধু বাইবেলেই আছে?

৫. গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব প্রসঙ্গে ইসলাম, ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি কি মিল-অমিল আছে?

৬. মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে ইসলাম যে বিধান দেয় ইহুদী-খ্রীস্ট ধর্মেও কি একই রকম বিধান দেয়?

**উত্তর ঃ**

১. নারীর মর্যাদা ও অবস্থান প্রশ্নে কুরআন ও বাইবেলের নির্দেশনার তুলনামূলক আলোচনায় যেসব বিষয় আসে ঃ

ক. বিবি হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ।

খ. পৃথিবীর প্রথম পাপ ও তার জন্য কে দায়ী।

গ. গর্ভাবস্থা এবং প্রসবকালীন যন্ত্রণার প্রসঙ্গ।

ঘ. মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব সংক্রান্ত প্রসঙ্গ।

## ২. বিবি হাওয়া (আঃ)-এর জন্ম প্রসঙ্গে বাইবেল ও কুরআন

বাইবেল ও কুরআন উভয়ই এ বিষয়ে একমত যে প্রথমে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়, অতঃপর বিবি হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টি। এখানে বাইবেল আর একটু বর্ণনা দেয় যে হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয় (যার ভিত্তিতে অনেকে নারী বাঁকা ও ভঙ্গুর স্বভাবের বলে থাকে)। কিন্তু কুরআনে এরকম কিছুর উল্লেখ নেই। বরং কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ প্রথমে এক আত্মার সৃষ্টি করেন এবং তা থেকেই উভয়ের সৃষ্টি। কাজেই এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনায় নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা এবং সম অধিকারের ইঙ্গিত আছে।

## ৩. প্রথম পাপ (আদি পাপ)-এর জন্য দায়ী কে

ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মে এ বিষয় উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-কে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করেন (কুরআনে

অবশ্য গাছের নাম ও প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়নি)। এই নিষেধাজ্ঞা যে অমান্য করা হয়েছিল তাও সব ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের কাজটি কিভাবে হয়েছিল তার বর্ণনায় ধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। বাইবেল এ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য প্রাথমিকভাবে বিবি হাওয়াকে দায়ী করে। বাইবেল বলে বিবি হাওয়া (আঃ) এক সরীসৃপ কর্তৃক উক্ত গাছ থেকে ফল খেতে প্রলুব্ধ হন এবং তিনি নিজে আদম (আঃ)-কে প্রলুব্ধ করেন। কুরআনের বর্ণনায় এমন কোন সরীসৃপের উল্লেখ নেই। কুরআন বলে আদম (আঃ)-এর বিশেষ মর্যাদায় হিংসাগ্রস্ত শয়তান প্রথম থেকেই তাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কুরআনের পর পর আটটি আয়াতে যেখানে আদম-হাওয়ার ঘটনা বিবৃত হয়েছে সেখানে পনের বার তারা দু'জন (Both of them) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই ভুলের জন্য কুরআনে নির্দিষ্টভাবে কাউকে দায়ী করা হয়নি। বরং কুরআন ও হাদিসের বর্ণনায় প্রাথমিক দায়িত্ব কিছুটা হলেও আদম (আঃ)-এর উপর দেয়া হয়েছে। কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করেন। কাজেই কুরআনে কোন আদিপাপের ধারণা নেই।

## ৪. সরীসৃপের ধারণাটি কি শুধু বাইবেলেই এসেছে?

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে বহু প্রাচীন ধর্মে সাপকে শয়তানের প্রতীক রূপে দেখান হয়েছে। এমনকি দেবমাতার প্রাচীন চিত্রে দেখা যায় জীবন বৃক্ষকে পেঁচিয়ে রেখেছে সাপ। সাপ প্রসঙ্গে এই ধারণা হিব্রু ধর্মগ্রন্থ উদ্ভবের বহু আগেই প্রচলিত ছিল।

## ৫. গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব প্রসঙ্গে ইহুদী-খ্রীস্ট মত ও ইসলাম

বাইবেল বলে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আদি পাপ করায় বিবি হাওয়াকে স্রষ্টা এই অভিশাপ দেন যে তার পাপের জন্য তিনি তার কষ্টকে বহুগুণে বাড়াবেন। এই কষ্টই প্রত্যেক নারী গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মের সময় ভোগ করে। সন্তান জন্মের পর নারীর পবিত্রতা সম্পর্কে বাইবেল যা বলে তা লক্ষ্য করার মত। যদি মহিলা পুত্র সন্তান জন্ম দেয় তবে সে একসপ্তাহ ও আরও তেত্রিশ দিনের জন্য অপবিত্র (অশুচি)। যদি সে কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তবে দুই সপ্তাহ ও আরও ছেষট্টি দিনের জন্য অপবিত্র। এই অপবিত্র মেয়াদ শেষে সে ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে নিজের অপবিত্রতা এবং পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে।

পক্ষান্তরে ইসলাম নারীর গর্ভাবস্থাকে মর্যাদা ও সহানুভূতির সাথে বর্ণনা করেছে। ইসলাম বলে এই সময় স্বামী-স্ত্রী ধার্মিক সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে যৌথভাবে দোয়া করবে। ইসলাম সন্তানদের আদেশ দেয় পিতা-মাতার প্রতি, বিশেষভাবে মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে কারণ তিনি দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। হাদিসে গর্ভাবস্থাকে জেহাদের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে প্রসবকালীন মৃত নারী শহীদের মর্যাদা

পাবে! সন্তান জন্মের পর নামাজ, রোজা এবং স্বামীর সহবাসের পূর্বে অপেক্ষার সময়টি ইসলামে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের এবং এটি কোন ঘৃণার বা প্রায়শ্চিত্তের বিষয় নয়। শুধু স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয় (Cleanliness & Hyegine)।

## ৬ মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে দুই ধারার দৃষ্টিভঙ্গি

বাইবেল বলে মহিলাদের মাসিকের সময় তাদের সাতদিন 'পৃথক' রাখতে হবে। যদি এর মাঝে কেউ তাদের স্পর্শ করে অথবা তাদের বিছানা স্পর্শ , এমনকি তারা যে জায়গায় বসেছে সে জায়গা স্পর্শ করে তবে সেও পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র হবে এবং তাকে গোসল করতে হবে। এই সাতদিন পর মহিলাকে ধর্মযাজকের কাছে উপস্থিত হয়ে দু'বার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে- একটি অপবিত্রতার জন্য, অপরটি পাপের জন্য, কারণ ঋতুস্রাব একটি পাপ।

পক্ষান্তরে কুরআন নারীর ঋতুস্রাবকে কোন পাপ বা নোংরামী হিসেবে বর্ণনা করেনি। বা এর জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তও নির্ধারণ করেনি। যৌক্তিক কারণেই স্বামীর সাথে সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে পৃথক বসবাস বা পরিবারের অন্যান্য কাজ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়নি। খোদ রাসূল (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের ঋতুস্রাবের সময় আলাদা বিছানায় থাকতেন না। কুরআনে এটাকে 'ব্যাথা' হিসেবে বর্ণনা করেছে যাতে মেয়েদের প্রতি আরও সহানুভূতি প্রকাশ পায়। পরিশেষে মাসিক ঋতুস্রাব শেষ হলে প্রায়শ্চিত্ত (atonement) করার কোন প্রশ্নই আসে না, বরং কেবল গোসল করলেই হয়।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৪ঃ১ জেনেসিস ২ঃ২-১২

প্রশ্ন-৩ ঃ জেনেসিস- ৩ (Chapter-3), ৩৮ঃ৭১, ৭ঃ১১, ২ঃ৩১, ১৫ঃ২৮, ১৭ঃ৬১, ২০ঃ১১৫
রাসূল (সঃ) বলেন যে, হাশরের দিন মানুষ আদম (আঃ)-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ (শাফায়াত) করতে বলবে, তখন তিনি বলবেন, "আমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি, কাজেই আমি সুপারিশ করতে পারবো না।"

প্রশ্ন-৫ ঃ জেনেসিস ৩ঃ১৬, ৭ঃ১৮৯, ৩১ঃ১৪, ৪৬ঃ১৫
রাসূল (সঃ) বলেন, যে মহিলা সন্তান জন্মের পর মারা যায়, তার সন্তান তাকে বেহেস্তে টেনে নিয়ে যায়'।

প্রশ্ন-৬ ঃ Lev. Ch. 15 V. 19

# জি- ১৩ ইহুদী, খ্রীস্টান এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থে নারী- ২

**প্রশ্ন ঃ**

১. ধর্ষণের শিকার নারীর প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুরআন ও বাইবেল কি বলেছে?

২. যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে তবে সে ক্ষেত্রে দুই ধর্মগ্রন্থে কি বিধান দেয়?

৩. দুই ধর্মগ্রন্থে বিয়ে সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়?

৪. অনেক খ্রীষ্টান বলেন যে, যেহেতু ওল্ড টেস্টামেন্ট এখন চালু নেই সেহেতু এর সাথে কুরআনের তুলনা করা ঠিক না, এই যুক্তির ব্যাপারে কি বলবেন?

৫. নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের মতে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান কেমন?

৬. যীশুর অনুসারীরা কি এই প্রশ্নে যীশুর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিল?

৭. মেরী (রাঃ)-এর ব্যাপারে সম্মান (Veneration) পোষণকারী পল-এর নারীর অধিকার প্রশ্নে অবস্থান কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

৮. নারী সংক্রান্ত পল-এর দৃষ্টিভঙ্গি যে চার্চকে প্রভাবিত করেছিল তার কোন প্রমাণ আছে কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. ধর্ষণের শিকার নারীর প্রতি আচরণ প্রশ্নে ইসলাম ও খৃষ্টবাদ

ওল্ড টেস্টমেন্ট মতে যদি কেউ কোন বিবাহিত মহিলাকে ধর্ষণ করে তবে উভয়কেই পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে। যদি ধর্ষিতা অবিবাহিতা হয় তবে ধর্ষক ধর্ষিতার পিতাকে জরিমানা দেবে এবং ধর্ষিতাকে বিয়ে করবে এবং তাকে কখনো তালাক দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলাম বলে ধর্ষিতা হচ্ছে আক্রমণের শিকার; কাজেই তার কোন শাস্তির প্রশ্ন উঠে না। ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ষিতার পিতাকে বিপুল অর্থ জরিমানা দিয়ে সে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। ইসলাম কখনই ধর্ষকের সাথে ধর্ষিতার বিয়ের বিধান দেয়না কারণ এটা তো ধর্ষকের জন্য শাস্তি না হয়ে উল্টো পুরস্কার হয়ে দেখা দেয়। বরং ইসলাম নর-নারী উভয়কে অসৎ লোককে (Unchaste) বিয়ে না করতে বলে, আর ধর্ষক তো নিঃসন্দেহে অসৎ।

## ২. স্বামী কর্তৃক ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত স্ত্রী সম্পর্কে দুই ধর্ম যা বলে

এক্ষেত্রে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে অভিযুক্ত স্ত্রীকে ধর্মযাজক নানাভাবে জেরা করবেন। যার এক পর্যায়ে তিনি কিছু ময়লা, তিক্ত পানি নিয়ে তাকে স্বীকারোক্তি দিতে বলবেন। যদি সে না দেয় তবে তার পেট ফুলে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে ঐ ময়লা, তিক্ত পানি খেতে বাধ্য করা হবে। অর্থাৎ সেখানে স্বামীর অভিযোগ সত্য ধরে নিয়েই এগিয়ে যাওয়া হয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম বলে এক্ষেত্রে স্বামীকে তার বক্তব্যের সত্যতার বিষয়ে পাঁচবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলতে হবে যে তার দাবী সত্য। এর জবাবে মহিলাও যদি পাঁচবার কসম খেয়ে বলে যে সে নির্দোষ তবে আইনের চোখে সে নির্দোষই থেকে যাবে এবং অবশেষে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

কোন ব্যক্তি অন্য কোন স্ত্রীলোক সম্পর্কে ব্যাভিচারের অভিযোগ উত্থাপনই করতে পারবে না যদি তার দাবীর সমর্থনে আরও কমপক্ষে তিনজন ধার্মিক এবং সত্যবাদী চাক্ষুষ সাক্ষী না আনতে পারে। যদি এমন অভিযোগকারী তিনজন সাক্ষী না আনতে পারে তবে অভিযোগকারীকে কমপক্ষে আশি ঘা দোররা মেরে শাস্তি দিতে বলা হয়েছে। ইসলাম মূলতঃই নারীদের সম্মানিত এবং সতী মনে করে, তাই কোন নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপনের এমন কড়া পূর্বশর্ত আরোপ করেছে। এতে সমাজে সবসময় নারীদের ব্যাপারে সু ধারণা বিরাজ করবে। [এ পদ্ধতি হদযোগ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাযীরযোগ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নয় (দ্রষ্টব্য- পাকিস্তান ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের হদুদ আইন)- অনুবাদক]

## ৩. দুই ধর্মে বিয়ের প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে

ইহুদী আইন এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত যে বিয়ে, তাতে স্ত্রী স্বামীর লর্ডশীপে (রাজত্বে) প্রবেশ করে। শাইয়ান সম্পাদিত এন্সাইক্লোপেডিয়া বাইব্লিকা বলে, "বিয়েতে মেয়েদের মতামত অপ্রয়োজনীয়...."। একই পুস্তকে বেট্রোথাল (Betrothal) নামক বিয়ের কথা এসেছে যেখানে ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে স্ত্রী লাভ করা হয়। এক্ষেত্রে তালাকের একমাত্র অধিকার স্বামীর। কারণ তার স্ত্রী 'তার সম্পত্তি (property)"।

পক্ষান্তরে ইসলামে বিয়ের জন্য মেয়ের মতামত 'অত্যাবশ্যক শর্ত'। মোহরানার অর্থ স্ত্রী উপহার হিসেবেই লাভ করে, কোন 'ক্রয়মূল্য' হিসেবে নয়। তালাকের অধিকার উভয়েরই সমান (যদিও পদ্ধতি ভিন্ন- অনুবাদক)।

## ৪. ইসলামের সাথে ইহুদী-খ্রীস্টান রীতির তুলনায় ওল্ড টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

যদিও এটা সত্য যে ওল্ড টেস্টামেন্টের ইহুদী আইনগুলো এখন আর চালু নেই তবু নিম্ন লিখিত কারণে এর উদ্ধৃতি নেয়া যায় ঃ

ক. নিউ টেস্টামেন্ট লেখকরা প্রায়ই যীশুখৃস্টের আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যতবাণী প্রশ্নে ওল্ড টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি নিয়েছেন; কাজেই অন্যান্য বিষয়েও এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য।

খ. যীশু বলেছেন তিনি মুসার (আঃ) আইনকে পূর্ণতা দিতে এসেছেন; একে ধ্বংস করতে নয়। কাজেই সেই আইনের আবেদন এখনো আছে।

গ. তদুপরি ওল্ড টেস্টামেন্টের আবেদন যীশুর অন্তর্ধানের পরও বহাল ছিল বিশেষতঃ সেন্ট পলের কাছে।

## ৫. নারীর মর্যাদা ও অবস্থান প্রশ্নে যীশু'র দৃষ্টিভঙ্গি

নারীর প্রতি যীশু কোন নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন না। শোনা যায় তিনি আদি পাপের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। মেয়েরা এই পাপ বয়ে চলছে বলে তিনি মনে করতেন না। প্রসবকালীন যন্ত্রণা প্রসঙ্গে তিনি বলতেন এটা যন্ত্রণার হলেও সন্তান জন্মের পর মা সুখী হয়। তাঁর এই সহানুভূতিশীল মন্তব্যও ওল্ড টেস্টামেন্টের নেতিবাচক মন্তব্য থেকে পৃথক। তাঁর অনুসারীদের কয়েকজন মহিলা ছিলেন যারা তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।

## ৬. যীশুর অন্তর্ধানের পর নারী প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যদের অবস্থান

যদিও যিশুর কয়েকজন অনুসারী নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু তবুও সেন্ট পলসহ অধিকাংশই নারীর ব্যাপারে যীশুর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। সেন্ট পল বলেন, "নারী নিরবতার মধ্যেই জীবন যাপন করবে, তাকে শিক্ষিত করার বা পুরুষের উপর কর্তৃত্বের সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই।" তিনি নারী প্রসঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিই পুনর্ব্যক্ত করেন যে, আদম (আঃ)-কে প্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁর পাঁজরের হাড় থেকেই বিবি হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। বিবি হাওয়া (আঃ) সাপের প্ররোচনায় আদম (আঃ)-কে আদি পাপ করতে উৎসাহিত করেন। এই আদি পাপের গ্লানি সকল মহিলাকে বহন করতে হবে। শুধুমাত্র সন্তান জন্ম, সততা এবং সেবার মাধ্যমেই পাপ মোচন সম্ভব। তিনি আরও বলতেন আল্লাহ নিজের মত করে পুরুষকে বানিয়েছেন আর পুরুষ থেকে নারী। ফলে নারী অবশ্যই পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের। নারীর প্রতি ঘৃণাবশতঃ তিনি চিরকুমার থেকে যান এবং তাঁর অনুসারীদেরও চিরকুমার থাকতে আদেশ করেন।

## ৭. নারীর প্রতি এই নেতিবাচক আচরণকে মেরী (আঃ)-কে সম্মান করার সাথে তুলনা প্রসঙ্গে

যদিও যীশুর শিষ্যরা নারীর প্রতি চরম নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু তারা মেরী (আঃ)-কে বিশেষ সম্মান করতেন কারণ তিনি 'ঈশ্বরের জন্মদাত্রী'। এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায়ও দেখা যায় যেখানে নারীকে দেব-দেবীর জন্মদাত্রী ভাবা হত, নারীমূর্তির পূজা হত অথচ সেসব সমাজের নারীর কোন মর্যাদা বা অধিকার ছিল না।

### ৮. পল এর দৃষ্টিভঙ্গি চার্চকে প্রভাবিত করার প্রমাণ

প্রাথমিক কালের খ্রীষ্টান যাজকদের উপর পল-এর চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব সর্বক্ষেত্রে ছিল। নারীর প্রতি পল-এর নেতিবাচক ধারণার প্রভাব প্রথম যুগের যাজকদের বিভিন্ন লেখায় দেখা যায় যেমন Lecki তে আছে 'নারী হচ্ছে সমস্ত দোজখের দরজা, সকল রোগের জননী।' আরও বলা হয় নারী হয়ে জন্ম নেয়ার জন্য তাকে সার্বক্ষণিক অনুশোচনায় থাকা উচিৎ (Lecki)। সেন্ট গাষ্টিনসহ প্রথম প্রায় সকল যুগের ফাদার বিবি হাওয়ার আদি পাপে বিশ্বাস করতেন এবং সব নারীই যে এই পাপ বয়ে চলছে তা মানতেন।

## সূত্র নির্দেশিকা

প্রশ্ন-১ ঃ Deut. CH.22 v. 22; CH. 24 v. 26

প্রশ্ন-২ ঃ Numb. Ch. 5 v. 12-28.

প্রশ্ন-৩ ঃ Gen. CH. 3 V. 16. Gen. CH. 24 V. 58, CH. 4. V.4
এটা লক্ষণীয় যে ইহুদী পুরুষরা একটি প্রাচীন ইসরাইলীয় দোয়া পড়েন, "ও ঈশ্বর, আমাকে নারী না বানানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

প্রশ্ন-৫ ঃ John. CH. 16

প্রশ্ন-৬ ঃ 1st Peter. CH. 3
1st Tim. CH. 2. V. 11
1st Corinth. CH. 11. V. 3
2nd Corinth. CH. 11.

# জি-১৪ ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিত

**প্রশ্ন ঃ**

১. ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায়?

২. আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিতে ইসলামে নারীর অবস্থান কেমন?

৩. বিশ্বাসী মহিলারা যে বিশ্বাসী পুরুষের সমান পুরস্কার পাবেন এমন কোন প্রমাণ কুরআনে আছে কি?

৪. এই আধ্যাত্মিক সমতা কি প্রথাগত ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে?

৫. ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে ইসলাম মেয়েদের কোন সুবিধা বা ছাড় দিয়েছে কি?

৬. যদি কেউ বলে যে এসব ছাড় নারীর অবস্থানকে নীচ করেছে এবং কিছু মেয়েলী সমস্যায় তাদের আল্লাহর এবাদতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে তবে তার উত্তরে কি বলবেন?

৭. নারীর ধর্মীয় ক্ষমতায়ন (Ordination)-এর ধারণাটি খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিস্তৃত হচ্ছে, ইসলামে এমন কোন সুযোগ আছে কি?

৮. যদি কেউ অভিযোগ করে যে নামাজের জামাতে মেয়েদের পুরুষের পেছনে স্থান দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তবে কি বলবেন?

৯. কেন সকল নবীরা পুরুষ এবং তা থেকে একথাই কি বলা যায় যে, সকল ধর্মই পুরুষ কেন্দ্রিক?

**উত্তর ঃ**

## ১. ইসলামের নারীর অবস্থান

ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে এবং তার মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যদিও কোন কোন 'মুসলিম' সমাজ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নারীর ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা দিচ্ছেনা' তথাপি কুরআন এবং হাদিস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে একমাত্র ইসলামই নারীকে আধ্যাত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অনুপম মর্যাদা দিয়েছে।

## ২. ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক অবস্থান

প্রথমতঃ ইসলামে কোন আদিপাপের ধারণাই নেই এবং এর দায়ভার বিবি হাওয়া (আঃ) থেকে সকল মহিলাদের উপর আসবারও কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ যখন খ্রীষ্টান বিশ্ব নারীর আত্মা আছে কি না এবং নারী মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা- এই বিতর্কে ছিল তখন ইসলামই ঘোষণা করে যে, প্রথম মানব-মানবী একই রুহ (Essence) থেকে সৃষ্টি। আল্লাহ মানব-মানবী উভয়কে সৃষ্টি করে নিজের নূর থেকে তাদের রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। এভাবে ইসলাম মানব-মানবী উভয়কে মূলতঃ একই মর্যাদা দেয়।

### ৩. বিশ্বাসী নারী এবং বিশ্বাসী পুরুষ যে সমান পুরস্কার পাবেন তার প্রমাণ

কুরআনে বহু আয়াতে আছে যাতে দেখা যায় বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীর পুরস্কার সমান। সূরা আল ইমরান-এর ১৯৫ নং আয়াতে নারী-পুরুষের আধ্যাত্মিক সমতা (spiritual equality)-র একটি উদাহরণ। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক কি নারী, যদি সে মুমীন হয় আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাবেন, আর (পরকালে) এ ধরনের লোকদেরকে উত্তম আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবেন।" (১৬ঃ৯৭)

### ৪. প্রথাগত ধর্মীয় কাজে আধ্যাত্মিক সমতার প্রতিফলন

ইসলামে পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য একই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে বলা হয়েছে। ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত উভয় (সামর্থ্যবানদের জন্য)-এর জন্যই সমানভাবে ফরজ। অবশ্য মহিলাদের কিছু প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে।

### ৫. মহিলাদের জন্য সুবিধা/ছাড়

মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব এবং প্রসবোত্তর সময়ে নামাজ এবং রোজা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রোযা পরে কাজা করতে হয় আর নামাজ কাযা করতে হয় না। এমনকি স্তনদানকারী ও গর্ভবতী মায়েদেরও রোযা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যা পরে কাজা আদায় করে নিতে হয়।

সমাজের দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ জেহাদ-এর বাধ্যবাধকতা থেকেও মেয়েদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

### ৬. এসব ছাড়/সুবিধা কি মেয়েদের মর্যাদা নীচু করে?

এসব ছাড় মেয়েদের অসুবিধার সময় স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধা, এতে মর্যাদা খাটো হবার প্রশ্নই উঠেনা। গর্ভবতী অবস্থায় বা প্রসবোত্তর কালে বা ঋতুস্রাবের সময় সারাদিন রোযা রাখা মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে; এজন্যেই আল্লাহ এই ব্যবস্থা রেখেছেন। এর মানে এবাদত থেকে বঞ্চিত রাখা নয়। কারণ, এবাদত বলতে ইসলামে নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনকে বুঝায় না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে যেকোন বৈধ কাজ করা হোক না কেন, তাই এবাদত। আল্লাহর আদেশ পালনই এবাদত। এসব বিশেষ অবস্থা শেষে খ্রীষ্টানদের মত মুসলিম মহিলাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়না শুধু গোসল করতে হয়।

### ৭. নারীর ধর্মীয় ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে ইসলাম

খ্রীষ্টবাদের মত ইসলামে কোন 'চার্চ' বা যাজক নেই। কাজেই ধর্মীয় ক্ষমতাবান (Ordination)-এর সুযোগ ইসলামে কারোর জন্যেই নেই। যদিও ইসলাম মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে বলে কিন্তু সেটা সাধারণের উপর ধর্মীয় প্রভুত্ব করার কোন সুযোগ বুঝায় না- তাঁরা বিশেষজ্ঞ বা নেতা হতে পারেন মাত্র।

খ্রীষ্টবাদে যাজকদের দু'টো প্রধান দায়িত্ব, ক. প্রথাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা এবং খ. সমাজের সেবা দেয়া এবং সমাজকে ধর্মীয় নির্দেশনা দেয়া।

ইসলামে ইবাদতের ধারণা নিছক কিছু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের সকল কাজের মাঝে পরিব্যাপ্ত। সমাজের ও জীবনের অধিকাংশ কাজে নারীর অগ্রণী ভূমিকায় ইসলাম বাধা দেয় না।

## ৮. মেয়েরা কেন পুরুষের পেছনে নামায পড়বেন?

মুসলমানদের নামাজ শুধুমাত্র এক আসনে (শুধু বসে অথবা শুধু দাঁড়িয়ে) সম্পন্ন করা যায় না। নামাজের অন্তর্ভুক্ত আছে রুকু, সেজদা, তাশাহুদ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ। শুধু এই এক এবাদতে মেয়েদের পুরুষের পেছনে স্থান দেয়া হয়েছে যৌক্তিক কারণে। মেয়েরা পুরুষের সামনে অথবা পাশে দাঁড়িয়ে রুকু, সেজদা করলে উভয়েরই নামাজের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হতে পারে, নামাজের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হতে পারে। কাজেই জামাতে নামাজে মেয়েদের পেছনে জায়গা দেয়ার মধ্যে তাদের প্রতি কোন অসম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে নেই বরং এখানে ভদ্রতা ও রুচিশীলতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

## ৯. নবীরা সবাই পুরুষ কেন?

ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে কে নবী হবেন তা মানুষ নির্বাচন করে না এবং তা নির্ধারণ করেন স্বয়ং আল্লাহ যিনি পুরুষ বা নারী নন। কাজেই এখানে পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই উঠে না। শুধুমাত্র পুরুষদেরই নবী হিসেবে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে নবুয়তের দায়িত্ব শুধু উপদেশ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটা ছিল সার্বিক জীবন ব্যবস্থা কায়েমের মিশন। প্রতিষ্ঠিত শয়তানী শক্তি নবুয়তের মিশনে বাধা দিত। তাদের হাতে প্রায় সব নবীকে শারীরিক নির্যাতন, লাঞ্ছনা এমনকি মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে। একজন নারীর পক্ষে এসব বহুমুখী দায়িত্ব পালন ও ঝুঁকি গ্রহণ সম্ভব হত না বলেই আল্লাহ হয়তো নবী হিসেবে তাদের দায়িত্ব দেন নি। এর অর্থ এই নয় নারীর আধ্যাত্মিকভাবে অযোগ্য বরং এর অর্থ এই যে নবুওয়তের দায়িত্ব ব্যাপক ঝুঁকি, পরিশ্রম ও বিপদসংকুল।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল তখন রোমে খ্রীষ্টান বিশপদের সম্মেলন চলছিল এ বিষয়ে যে নারীদের আত্মা আছে কি না এবং তারা মানুষ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কি না। সম্মেলনে বহু বিতর্কের পর মাত্র কয়েক ভোটে হাঁবাচক রায় হয়।

আল কুরআন ৭ঃ১৮৯, ৪২ঃ১১, ৪ঃ১, ১৬ঃ৭২, ৩০ঃ২১, ৩২ঃ৯, ১৫ঃ২৯

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৭৪ঃ৩৮, ৩ঃ১৯৫, ১৬ঃ৯৭

প্রশ্ন-৬ ঃ জানুব (স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পর) অবস্থায় পুরুষেরাও নামায আদায় করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা গোসল সেরে নেয়।

# জি- ১৫ ইসলামে নারীর মর্যাদা- অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

**প্রশ্ন ঃ**

১. স্বামীর উপর নির্ভরশীলতা ছাড়া স্বাধীনভাবে নারীর সম্পদ অর্জন কি ইসলাম সমর্থন করে?

২. ইসলামে দেয়া এ অধিকারের সাথে শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপের তুলনা করুন।

৩. ইসলামী আইনে স্বামী এবং অন্য আত্মীয়দের (পিতা-মাতা) সম্পদে নারীর অংশ আছে কি?

৪. নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক হবার বিষয়টি কি নারীর প্রতি জুলুম নয়?

৫. মুসলিম মেয়েদের চাকুরী করার অধিকার আছে কি? সেক্ষেত্রে তারা কি পুরুষের সমপরিমাণ বেতন পাবে?

৬. যে মহিলা বাইরে কাজ না করে ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তিনি কি অনুৎপাদনশীল ভাবে সময় নষ্ট করছেন?

৭. এভাবে ঘরে বসে থাকার যুক্তি কি নেতিবাচক ঐতিহ্য থেকেই এসেছে?

**উত্তর ঃ**

## ১. নারীর সম্পদ অর্জন প্রসঙ্গে

ইসলামী মতে একজন নারী বিয়ের পূর্বে বা পরে যে কোন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে পারেন। তাঁর সম্পদ তিনি কারো পরামর্শ ছাড়া ইচ্ছেমত বিক্রী করতে, ভাড়া দিতে, ঋণ দিতে, দান করতে পারেন। ইসলাম আরও বলে যে বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর নামে নাম রাখার প্রয়োজন নেই। এটি একটি প্রতীকী প্রমাণ যে, ইসলাম তার ব্যক্তিত্ব সবসময়েই হেফাজত করে।

## ২. নারী ও তার সম্পদের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী

এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানার মতে ইংরেজী সাধারণ আইনে একজন মহিলার যাবতীয় সম্পত্তি তার বিয়ের পর স্বামীর মালিকানায় চলে আসত। স্বামী তার জমি থেকে ভাড়া গ্রহণ বা যে কোন লাভ তোলার সামর্থ্য রাখতেন। পরবর্তীতে ১৮৭০ সালের পর ইংল্যান্ডে; তারও পর ইউরোপে এই আইনের সামান্য সংশোধন করা হয় যে স্বামী, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া এই সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না। এই সংশোধনীর পর বিবাহিত মহিলারা সম্পত্তি ক্রয় ও চুক্তি করার অধিকার পায়। ফ্রান্সে ১৯৩৮ সালের পূর্বে এ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। অথচ সপ্তম শতকের অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীকে এর চাইতে অনেক বেশী অধিকারই দিয়েছিল। তা দেখে অনেক পশ্চিমা লেখকই অবাক হন

যে সেই অন্ধকার যুগে মুহাম্মদ (সঃ) কিভাবে এত সুন্দর আইন প্রণয়ন করলেন। তারা জানতেন না যে, এ আইন মুহাম্মদ (সঃ) প্রণয়ন করেননি; এই আইন সমগ্র বিশ্ববিধাতা আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার যিনি সুবিচক্ষণ ও সুবিচারক।

## ৩. সম্পদে মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার

রাসূল (সঃ)-এর আগমনের সময় সম্পত্তিতে নারীর তো কোন অধিকার ছিলই না বরং নারী নিজেই ছিল সম্পত্তির অংশ। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ছেলে সন্তানরা অন্য সম্পত্তির সাথে স্ত্রীদেরও ভাগ করে নিত। শুধু যে আরবদের মধ্যেই এমন ছিল তা নয়। সে যুগেই কুরআন সম্পদে নারী পুরুষ উভয়ের ন্যায্য অধিকার ঘোষণা করে। তাদের পাওনা অংশ স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, যা কারো পক্ষে বদলানো সম্ভব নয়। কেউ চাইলে তার কোন বংশধরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আরও লক্ষ্য করার বিষয়, এই কুরআনে যে আয়াতে সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে তা নাযিল হয়েছিল একজন মহিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন কুরআনেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তার দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ

ক. এখানে সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পদ বন্টিত হয়।

খ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অংশ মহিলাদের দ্বিগুণ, এটা পুরুষের বহুমুখী দায়-দায়িত্বের কারণেই হয়েছে।

## ৪. সম্পদে নারীর অংশ অর্ধেক হওয়া কি জুলুম?

শুধুমাত্র সম্পদ বন্টনে প্রাপ্ত অংশের ভিত্তিতে এমন মন্তব্য করা অজ্ঞতাপ্রসূত এবং অন্যায়। কারণ নারী শুধু এই এক উৎস থেকেই সম্পদ পায়না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাকে আরও আয়ের উৎস দিয়েছেন। দিয়েছেন অনেক দায়িত্ব থেকে মুক্তি, পক্ষান্তরে পুরুষের রয়েছে অনেক আর্থিক দায়িত্ব। নীচে নারীর আর্থিক সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলঃ

ক. বিয়ের পূর্বে বাগদানে (Engagement) নারী যা উপহার পায় তা সবই তার।

খ. বিয়ের সময় সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা পায়, যা সাধারণতঃ নগদ অর্থে দেয়া হয়। (মোহরানা বকেয়া থাকলে তা স্বামীর সম্পদ থেকে দিতে হবে এবং এটা তার নিজের সম্পত্তি। - অনুবাদক)

গ. বিয়ের পূর্বে সে কোন সম্পদের মালিক থাকলে সে মালিকানা বিয়ের পরও অব্যাহত থাকবে। তার স্বামী ঐ সম্পদ দাবী করতে পারবেন না।

ঘ. স্ত্রী যদি আর্থিকভাবে স্বামীর চেয়ে ধনীও হন তবুও তার উপর সংসারের কোন খরচের দায়িত্ব নেই। তার এবং সন্তানদের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, বিনোদনসহ সকল খরচের দায়িত্ব স্বামীর।

ঙ. বিবাহিত জীবনে সে চাকরী করে বা টাকা খাটিয়ে যা আয় করবে তা সবই তার এবং নিজের ইচ্ছেমত খরচ করতে পারবে।

চ. কোন কারণে তালাক হলে মোহরানার অবশিষ্ট অংশ সে তাৎক্ষণিকভাবে পাবে।

ছ. তালাকের পর ইদ্দত কালে সে পুরো ভরণ-পোষণ পাবে এবং পরবর্তীতেও সন্তানদের পুরো খোরপোষের খরচ পেতে থাকবে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে ইসলাম নারীকে আর্থিকভাবে লাভবান করেছে পুরুষের উপর সব আর্থিক দায়িত্ব দিয়ে নারীকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পুরুষের এতসব দায়িত্বের জন্যই পিতার সম্পদ বন্টনের সময় তার অংশ একটু বেশী ধরা হয়েছে। এ দায়িত্ব কেবল পরিবার ভরণ-পোষণের জন্যেই নয়, দরিদ্র আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও বর্তায়। মনে রাখা দরকার যে এই বণ্টন ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ করেছেন। যিনি নারী বা পুরুষ নন। যিনি সারা জাহানের প্রভূ, সর্বস্রষ্টা ও ন্যায়ের প্রতীক (আল মীজান)।

## ৫. মেয়েদের কাজ করা প্রসঙ্গে

কুরআন এবং সুন্নাহ মতে মেয়েদের কাজ করায় কোন বাধা নেই। বরং একটি আদর্শ ইসলামী সমাজে কিছু কাজ মেয়েদের জন্যই বেশী উপযুক্ত। যেমন, প্রাইমারী স্কুল (যেথায় বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা তাদের শিক্ষিকা থেকে জ্ঞান অর্জন করবে) থেকে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া মেয়েরাই করাবে; এছাড়া নার্সিং, চিকিৎসা ইত্যাদি। ইসলামী আইনে নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মাতৃত্ব, শিশু পালন ও সংসার পরিচালনা। যদি বইরের কাজ ও ঘরের কাজে দ্বন্দ্ব বাধে তবে সামাজিক গুরুত্বের কথা ভেবে, ঘর রক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে মেয়েদের চাকরী বাকরী করায় ইসলামে কোন বাধা নেই। কর্মস্থলে তারা পুরুষদের মত হারেই মজুরী পাবে।

## ৬. মাতৃত্ব ও ঘরগৃহস্থালীর কাজ কি অনুৎপাদনশীল কাজ?

সামাজিক উন্নতি ও উৎপাদনকে যারা শুধু টাকা উপার্জনের মাপকাঠিতে বিবেচনা করেন তারা মনে করতে পারেন মাতৃত্ব অনুৎপাদনশীল কাজ। কিন্তু যখন মানবিকতা আর নৈতিকতার বিবেচনায় এটা মাপা হয় তখন শিশু পরিচর্যা আর সংসার রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা কেন ভাবা হয় যে, যখন নারী ঘর অরক্ষিত ফেলে ক্যারিয়ার তৈরী করতে যায় তখন সে উৎপাদনশীল কাজ করছে, আর যে নারী ঘরে কাজ করছে সে উৎপাদনশীল কিছু করছে না? একটা মেয়ে ঘর ছেড়ে হোটেলে রান্না করে অর্থ উপার্জন করলে তবে সেটা কাজ, আর যে মেয়েটি ঘরে আপনজনদের রান্না করে খাওয়াচ্ছে, সেলাই করছে ও পরিচর্যা করছে সেটা কাজ নয়?

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের সবচেয়ে বিপর্যয় হয়েছে এখানেই যে মাতৃত্বের দায়িত্বটিকে সেখানে ছোট করে দেখা হচ্ছে। যদি মাতৃত্ব, শিশুপালন ও ঘর রক্ষার জন্য পারিশ্রমিক দেয়ার বিধান থাকত তাহলে একজন স্বামী তার স্ত্রীর পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতেন। বিশেষ করে যিনি প্রয়োজনে দিনে ২৪ ঘন্টাই তৈরী! সুখী সংসার গড়া আর সন্তানদের ভালভাবে মানুষ করার চেয়ে বড় আনন্দ জগতে আর নেই।

## ৭. উপরের যুক্তি কি নেতিবাচক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভুত?

ঐতিহ্যকে 'খারাপ' এবং আধুনিকতাকে 'ভাল' মনে করা সঠিক নয়। ঘরের কাজকে গুরুত্ব না দেয়ায় এবং সন্তানদের প্রতি খেয়াল না করায় পাশ্চাত্যের নতুন প্রজন্মের কি অধঃপতন হচ্ছে তার দিকে একবার তাকালে মাতৃত্বের ঐতিহ্যকে নেতিবাচক বলা যায় না। তাদের পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়ায় আদরের সন্তান পথে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, দুষ্ট লোকের শিকারে পরিণত হচ্ছে। ড্রাগ এবং মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। (এর ফলস্বরূপ যুবসমাজের অবিবাহিত থাকার প্রবণতাসহ আরো অন্যান্য সমস্যা তৈরি করছে। - অনুবাদক)

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ Encyclopaedia Americana (International Edition), ১৯৬৯, Vol. ১৯, Page- ১০৮
'Muslim Institutions' Maurice Gaudefroy Demombynes (অনুবাদক, জন ম্যাকগ্রেগর)
Muslim Institutions গ্রন্থে Demombynes লিখেছেন, কুরআনের আইন স্ত্রীকে এমন মর্যাদা দেয় যা প্রায় সকল ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপীয় আইনের চেয়েও অগ্রসর'

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৭ (এই আয়াত নাযিল হয় তখন যখন একজন বিধবা মহিলা রাসূল (সঃ)-এর কাছে নালিশ করেন যে তাঁর স্বামীর ভাই তাঁর স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করছে তাঁর ২টি মেয়ে থাকা সত্ত্বেও)

প্রশ্ন-৫ ঃ রাসূল (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ ভালবাসেন ঐ সকল মানুষকে যারা তাদের কাজ ঠিকমত করেন। যদি কোন মহিলার সন্তান থাকে যার যত্ন নিতে হবে, তবে সে ঠিক সিদ্ধান্ত নিবে যদি তার ক্যারিয়ার সৃষ্টির চিন্তাকে আপাতত তুলে রেখে শিশুর প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়।

# জি- ১৬ ইসলামে নারীর মর্যাদা- সামাজিক প্রেক্ষিত

**প্রশ্ন ঃ**

১. কন্যা সন্তান জন্ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এ ব্যাপারে জনমত কেমন ছিল?

২. নারীর প্রতি নমনীয় হতে কোন নির্দিষ্ট আদেশ ইসলামে আছে কি?

৩. মেয়েরা কি ছেলেদের মতই লেখাপড়া করতে পারে?

৪. এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি যেসব বিষয়ে মেয়ে অথবা ছেলেদের জ্ঞান অর্জন নিষেধ?

৫. স্ত্রী হিসেবে নারীদের সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

৬. ইসলামী আইনে মায়ের কোন সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার আছে কি?

৭. কোন মুসলিম পুরুষের জন্য এটা কি ঠিক যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে বাধ্য করবেন অথচ নিজে পোশাক সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকবেন?

৮. কোন কোন লেখক বলেছেন যে আদর্শ মুসলিম নারী ঘরেই আবদ্ধ থাকেন। এটা কি ঠিক?

**উত্তর ঃ**

### ১. কন্যা সন্তান জন্ম সম্পর্কে ইসলাম

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে কন্যা সন্তানদের হত্যা করা হত। অন্যান্য স্থানেও কন্যা সন্তানকে অশুভ হিসেবে দেখা হত। ইসলাম এই খারাপ চর্চাকে শুধু বন্ধই করেনি বরং কুরআন একে সরাসরি 'খুন' বলে ঘোষণা করেছে এবং মানুষকে এই ধারণায় দীক্ষিত করেছে যে পুত্র-কন্যা দুই ধরনের সন্তানই আল্লাহর উপহার।

### ২. মেয়েদের প্রতি সদয় হবার নির্দেশনা

হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে লালন পালন করে বড় করবে, "সে এবং আমি এমনই কাছাকাছি থাকব" (এই বলে তিনি তাঁর হাতের পাশাপাশি দু'আঙ্গুলের অন্তরঙ্গতাকে দেখালেন)। তিনি আরও বলেন যে, যার একটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দিলনা, তাকে অপমানিত করল না এবং পুত্রদেরকে তার উপর প্রাধান্য দিল না, আল্লাহ তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর নিজের জীবনে তিনি এসব শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

### ৩. নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে ইসলাম

এটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে ইসলামে জীবিকার প্রয়োজনে নারীর যে কোন বৈধ কাজ করতে বাধা নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে কিছু কাজে মহিলাদেরই অগ্রাধিকার

দেয়া হয়। এসব প্রয়োজনেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ নারীর জন্য আবশ্যক। যে সব কাজে মেয়েদের অগ্রাধিকার থাকে তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শিক্ষকতা, চিকিৎসা, নার্সিং ইত্যাদি। ইসলামে জ্ঞানার্জন শুধু প্রত্যেক নারী পুরুষের অধিকার নয় বরং তা বাধ্যতামূলক কর্তব্য। রাসূল (সঃ) বলেন, জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। কুরআনেও এর সমর্থনে বলা হয় জ্ঞানীদের আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দেবেন।

## ৪. মেয়েদের কোন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণে কোন বাধা বা সীমাবদ্ধতা আছে কি?

ইসলামে এমন কোন আইন নেই যা বিশেষভাবে মেয়েদের কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ নষ্ট করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য যার চর্চা নিষিদ্ধ এমন দু'একটি বিষয় আছে যেমন যাদুবিদ্যা। আবার কয়েকটি বিষয় আছে যার জ্ঞান অর্জন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ, তা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কাজগুলো, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি। কিছু বিষয় আছে যা বিশেষভাবে মেয়েদের শিখতে উৎসাহিত করা হয় যা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে, যেমন- শিশু পরিচর্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, নার্সিং, চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের সুযোগ পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য উন্মুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

## ৫. স্ত্রী হিসেবে নারীঃ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামীর দাসী বা স্বামী তার প্রভুতে পরিণত হয় না। ইসলামে আল্লাহই একমাত্র প্রভু এবং সকল মানব মানবী তাঁর দাস-দাসী। কুরআন বিবাহ বন্ধনকে মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে বর্ণনা করে যা হচ্ছে স্থিতিশীলতা, শান্তি, পারস্পরিক ভালবাসা ও আকর্ষণের উৎস। এজন্যেই ইসলামে বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি (Consent)-এর এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে রাসূলের (সঃ) কথা এবং জীবন ছিল অনুপম আদর্শ। তিনি বলেন, "সবচেয়ে সঠিক বিশ্বাসী সে যার ব্যবহার ভাল এবং তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তাঁর স্ত্রীর প্রতি উত্তম" (অর্থাৎ উত্তম আচরণ করে।- অনুবাদক)

## ৬. ইসলামে মায়ের অগ্রাধিকার

কুরআন আল্লাহর এবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি বিশেষভাবে মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সদয় হতে পরামর্শ দেয়। মুসলমানের জন্য পাশ্চাত্যের মত বৃদ্ধ পিতামাতাকে নার্সিং হোম বা বৃদ্ধ আশ্রমে রাখা নিষ্ঠুর, নির্দয় ও অনৈসলামিক আচরণ। রাসূল (সঃ) বলেন, "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত"। তিনি আরও বলেন, উত্তম চরিত্রের মানুষ মহিলাদের প্রতি দয়াশীল হয় এবং একমাত্র খারাপ লোকেরাই তাদের অপমান করে।

## ৭. নারীর ইসলামসম্মত পোশাক প্রসঙ্গে

মুসলিম মেয়েরা ইসলাম সম্মত পোশাক পরেন শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য, আল্লাহর প্রতি আন্তরিক সম্মান থেকে এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য, স্বামী বা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয় বা সমাজের চাপে নয়। বরং অনেক সেক্যুলার মুসলিম দেশে যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ হিজাব পরা মেয়েদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করে সেসব স্থানেও ধার্মিক মেয়েরা রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু, এমনকি স্বামীর বাধা উপেক্ষা করে ইসলাম সম্মত পোশাক পরেন। এটা বলা ভুল যে হিজাব মানে মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকই পরতে হবে অথচ অন্যদিকে ছেলেদের পোশাকে কোন বিধি নিষেধ থাকবে না। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কেই তাদের শরীরের কিছু অংশ নির্দিষ্ট ভাবে আবৃত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কি ধরনের কাপড় দিয়ে আবৃত করতে হবে তা (রং বা ডিজাইন) বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দই প্রাধান্য পাবে। (অবশ্য আটসাট বা ফিনফিনে পোশাক পরা যাবে না; এ কথা আল্লামা জামাল বাদাবী এ সিরিজের অন্যত্র আলোচনা করেছেন।- অনুবাদক)।

## ৮. আদর্শ মুসলিম নারী কি ঘরেই আবদ্ধ থাকেন?

মুসলিম মেয়েরা ঘরেই আবদ্ধ থাকবেন- এ ধারণা ভুল। এটা বলাও ভুল হবে যে ইসলাম মেয়েদের অন্দরে থাকা পছন্দ করে। জ্ঞানার্জন মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক, পরিবারের প্রয়োজনে উপার্জনের জন্য বাইরে যাবার অনুমতি তাদের রয়েছে। ঘরে আবদ্ধ থাকার ধারণা সম্ভবতঃ কুরআনের একটি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এসেছে যাতে বলা হয়েছে, "তোমরা ঘরে থাক এবং জাহেলী যুগের মেয়েদের মত নিজেদের প্রদর্শন করো না।" এই আয়াত শুধুমাত্র রাসূল (সঃ)-এর স্ত্রীদের লক্ষ্য করে নাজিল হয়েছে। ধার্মিক মেয়েদের জন্য এটা বলা যেতে পারে যে অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাঘুরি না করে ঘরে থেকে শান্তিপূর্ণ আবাস গড়ে তোলাই উত্তম। রাসূলের হাদিস থেকে জানা যায় যে, মেয়েদের শুধু ঘরে আবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই; যেখানে রাসূল (সঃ) বলেন, "আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।"

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ৮১ঃ৮-৯, ১৬ঃ৫৮

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ১৭ঃ২৩, ৩১ঃ১৪

হাদিসে আছে জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন, "সব মানুষের মধ্যে কাকে আমি বেশী গুরুত্ব দিব" রাসূল (সঃ) বললেন, "তোমার মাকে"। তিনি তিনবার এই প্রশ্ন করলে তার জবাবে রাসূল (সঃ) বলেন, 'তোমার মাকে' চতুর্থ বার বলেন, 'তোমার পিতাকে'। আরেক হাদিসে আছে, রাসূল (সঃ) বলেন, 'নারীরা পুরুষের সমজাতের' (twin half or other half of men) কাজেই তাদের সাথে সুব্যবহার কর।

# জি- ১৭ ইসলামে নারীর মর্যাদা- রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-১

**প্রশ্ন ঃ**

১. দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কি মুসলিম মেয়েদের জন্য অনুমোদিত?

২. সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার অধিকার কি মুসলিম মেয়েদের আছে?

৩. মেয়েদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৪. যারা বলেন, "বাইয়াত হচ্ছে রাসূল (সঃ) এর প্রতি ধর্মীয় আনুগত্যের শপথ, এর সাথে রাজনৈতিক ভোটাধিকার এর কোন সম্পর্ক নেই"- তাদের এ মন্তব্যের ব্যাপারে কি বলবেন?

৫. আইন প্রণেতা ও নেতা হিসেবে মেয়েদের নির্বাচিত হবার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৬. ইসলামের প্রাথমিক যুগে মেয়েরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি?

**উত্তর ঃ**

### ১. মেয়েদের রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে ইসলাম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যাতে আছে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক বিষয়সহ জীবনের সব কিছুর পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। কুরআন এবং হাদিস থেকে এটা নিশ্চিত যে, শান্তিপূর্ণ সমন্বিত ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব। সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বন্ধু এবং অভিভাবকের মত একে অপরকে সহযোগিতা করবে। এই সহযোগিতা আর সবক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদিসে যেসব স্থানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে বলা হয়েছে, তা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আর এই সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ব্যক্তি জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপ্ত। প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর সামাজিক কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা রাখা আবশ্যক।

### ২. সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলিম মেয়েদের নিজের মত তুলে ধরা প্রসঙ্গে

রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে মুসলমানরা নিজেদের পুরোপুরি ইসলাম সম্মতভাবে পরিচালিত করত। সেই সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় মুসলিম মেয়েরা সমাজে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ে

তাদের মতামত ও অভিযোগ তুলে ধরত। কুরআনের ৫৮ নং সূরায় প্রথম কয়েক আয়াত রাসূল (সঃ)-এর কাছে একজন মহিলার আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে নাযিল হয়। আল্লাহ সেই মহিলার বক্তব্য শুনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। ওসমান (রাঃ)-এর শাসনকালে বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু ওসমান (রাঃ) বা কেউ সে সমালোচনার জবাবে একথা বলেননি যে নারী রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য দিতে পারে না। ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর আলী (রাঃ)-এর খলীফা হিসেবে মনোনয়নের বিরুদ্ধে আয়েশা (রাঃ) দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন, কিন্তু কেউই তার মতামতের অধিকারের বিপক্ষে কিছু বলেননি। যদিও পরবর্তী সময়ে আয়েশা (রাঃ)-এর জন্যে অনুশোচনা করেন, কেননা আলী (রাঃ)-এর বিরোধিতা করা ভুল (bad judgement) ছিল। একবার ওসমান (রাঃ)-এর স্ত্রী রাজনৈতিক বিষয়ে বলতে চাইলে তাঁর একজন সহযোগী বাধা দিলে ওসমান (রাঃ) বলেন, "তাঁকে বলতে দাও, সে তাঁর উপদেশ প্রদানে তোমার চেয়েও আন্তরিক।" কাজেই মুসলিম মেয়েরা রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিতে পারে। যদিও তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ঘর রক্ষা, তবুও এটা তাদের সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়না।

### ৩. মেয়েদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম

রাসূল (সঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভোটের প্রচলন ছিল না। তখন জনগণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি জনগণের কাছে বাইয়াৎ (আল্লাহর অনুগত শাসক হিসেবে তার আনুগত্যের শপথ) আহ্বান করতেন। কুরআন এবং হাদিসে দেখা যায় তখন মেয়েরাও বাইয়াত করতেন। ৬০ নং সুরার ১২ নং আয়াতে দেখা যায় একদল নারী রাসূল (সঃ)-এর হাতে বাইয়াৎ নিতে চাইলে কুরআন নবীকে 'তাদের' বাইয়াত নিতে আদেশ' করে। ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, আকাবা নামক স্থানে একদল মদিনাবাসী তাঁর নিকটে বাইয়াৎ হন। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন।

### ৪. বাইয়াৎ কি শুধু রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ধর্মীয় আনুগত্যের শপথ নাকি ভোট প্রয়োগের বিকল্প?

যখন মহিলারা রাসূল (সঃ)-এর কাছে বাইয়াত নিচ্ছিলেন তখন তারা শুধু মুহাম্মদ (সঃ)-এর আল্লাহর রাসূল হবার স্বীকৃতিই দিচ্ছিলেন না বরং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধানের স্বীকৃতিও দিচ্ছিলেন। তাদের এ বাইয়াতে শুধু এই স্বীকৃতিই ছিল না যে তারা ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলবে বরং এই শপথ ছিল যে তারা রাসূলের (সঃ) সকল আদেশ (যার অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক আদেশও) নির্দ্বিধায় মেনে চলবে। বস্তুতঃ ইসলামে ধর্মকে রাজনীতি ও সমাজনীতি থেকে পৃথক করার কোন উপায় নেই।

## ৫. আইন প্রণেতা ও নেতা হিসেবে মেয়েদের নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে

যদিও ইসলামে নেতা নির্বাচনের নিয়ম ভিন্নতর তবুও পাশ্চাত্য নির্বাচন পদ্ধতির সাথে এর কিছু মিল আছে। ইসলামে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুরা অর্থাৎ পরামর্শের মাধ্যমে করতে হয়। যদিও প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা কোন বিশেষ ভবন তৈরি করেনি যার নাম 'পার্লামেন্ট' বা সংসদ ভবন বলবে- যেখানে সংসদীয় আলোচনা ও মিটিং হবে, খলিফারা জনগণকে ডাকতেন এবং কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতেন।

রাসূল (সঃ)-এর মৃত্যুর পর, খলীফারা একদল লোকের পরামর্শ নিতেন, যাদের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়ার অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল। মুসলমানদের জন্য সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করার গুরুত্ব আরো ব্যাপকতর হয় এ হাদিসে, যেখানে রাসূল (সঃ) বলেন, "সত্য ঈমান হচ্ছে উপদেশ দেয়া" (True faith is advice)। স্বয়ং রাসূল (সঃ)-এর সময়েও কোন কোন বিষয়ে মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার নজির আছে। মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার ব্যাপারে কেউ বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে এমন নজির নেই। তবে পরামর্শ নেবার পদ্ধতি ছিল ইসলামের আদব অনুযায়ী।

## ৬. প্রথম যুগের মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) যখন দেখলেন যে জনগণ বেশী অংকের মোহরানা (কাবিন) দিচ্ছে, তখন তিনি মোহরানাকে সর্বোচ্চ ৪০০ দিরহামে স্থির করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর বেশী যেই দেবে সেই টাকা বায়তুল মালে জমা করার সিদ্ধান্ত তিনি দিলেন। তিনি যখন মসজিদুন নববীতে এই ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন একজন মহিলা আপত্তি করে বললেন, 'হে ওমর তোমার এ কাজের অধিকার নেই"। এই প্রসঙ্গে মহিলা কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে স্বামী যদি স্ত্রীকে অঢেল স্বর্ণ পরিমাণ মোহরানা দেয় তবুও সে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। রাষ্ট্রপ্রধানের মুখের উপর এই কথা বলার জন্য মহিলার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেনি। বরং ওমর (রাঃ) বললেন, "মহিলা যা বলেছে তাই ঠিক এবং উমর ভুল বলেছে"। ওমর (রাঃ) আরও আক্ষেপ করে বললেন, "হে ওমর, তোমার চেয়ে অনেকে বেশী জানে"। এভাবেই প্রাথমিক যুগের মহিলারা রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণেও ভূমিকা রাখতেন।

### সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ৯ঃ৭১ রসূল (স:) বলেছেন, 'সৎ উপদেশই 'আসল ঈমান'

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৮ঃ১, ৬০ঃ১২

**প্রশ্ন ঃ**

১. এটা কি বলা যেতে পারে যে যেভাবে একজন মহিলা মোহরানা সম্পকে ওমর (রাঃ) আনীত প্রস্তাব বাতিল করলেন তা আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থারই অনুরূপ?

২. ইসলামী আইন কি মেয়েদের বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের পদে আসীন হতে বাধা দেয়?

৩. মেয়েদের রাষ্ট্রপ্রধান হতে কুরআন অথবা শরীয়তের কোথাও নিষেধ আছে কি?

৪. মেয়েদের বিচারক হিসেবে কাজ করতে বাধা কোথায়?

৫. একজন পুরুষের সমান দুইজন মেয়ের সাক্ষ্য রাখাটা কি মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা নয়?

**উত্তর ঃ**

**১. ওমর (রাঃ) এবং উক্ত মহিলার যুক্তিতর্ক- আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রতীক ঃ**

ওমর (রাঃ)-এর সময়কার উল্লিখিত ঘটনার সাথে আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনেক মিল আছে। যেমন-

ক. ওমর (রাঃ) কর্তৃক মসজিদে দাঁড়িয়ে মোহরানার সীমা নির্ধারণ করার প্রস্তাব আধুনিক পার্লামেন্টে সংসদ নেতা কর্তৃক কোন আইন সংশোধন প্রস্তাব আনার অনুরূপ।

খ. এই প্রস্তাব আনার স্থানটি আধুনিক পার্লামেন্ট ভবনে ছিল না। এটা মসজিদে ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ইসলামে মসজিদ শুধু নামাজেরই স্থান নয় বরং খেলাফতের যুগে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ নেতারা মসজিদে বসেই করতেন। মসজিদে বসেই যুদ্ধ পরিচালনা, বিদেশী কূটনৈতিক মিশনকে গ্রহণ করা, সবই হত। এখানে জনগণ যেতেন রাষ্ট্র নায়কদের কথা শুনতে ও প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে। কাজেই সব মুসল্লীই পার্লামেন্ট সদস্যদের সমান মর্যাদা পেতেন।

গ. ওমর (রাঃ) জনগণের কাছে তাঁর প্রস্তাব রাখায় বোঝা যায় তাঁর সিদ্ধান্তের উপর মতামত দেবার অধিকার জনগণের ছিল।

ঘ. সমাজের সব স্তরের মানুষই মসজিদে উপস্থিত থেকে তাদের মতামত সমানভাবে প্রয়োগের সুযোগ পেত।

ঙ. উক্ত মহিলা ওমর (রাঃ)-এর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে ঐ প্রস্তাব সংবিধান পরিপন্থী। ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআনই হচ্ছে সংবিধান, যা কোন মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না।

চ. মহিলার সংশোধনী শুনে তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে ওমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী তার বর্ণনায় মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। তাতে প্রতীয়মান হয় মহিলা তদানীন্তন সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না। তখন মসজিদে সমবেতদের মধ্যে রাসূল (সঃ)-এর পরিবারের সদস্য এবং অনেক সাহাবাও ছিলেন। কিন্তু কেউ কোন মহিলার রাজনৈতিক মত প্রদানের বৈধতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেননি। এতে বোঝা যায় তখনকার সমাজে আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মত দিতে পারত। শুধু এই ঘটনাতেই নয় এমন আরও অনেক ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। ওমর (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর নতুন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) মহিলাদেরও পরামর্শ নিয়েছিলেন।

## ২. বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের প্রধান/নেতা হিসেবে নারী

সাধারণ অর্থে 'নেতৃত্ব' বলতে কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে নেতৃত্ব বলতে যে কোন গুরত্বপূর্ণ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী পদকেই বোঝায়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম মেয়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, নার্সিং ইত্যাদি এসবই গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী কাজ। এগুলো কি সমাজ তথা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণকারী পদ নয়? এসব পদে অধিষ্ঠিত থেকে কি জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া যায় না? শুধু এসব পদ কেন, যে মহিলা ঘরে বসে জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলছেন তিনি কি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করছেন না?

ব্যাপকভাবে নেতৃত্বের এই আলোচনার পরও বলা যায় নির্দিষ্টভাবে কোন জন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শরীয়তে কোন সর্বসম্মত বাধা নেই। বরং চিকিৎসা শিক্ষাসহ কিছু বিষয়ে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব মেয়েদেরই থাকা উচিৎ। অন্যদিকে বেশীরভাগ আলেমের মতে যে তিনটি পদে নারীর অধিষ্ঠিত হতে বাধা আছে তা হচ্ছে–

ক. রাষ্ট্রপ্রধান

খ. বিচারক

গ. সেনাপ্রধান

(অবশ্য এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ভিন্নমতও আছে – অনুবাদক)

## ৩. এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে দলিল আছে কি? ঃ

যদিও কুরআনে নারীর রাষ্ট্রীয় শীর্ষপদে আসীন হবার বিপক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায় না, তবুও আলেমরা একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেন যেখানে রাসূল (সঃ) বলেন, সে জাতি

উন্নতি করতে পারেনা যারা তাদের নেতা হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচিত করেন। পারস্যের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শাহজাদী 'পুরান'এর মনোনয়নের প্রেক্ষিতে রাসূল (সঃ) এই মন্তব্য করেন বলে উল্লেখ করা হয়। (যদিও এই হাদিসের যথার্থতার এবং এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে বেশ কিছু আলেম দ্বিমত পোষণ করেছেন- অনুবাদক)

রাসূল (সঃ) কর্তৃক নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে এই মন্তব্যের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে প্রথমতঃ এই যে, রাসূল (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব সম্পর্কে বলছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা শুধু জনগণের মুখপাত্রই নন; তিনি প্রধান নামাজের জামাতেরও ইমাম এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে নামাজ এমন একটি কাজ যাতে নারীর ইমামতি করা তো দূরের কথা, পুরুষের সামনে মেয়েদের দাঁড়ানোটাই দৃষ্টিকটু। আর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নারীকে এখনো পর্যন্ত খোদ পাশ্চাত্যও মনোনীত করেনি। আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, ইসলামী মতে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কোন পুরস্কার তো নয়ই বরং চরমতম পরীক্ষা ও বোঝা। কেউই এই দায়িত্ব আগ্রহ করে নেয় না।

## ৪. মেয়েদের বিচারক হতে বাধা কোথায়

এ বিষয়ে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ কোন মত নেই। যারা এর বিপক্ষে বলেন তাদের যুক্তি হচ্ছে ঃ

ক. বিচারকদের দায়িত্বটা তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের অনুরূপ এবং যেহেতু মেয়েদের রাষ্ট্রপ্রধান হতে বারণ করা হয়েছে সেহেতু তাদের বিচারক হওয়াও নিষেধ।

খ. যেহেতু পরিবারের প্রধান হিসেবে ইসলামে পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেহেতু বিচারকের আসনে নারী বসাটা এই শৃঙ্খলার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিপক্ষে মত হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান বাদে আর সব পদ এমনকি বিচারক পদেও নারী আসীন হতে পারবে (আত-তাবারী) অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা বলেন, যেহেতু মেয়েদের আদালতে সাক্ষী হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেহেতু তারা বিচারকও হতে পারবে।

## ৫. নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক- নারীর প্রতি কি অবজ্ঞা?

কুরআনের আর্থিক লেনদেন ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষের অর্ধেক ধরা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে নারীর মান পুরুষের অর্ধেক। মনে রাখা দরকার যে তখন সময়টা এমন ছিল যে মেয়েরা মূলতঃ ঘর গৃহস্থালীর কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা বেশী জড়িত হতেন না। এ ধরনের চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয় ঘরোয়া কাজের ব্যস্ততায় মনে নাও থাকতে পারতো। তাই বলা হয়েছে, "..... কারণ তাদের একজন ভুলে গেলে আর একজন মনে করিয়ে দিতে পারবে" (২ঃ২৮২)।

এখানে বলা হয়নি যে নারীর স্মরণশক্তি কম। এখানে মূলত: অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, কেননা মানুষের কাছে ঋণ ও অর্থনৈতিক বিষয় খুবই স্পর্শকাতর এবং একজন নারী, যে ঘরের কাজে ব্যস্ত, তার পক্ষে আর্থিক চুক্তির জটিল ধারাগুলো সব মনে নাও থাকতে পারে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ রাসূল (সঃ) বলেন, "তোমাদের সবাই নেতা (দায়িত্বশীল) এবং তার কাজের জন্য দায়ী : শাসক তার জনগণের জন্য, পুরুষ তার পরিবারের জন্য, নারী তার সন্তান ও সংসারের জন্য, কর্মচারী তার কাজের জন্য- প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপর অর্পিত কাজের জন্য দায়িত্ববান।"

প্রশ্ন-৩ ঃ এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে, কারণ এই হাদিসের ব্যাপারে ও তার ব্যাখ্যাতে বেশ কয়েক জন বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ২ঃ২৮২

# জি- ১৯ ইতিহাসে মুসলিম নারী- ১

**প্রশ্ন ঃ**

১. আর্থিক লেনদেনের বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও কি মুসলিম মহিলারা সাক্ষী হতে পারেন?

২. ইসলামের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়ে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দৃষ্টান্ত আছে কি?

৩. খাদিজার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে কোন খোদায়ী স্বীকৃতি আছে কি?

৪. খাদিজা (রাঃ)-এর যোগ্যতা সম্পর্কে রাসূল (সঃ) কিছু বলেছেন কি?

৫. স্বামীর সহায়তা ছাড়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছে এমন মুসলিম নারীর উদাহরণ আছে কি?

৬. ইসলাম গ্রহণের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন এমন নারীর উদাহরণ আছে কি?

৭. আল্লাহর পথে বিপদ বরণ করেছেন এমন মুসলিম নারীর উদাহরণ আছে কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. সাক্ষী হিসেবে নারী

ইমাম আবু হানিফাসহ আরও কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে শুধুমাত্র ফৌজদারী (Criminal) মামলা ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে, যেহেতু নারীরা সাধারণতঃ বেশী আবেগপ্রবণ সেহেতু অপরাধ বা সন্ত্রাসের ঘটনা দেখে তাঁরা মুষড়ে পড়তে পারেন, ফলে যথার্থ সাক্ষ্য নাও দিতে পারেন।

অন্যদিকে আল জুহরীসহ অন্য বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, সকল ক্ষেত্রেই নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কারণ এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদিসে কোনরকম নিষেধাজ্ঞা নেই।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে আর্থিক বিষয়ের মত অন্য বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক হবে না। বরং সমান হবে। তারা এ ব্যাপারে যে যুক্তি দেন তা নিম্নরূপ ঃ

ক. কুরআনের সাত জায়গায় সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, এর মধ্যে মাত্র এক জায়গায় (আর্থিক বিষয়ে) দুইজন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর কথা বলা হয়েছে (আলকুরআন ২ঃ২৮২)।

খ. ২৪ নং সূরায় ৬ থেকে ৯ নং আয়াতে এটা স্পষ্ট যে নারী এবং পুরুষের সাক্ষ্য সমান মানের, যেখানে স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক অপরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে একজনের কসম খাওয়া অভিযোগ নাকচ হয়ে যায় অপরজনের কসম খাওয়ার মাধ্যমে। (জি-১০ এর প্রশ্ন-২ এর আলোচনা দেখুন)।

গ. সাক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুরআনের বাকী পাঁচ জায়গায় নারী পুরুষের বেলায় ভিন্ন করে বা নির্দিষ্ট করে (পুরুষ হবে বা নারী হবে বা দু'জনেই হবে এমন) কিছু বলা হয়নি। (সূত্র নির্দেশিকা দেখুন)

ঘ. রাসূলের জীবনে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যখন তিনি শপথের ভিত্তিতে মাত্র একজন পুরুষ বা মহিলা সাক্ষীর বক্তব্যের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন।

ঙ. কুরআনের শিক্ষা থেকে এটাও স্পষ্ট যে সাক্ষী হওয়াটা কোন অধিকার বা সুযোগ নয় *বরং এক দায়িত্ব বটে*। কুরআন বলে কেউ সাক্ষ্য দেবার ডাক পেলে যেন অনুপস্থিত না থাকে কারণ সত্য গোপন করা অপরাধ।

চ. সর্বশেষে এই কথা বলা যায় যে সাক্ষ্য প্রদান সকল মুসলমানের দায়িত্ব। কাজেই যদি এমন হয় যে কোন অপরাধ সংঘটিত হল যার সাক্ষী এক বা একাধিক নারী। এ অবস্থায় কি শুধু সাক্ষী নারী এই অযুহাতে বিচার বন্ধ থাকবে?

## ২. ধর্মীয় বিষয়ে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উদাহরণ

আল্লাহ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীর ভাগ্য কোন পুরুষকে দেননি, দিয়েছিলেন একজন মহিলাকে। তিনি রাসূল (সঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী বিবি খাদিজা (রাঃ) যিনি রাসূল (সঃ)-এর কাছে জিবরাইলের আগমন সংবাদ শুনে কোন দ্বিধা না করেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। রাসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে প্রায়ই হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এসময় তাঁকে দিনের পর দিন খাবার-পানীয় সরবরাহ করতেন বিবি খাদিজা (রাঃ)। তিনি কখনও রাসূল (সঃ)-কে সংসার ত্যাগ করে রাতদিন ধ্যান মগ্ন থাকতে বাধা দেননি। যে দিন প্রথম ওহী নাযিল হলো তখন আবিষ্ট অবস্থায় রাসূল (সঃ) কাঁপতে কাঁপতে বিবি খাদিজার কাছে উপস্থিত হলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) তাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, যেহেতু তিনি সব সময়েই ভালমানুষ ছিলেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন সেহেতু আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষতি করবেন না। ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন মক্কার সব কাফেররা রাসূল (সঃ)-এর উপর চড়াও হল তখন বিবি খাদিজা সারাক্ষণ রাসূল (সঃ)-কে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা করতেন। কোরাইশরা যখন তাদের বয়কট করে তখন সেকালের আরবের অন্যতম ধনী মহিলা বিবি খাদিজা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হাসিমুখে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটান।

## ৩. খাদিজা (রাঃ)-এর ধর্মনিষ্ঠার ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

খাদিজা (রাঃ) তাঁর বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পান আল্লাহর কাছ থেকে জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে। এক সন্ধ্যায় তিনি যখন পর্বতগুহায় রাসূল (সঃ)-এর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিবরাইল (আঃ) উপস্থিত হন এবং তাঁর (খাদিজার) কাছে আল্লাহর তরফ থেকে শুভেচ্ছা ও শান্তির বার্তা পৌছান। তাঁকে এই সুসংবাদ দেন যে আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশতে এক মুক্তার প্রাসাদ তৈরী করেছেন যাতে কোন কোলাহল, অবসাদ ও যন্ত্রণা নেই।

## ৪. খাদিজা (রাঃ)-এর যোগ্যতা সম্পর্কে রাসূল (ঃ)-এর মন্তব্য

তাঁদের বিবাহিত জীবনে খাদিজার (রাঃ) প্রতি রাসূলের (সঃ) আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল চোখে পড়ার মত। রাসূল (সঃ) মাত্র ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেন। অতঃপর বিবি খাদিজার প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (সঃ) আর বিয়ে করেননি। রাসূল (সঃ) তাঁর জীবনের সবচাইতে তরুণ উজ্জ্বল এবং কর্মক্ষম সময়টিই বিবি খাদিজার সাথে সংসার জীবনে ব্যয় করেন। এতে বোঝা যায় তাঁদের বিবাহিত জীবন কত মধুর ও সুখের ছিল। রাসূল (সঃ) প্রায়ই আল্লাহর চোখে সফল নারীর উদাহরণ দিতে গিয়ে বিবি আসিয়া (মুসা (আঃ)-এর পালক মাতা), বিবি মারইয়াম, (ঈসা (আঃ)-এর জননী) এর সাথে বিবি খাদিজার নাম বলতেন। খাদিজার মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও রাসূল (সঃ) বারবার তাঁর কথা স্মরণ করতেন। তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের উপহার পাঠাতেন। খাদিজার প্রতি রাসূলের অনুভূতি দেখে একবার বিবি আয়েশা তাঁর মৃত সতীনের প্রতি খানিকটা ঈর্ষা অনুভব করেন। তখন রাসূল (সঃ) বলেন, "খাদিজা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি, সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল যখন অন্যরা অবিশ্বাস করত, যখন সবাই আমার উপর আর্থিক সমর্থন তুলে নেয় তখন সে তাঁর সমস্ত সম্পদ আমাকে দেয় আর আমার সকল সন্তান তার গর্ভে জন্ম নেয়"। এই বলে রাসূল (সঃ) তাঁর সকল স্ত্রীর উপর বিবি খাদিজার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা দেন। (খাদিজা ব্যতীত অন্য একজন স্ত্রীর গর্ভে ১টি সন্তান জন্ম হয় যার অকাল মৃত্যু হয়)

## ৫. স্বামীর উপর নির্ভরতা ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী মুসলিম নারী

রাসূল (সঃ)-এর কন্যা জয়নাব রাসূলের (সঃ) ইসলাম প্রচার শুরুর পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর স্বামী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে জয়নাব (রাঃ) স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে আসেন। কারণ মুশরিকের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ। উম্মে হাবিবা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর পিতা কঠোর ভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পিতা-মাতার আনুগত্যের চেয়েও উর্ধ্বে।

উমর ইবনে খাত্তাবের বোন ফাতিমা ও তার স্বামী মুসলমান হয়েছে জানতে পেরে উমর উত্তেজিত ও রাগান্বিত হয়ে তাদের বাড়িতে ছুটে আসে। ফাতিমা দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যদিও ওমর তার মুখে আঘাত করে রক্তাক্ত করেন। এ ঘটনার পরেই উমর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

## ৬. ইসলামের স্বার্থে মুসলিম নারীর নির্যাতিতা হবার উদাহরণ

ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলেন একজন মহিলা। তিনি হচ্ছেন সুমাইয়া (রাঃ) যাকে কাফেরদের নেতা আবু জেহেল প্রচণ্ড অত্যাচার করে তাঁর মুখ থেকে ইসলাম বিরোধী

স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টায়। কিন্তু আবু জেহেলের চেষ্টা ব্যর্থ হলে সে নিজ হাতে সুমাইয়া (রাঃ)-কে হত্যা করে। আরেকজন মহিলার চোখ অন্ধ হয় ইসলাম কবুলের জন্য অনেক নির্যাতন করার ফলে। আরও অসংখ্য মহিলা আছেন যারা অত্যাচারিত হয়েছেন এবং চোখের সামনে পিতা, স্বামী, ভাই অথবা সন্তানকে নির্যাতিত হতে দেখেছেন তবু কাফেরদের কাছে মাথা নত করেননি।

## ৭. ইসলামের স্বার্থে বিপদ বরণ করার উদাহরণ

ইসলামের স্বার্থে বিপদজনক কাজে মেয়েদের ঝাঁপিয়ে পড়ার বহু উদাহরণ আছে। আবু বকর (রাঃ) যখন রাসূল (সঃ)-এর সাথে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন তাঁর কিশোরী কন্যা আসমা (রাঃ)-কে আবু জেহেল তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু হযরত আসমা (রাঃ) কাফেরদের শত চাপেও রাসূলের (সঃ) অবস্থান জানাননি। এমনকি আবু জেহেল তাঁকে প্রহার করলেও আসমা (রাঃ) অটল থাকেন। পরবর্তীতে অত্যন্ত গোপনে আসমা (রাঃ) সওর গিরি গুহায় গিয়ে তাঁদের খাবার পৌছান ও কাফেরদের তৎপরতা সম্পর্কে খবর দেন।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ Justice Abdul Qadr Auda 'Criminal Law in Islam. পৃষ্ঠা- ৩১৫"
আল কুরআন- ২ঃ২৮২, ২৪ঃ৬-৯, ৪ঃ১৫, ৫ঃ১০৬-৭, ২৪ঃ৪, ২৪ঃ১৩, ৬৫ঃ২।

প্রশ্ন-২ ঃ ইতিহাসে উল্লিখিত আছে প্রথম ওহী লাভের পর যখন রাসূল (সঃ) কম্পিত ভাবে হেরা গুহা থেকে বাড়ীতে আসেন তখন বিবি খাদিজা (রাঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করেন বলেন, যে 'আপনি আপনার প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়াশীল, আপনি অসহায় মানুষকে সাহায্য করেন, আপনি দানশীল, আপনি সত্যবাদী, আপনি বন্ধুবৎসল এবং রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা করেন। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনার ক্ষতি করবেন না'।

প্রশ্ন-৩ ঃ বিশেষজ্ঞরা বলেন যে যখন কাফেররা রাসূল (সঃ) এর চারিদিকে কোলাহল হট্টগোল করতেন তখন খাদীজা (রাঃ) তাঁর সাথে কোমল ছিলেন, তাই বেহেশতে তাঁর প্রাসাদ হবে কোলাহল মুক্ত। তিনি কখনও রাসূল (সাঃ)-কে কষ্ট দেননি বরং সকল অবসাদ ও যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন, তাই বেহেশতেও অবসাদ ও যন্ত্রণা তাঁকে স্পর্শ করবেনা।

# জি- ২০ ইতিহাসে মুসলিম নারী- ২

**প্রশ্ন ঃ**

১. ইসলামের প্রচারে মুসলিম নারীদের অংশ গ্রহণের কোন দৃষ্টান্ত আছে কি?

২. জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় খ্যাত মুসলিম নারীর উদাহরণ ইতিহাসে আছে কি?

৩. সমাজ কল্যাণ ও দানশীল কর্মকাণ্ডে মুসলিম মেয়েরা জড়িত ছিল কি?

৪. মুসলিম মেয়েরা যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে অংশ নিত কি?

৫. প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মুসলিম মেয়েদের অংশ নেবার কোন ঘটনা আছে কি?

৬. যারা বলে ঐ সময় ইসলাম ছিল নতুন এবং দুর্বল সেহেতু মেয়েদের এসব কাজে অংশ নিতে হয়েছে, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এটা নিষ্প্রয়োজন- এর জবাবে কি বলবেন?

**উত্তর ঃ**

**১. ইসলামের প্রচারে মুসলিম নারী**

ইসলাম প্রচার ও অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। শিক্ষার মতই এটা কোন সুযোগ বা অধিকার নয় বরং প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য কর্তব্য ও দায়িত্ব। ইসলাম প্রচারে নিবেদিতা কয়েকজন মহিলার উদাহরণ ঃ

উরওয়া বিনতে আবদুল মোতালেব রাসূলের (সঃ) মিশনের প্রথম দিকে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ ও প্রচার করেন যখন কাফেররা কঠোরভাবে ইসলামের বিরোধিতা করছিল।

প্রখ্যাত সাহাবা আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মে সালিম তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তৎকালীন মক্কার প্রখ্যাত ধনী আবু তালহার (যিনি তখনও মুশরিক) পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পান। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে আবু তালহা মুশরিক। আবু তালহা যখন তাঁর সম্পদের উল্লেখ করেন তখন তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলেন, "আপনার সোনা রূপার আমার কোন প্রয়োজন নেই বরং যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনার ঈমানই হবে আমার মোহরানা। আপনার কাছ থেকে আর কোন উপহার আমি চাইনা।" পরবর্তীতে আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন ও তাকে বিয়ে করেন।

উম্মে শারিক বিপদ নিশ্চিত জেনেও মুশরিকদের বাড়ী যেতেন এবং তাদের স্ত্রী কন্যাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন।

## ২. জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শিক্ষায় মুসলিম নারী

রাসূল (সঃ)-এর যুগে এবং পরবর্তীতে বহু মুসলিম নারী জ্ঞান অর্জন করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন হচ্ছেন ঃ রাসূল (সঃ)-এর স্ত্রী বিবি আয়েশা (রাঃ) যিনি রাসূলের হাদিসের অন্যতম উৎস ছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবা আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আমরা সাহাবারা যখনই ইসলামী আইনের জটিল কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতাম তখনই হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে যেতাম এবং সমাধান পেতাম। আয়েশা (রাঃ) প্রায়ই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বিষয়ে ফতওয়া ও সিদ্ধান্ত দিতেন।

মদীনার আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাসূল (সঃ)-এর নিকট বায়াত নেন মদীনাতে। তিনি এত ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেছিলেন যে, জ্ঞান বিতরণ করা তার পেশায় পরিণত হয়েছিল এবং পরবর্তী অনেক পণ্ডিত তার কাছ থেকে জ্ঞানাহরণ করেছিল।

## ৩. সমাজকল্যাণমূলক কাজে মুসলিম নারী

নারী স্বভাবতইঃ কোমল, দয়ালু এবং ত্যাগী; কাজেই দান, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি কাজে তারা সব সময়ই অগ্রণী। ইসলামের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায় মানুষ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই ত্যাগী, পরোপকারী ও সমাজসেবী হয়ে উঠে। মেয়েরাও এ ধরনের কাজে সমানভাবে অংশ নিয়েছে।

রাসূল (সঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের তাঁর জন্য এক লক্ষ দিরহাম উপহার নিয়ে আসেন। সাথে সাথেই সমুদয় অর্থ তিনি গরীবদের মাঝে বন্টন করেন। সেদিনটিতে তিনি রোযা ছিলেন। সারাদিন সমস্ত অর্থ গরীবদের বিলিয়ে ইফতারের সময় যখন তিনি ঘরে ফিরেন তখন দেখেন যে ঘরে এতটুকুও খাবার নেই, কোন টাকা পয়সাও নেই; লক্ষ দিরহাম পেয়ে একবারের জন্যও তিনি নিজের কথা ভাবেননি।

ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন রাসূলের অত্যন্ত স্নেহের কন্যা। একবার তিনি এবং আলী (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের অভাব দারিদ্র্যের কথা বলেন এবং একজন কাজের লোক দিতে বলেন। এটা কোন বিলাসিতার দাবী ছিলনা। ফাতিমা-আলীর অভাবের সংসারে সব কাজ তাদের করতে হত। যাঁতায় গম পিষে আটা বানাতে গিয়ে ফাতিমার (রাঃ) হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল আর পানির ভিস্তি বহন করতে করতে আলী (রাঃ)-এর পিঠে দাগ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও রাসূল (সঃ) তাঁদের বলেন, "আমি তোমাদের কাজের লোক দিতে পারব না, যেখানে অনেক মুসলিম এখনো অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে"। বরং তিনি তাঁদের কয়েকটি দোয়া পড়তে বলেন। ফাতিমা এবং আলী (রাঃ) সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান। তাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক মুক্তি ও শান্তি দুনিয়ার আরামের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান ছিল। এই চিত্রের সাথে যদি বর্তমান সময়ের প্রশাসকদের তুলনা

করা হয় তাহলে দেখা যায় এরা নিজের ও পরিবারের কল্যাণে অকাতরে রাষ্ট্রের অর্থ ও জনবল ব্যয় করছে।

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) বাজারের দোকানীরা যাতে ক্রেতাদের ঠকাতে না পারে তা দেখার জন্যে উম্মে শিফা নামে একজন মহিলাকে নিযুক্ত করেছিলেন। উমর (রাঃ) তার মতামতকে খুবই গুরুত্ব দেন।

## ৪. যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ

শুরু থেকেই ইসলামের সাথে বাতিলের সকল যুদ্ধে মুসলিম মেয়েরা ইসলামের স্বার্থে অংশ নিয়েছে। রণাঙ্গনে তারা পুরুষের পাশে থেকে তাদের খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা সহ অন্যান্য সাহায্য করেছে। অসংখ্য হাদিসে এমন অনেক নেতৃস্থানীয় মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন রাবিয়া বিনতে মাউদ, উম্মে আতিয়া, আয়েশা, উম্মে আইমান, উমাইয়া বিনতে কায়েস গাফারিয়া, উম্মে সালিম, নুসাইবা বিনতে কা'ব, উম্মে তাহের, হামনা বিনতে যাশ, সাফিয়া বিনেত আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ। এরা ছিলেন আরো অনেক নাম না জানা মুসলিম মুজাহিদা নেত্রী। উমাইয়া বিনতে কায়েস গাফারিয়া বলেন, তিনি প্রথম যুদ্ধে যোগ দেন খুব অল্প বয়সে। তিনি যখন রাসূল (সঃ)-এর কাছে এসে আরো কয়েকজন নারীসহ যুদ্ধে যাবার অনুমতি চান তখন রাসূল (সঃ) বলেন, 'আল্লাহর রহমতে এগিয়ে এসো'।

## ৫. প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মুসলিম নারী

হুনায়েনের যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় তখন উম্মে সালিম তার কোমরে ছোরা বেধে তাঁর স্বামী আবু তালহাকে বলেন যে তিনি তার কাছে যে কোন কাফের এলে হত্যা করবেন। তাঁর স্বামী আবু তালহা (রাঃ) অথবা রাসূল (সঃ) কেউ তাঁকে এ কাজে বাধা দেননি। উহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা রাসূল (সঃ)-কে ঘিরে ফেলেছিল তখন আরও কয়েকজন মুসলিম পুরুষের মধ্যে নুসাইবা বিনতে কা'ব তলোয়ার হাতে রসূল (সঃ)-কে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাফেরদের মোকাবেলা করেন।

খন্দকের যুদ্ধে সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব একজন শত্রুসৈন্যকে তাঁবুর খুঁটির আঘাতে হত্যা করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন বিপন্ন অবস্থায় তখন আসমা বিনতে ইয়াজিদ তাঁবুর খুঁটির সাহায্যে দশ জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।

## ৬. বর্তমান সময়ে ইসলাম রক্ষায় মুসলিম নারীর ভূমিকা

বিপদ এবং আগ্রাসন কোন নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। অতীত যুগে ইসলাম রক্ষায় মেয়েরা যোগ দিয়েছে এখন তারা যুদ্ধে যেতে পারবেনা এমন বলা ভুল। বরং বর্তমান সময়েই ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক এসব দেশের দিকে

তাকালে দেখা যাবে মেয়েরাও ছেলেদের পাশে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে যুদ্ধে যাওয়া মেয়েদের জন্য ছেলেদের মত *ফরয* নয়। তাই বলে তারা স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে তাদের বাধা দেবার কোন যুক্তি নেই। উল্লেখ্য যে, ঘরে ছোট সন্তানকে অযত্নে রেখে মেয়েদের যুদ্ধে যাওয়া ইসলাম চায় না। তাই বলে যাদের অবসর আছে তাদের যুদ্ধে যেতে বাধা দেয়া যাবে না।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৪ ঃ উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদিসে দেখা যায় তিনি রাসূল (সঃ)-এর সাথে ৭টি যুদ্ধে অংশ নেন। তার কাজ ছিল যুদ্ধাস্ত্র, খাদ্য, পানীয় সরবরাহ, চিকিৎসা এবং সেবা প্রদান করা।

প্রশ্ন-৫ ঃ রাসূলের (সঃ) হাদিসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে তিনি বলছেন, "আমি ডানে কিংবা বায়ে যেদিকেই তাকিয়েছি, দেখি নুসাইবা বিনতে কা'ব আমাকে রক্ষার জন্য লড়ছে।" ওহুদ যুদ্ধে নুসাইবা বিনতে কা'ব ১২ জায়গায় আঘাত পান।

প্রশ্ন-৬ ঃ কিছু লোক মেয়েদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে একটি হাদিস উদ্ধৃত করে। যখন উম্মে কাবশা যুদ্ধে যেতে চান তখন রাসূল (সঃ) তাঁকে নিষেধ করে বলেন যে যদি তাঁকে অনুমতি দেয়া হয় তবে সেটাই রীতি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যেহেতু ইতিপূর্বে উল্লিখিত অনেক হাদিসে এবং ঘটনায় এটা দেখা যায় যে রাসূল মেয়েদের যুদ্ধে গমনকে অনুমোদন করেছেন সেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে একটি হাদিসকেই এ ব্যাপারে শিক্ষার উৎস করা ঠিক নয়।

# জি- ২১ ইতিহাসে মুসলিম নারী- ৩

**প্রশ্ন ঃ**

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিখ্যাত মহিলাদের কথা গুরুত্বের সাথে আলোচনার কি প্রয়োজন?

২. পরবর্তী যুগের মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে কি জানা যায়?

৩. এই অবনতির কারণ কি?

৪. ইসলামী আইনে প্রাপ্য অধিকার থেকে নারীকে পরবর্তী যুগে বঞ্চিত করার উদাহরণ দিন।

৫. নারীর প্রতি এই বঞ্চনা যে ইসলাম বিরোধী এ ব্যাপারে যুক্তি কি?

৬. উপরের প্রশ্নের উত্তরে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিন।

৭. নারীর কণ্ঠ শোনা যে পুরুষের জন্য হারাম নয় তা প্রমাণ করুন।

৮. কিছু মুসলিম কিসের ভিত্তিতে দাবী করে যে নারীর কণ্ঠ শোনা হারাম?

**উত্তর ঃ**

### ১. ইসলামের প্রাথমিক যুগের মহিলাদের কথা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জীবনধারা আধুনিক মুসলমানদের জন্য আদর্শ। কারণ তখন স্বয়ং রাসূল (সঃ)-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় মুসলমানরা জীবন পরিচালিত করত। ইসলামের এই প্রাথমিক যুগ এবং সেই সময়ের মহিলাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে যখন সমগ্র বিশ্বে নারীর অধিকার ছিল উপেক্ষিত নারীর প্রতি আচরণ ছিল নেতিবাচক সেই সময় ইসলামই নারীকে যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছিল। আর সে সময়কার নারীরা সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

### ২. পরবর্তী যুগে মুসলিম নারীদের অবস্থা

যদিও ইসলাম নারীদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং প্রাথমিক যুগের সকল মুসলিম তা মেনে চলত, কিন্তু পরবর্তী যুগে এই চর্চা অনেকাংশে রক্ষিত হয়নি। ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, জাতিতে প্রসারিত হয়েছে। যুগের আবর্তনে সেসব জাতির বিভিন্ন কুসংস্কার ইসলামের নিজস্ব নীতি-নিয়মকে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাস করেছে। বর্তমানে ৫০টিরও বেশী দেশ জুড়ে বিস্তৃত মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই নারীর অধিকার বলতে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সেই দেশের বা জাতির মূল্যবোধের এক সমন্বিত রূপ বিরাজ করছে।

### ৩. ইসলামী সভ্যতার অবনতির কারণ

মুসলমানদের ঈমান তথা বিশ্বাসের প্রতি আন্তরিকতার অভাবই ইসলামী সভ্যতার পতনের মূল কারণ। যখন থেকে মুসলমানরা ঈমানের বাস্তব অনুশীলন কমিয়ে শুধু মুখের স্বীকৃতির (Lip service) মাঝে ঈমানকে সীমাবদ্ধ করা শুরু করল তখন থেকে সবক্ষেত্রেই তাদের পতনের শুরু। ফলশ্রুতিতে অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়েছে এবং বিভিন্ন

কুসংস্কারে তারা আচ্ছন্ন হল। যার পরিণতিতে মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়েরই মর্যাদা এবং অধিকার নষ্ট হল, যদিও নারীর ক্ষতিই ছিল বেশী। এভাবেই মুসলিম পুরুষরা একসময় নারীদের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শুরু করল। আর নারীরাও এসব অধিকার ফিরে পেতে নিশ্চেষ্ট বসে রইল।

## ৪. খোদা প্রদত্ত নারীর অধিকার হরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

অনেক ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবে তার মধ্যে চারটি উল্লেখযোগ্য-

ক. মেয়েদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত করা

খ. কনের মত ছাড়াই বিয়ে দেয়া

গ. হিজাবের পরিবর্তে পর্দা (অবরোধ) আরোপ

ঘ. নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য হারাম (আওরা) ঘোষণা

## ৫. সব অধিকারহরণ ইসলাম বিরোধী কেন?

ক. রাসূল (সঃ)-এর বহু সহীহ হাদিস আছে যাতে তিনি মেয়েদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে তাদের পিতা-স্বামীদের নিষেধ করেছেন।

খ. ইসলামী আইন অনুসারে বর ও কনে উভয়ের মত না থাকলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

গ. পর্দার নামে যে অবরোধ প্রথা চলছে তা ইসলামসম্মত নয়। এটা হিন্দু, পার্সিয়ান এবং বাইজান্টাইন সভ্যতায় এবং কোন কোন খ্রীষ্টান সমাজে দেখা যেতো। কুরআনে পর্দা শব্দটি নাই এবং কুরআনে যে হিজাব শব্দ এসেছে তার ব্যাখ্যা অন্য। হিজাব হচ্ছে পোশাক, মন ও আচরণে শালীনতা এবং অবাধ মেলামেশা এড়িয়ে নৈতিকতা ও নারীর পবিত্রতা রক্ষা করা। হিজাব মেয়েদের প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়াকে বন্ধ করে না।

এই সাথে আর একটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন যা হচ্ছে 'হারেম'। এই শব্দটিও নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। হারেম শব্দটি 'হারাম' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ নিষিদ্ধ। যা মূলতঃ ছিল মুসলমানের বাড়ির যে অংশে পরিবারের মহিলারা থাকেন এবং যেখানে বাইরের পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এই হারেম শব্দ মুসলিম নামধারী কিছু রাজা-বাদশা ও ধনী ব্যক্তির রক্ষিতাদের আবাসস্থলের নামে ব্যবহৃত হয়, যা সম্পূর্ণ অনৈসলামী চর্চা।

## ৬. উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি

কুরআন এবং হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে। ৩৩ নং সুরার ৫৯ নং আয়াতে দেখা যায় যে আল্লাহ মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে বারণ করেননি বরং তাদের শালীনতা বজায় রেখে যেতে বলেছেন। রাসূল (সঃ) বলেন, "আল্লাহ তোমাদের বৈধ প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন"। রাসূলের (সঃ) জীবনে এমন ঘটনাও দেখা যায় যে তিনি তাঁর আত্মীয় অথবা বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছেন যেখানে প্রধান মেজবান ছিলেন মহিলা। তিনি সেখানে তাদের সাথে কথা বলতেন,

একসাথে খেতেন এবং তাঁদের খুঁটিনাটি খবর নিতেন। যেমন তিনি রাবিয়া বিনতে মাউদ-এর বাড়ী গিয়ে তাঁর কাছে অযুর জন্য পানি চাইলেন। যদিও এসব সাক্ষাতে নারী পুরুষ উভয়েই থাকত তবুও তারা ইসলামের শালীনতার আইন মেনে চলতেন। এতে পরিষ্কার হয় যে, নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে।

## ৭. নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ (আওরা) না হবার প্রমাণ

যদি নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য নিষিদ্ধই হত তবে ৩৩ নং সুরার ৩২ নং আয়াতে রাসূলের স্ত্রীদের এভাবে বলা হত না যে পুরুষের সাথে কোমল (আকর্ষণীয়) ভাষায় কথা বলোনা বরং স্বাভাবিকভাবে (Customary ভাষায়) কথা বলো। এছাড়াও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে অনেক সাহাবা ও ইসলামের পণ্ডিত নারীর কাছ থেকে হাদিসসহ অনেক বিষয় শিখেছেন। রাসূলের কাছে নারীরা আসতো এবং তাদের সমস্যা ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করত। বস্তুতঃ নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য নিষেধ এমন কোন উদ্ধৃতি কুরআনে বা হাদিসে নেই।

## ৮. যার ভিত্তিতে কিছু মুসলিম নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের জন্য হারাম হবার কথা বলে

এ বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নায় প্রাপ্ত শিক্ষা অপরিবর্তনীয় এবং তা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু তারপরও কিছু ব্যক্তি এসব শিক্ষার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়। তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসূলের (সঃ) উপস্থিতিতে মানুষ বেশী ধার্মিক ছিল ফলে তাদের জন্য অনেক সুযোগ অবারিত ছিল, যার অপব্যবহার তারা করত না। এখনকার যুগে এসব সুযোগ উন্মুক্ত থাকলে সমাজ পাপে সয়লাব হয়ে যাবে। কারণ মানুষের নৈতিক মান নেমে গেছে। (মূলতঃ এসব যুক্তি আমার ও ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য- অনুবাদক)

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশনা ও আদেশ মত না চলে।”। (১৩ঃ১১)

প্রশ্ন-৫ ঃ আয়েশা (রাঃ) প্রায়ই রাতে জামাতে নামাজ পড়তে অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে মসজিদে যেতেন এবং কেউ এতে বাধা দিতেন না।

ঐতিহাসিকরা বলেন হারেম কোন বন্দীশালা ছিল না বরং মুসলমানের বাড়ীর সবচাইতে সুন্দর অংশ যেখানে বাগান ও ঝর্ণা পর্যন্ত থাকত।

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৩৩ঃ৫৯

হাদিসে রাসূল (সঃ) সতর্ক করেন যে মুসলমানরা কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন না করে যেন পথে বের না হয়, তা হচ্ছে যথাঃ ‘দৃষ্টিকে সংযত করা, মানুষকে আঘাত না করা, সালামের জবাব দেয়া, মেয়েদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা’। এই হাদিসের বাচনভঙ্গী দেখে বোঝা যায় রাসূল (সঃ) আশা করছেন মেয়েরা ঘরের বাইরে থাকবে।

প্রশ্ন-৭ ঃ আল কুরআন ৩৩ঃ৩২, সুরা মুজাদালা।

# জি-২২- সাম্প্রতিক ইতিহাসে মুসলিম নারী

**প্রশ্ন ঃ**

১. সাম্প্রতিক ইতিহাসে মুসলিম নারীদের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

২. এর মধ্যে প্রথম ধারাটি কেন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে?

৩. যারা এর মাঝে স্থিতাবস্থা (Status quo) বজায় রাখতে চায় তাদের যুক্তি কি?

৪. রাসূলের (সঃ) ঐ হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করুন যেখানে বলা হয়েছে মেয়েরা শুধু সতীত্ব বজায় রেখে নামাজ, রোযা আর স্বামীর আনুগত্য করলেই বেহেশতে যাবে।

৫. এটা কি সত্য যে রাসূল (সঃ) বলেছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর 'পুরুষরা নারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে? এ কথার অর্থ কি?

৬. কিছু মানুষ রাসূলের (সঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে মেয়েরা ধর্ম ও মনের দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে অসুবিধেজনক অবস্থানে- এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন।

৭. রাসূল (সঃ)-এর ঐ হাদিসের ব্যাখ্যা করুন যেখানে বলা হয়েছে 'মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়'।

৮. উপরের প্রশ্নগুলোয় রাসূলের হাদিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা কিভাবে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

**উত্তর ঃ**

### ১. সাম্প্রতিক ইতিহাসের মুসলিম নারীদের প্রবণতা সমূহ

সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিশ্বে মুসলিম নারীদের মাঝে তিনটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ঃ

ক. একদল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের আদর্শে বিশ্বাসী,

খ. একদল বর্তমান অবস্থায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইছেন,

গ. ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য একদল কাজ করছেন (এর পক্ষেই দ্রুত সমর্থন বাড়ছে)

উনবিংশ শতকের শেষভাগে এসে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও নেদারল্যান্ডের উপনিবেশে পরিণত হয়। সমগ্র বিশ্বে পাশ্চাত্যের দোর্দণ্ড আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে কিছু মুসলমানের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নেয় যে তাদের এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে তাদের ধর্ম ইসলাম। পশ্চিমা বুদ্ধিদাতারাও তাদের এই মন্ত্রণা দিতে থাকে যে ইসলামই মুসলিম বিশ্বকে পশ্চাতে নিয়ে যাচ্ছে। যেসব মুসলমানের ঈমান ছিল দুর্বল এবং বিশেষভাবে যারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিল তারাই ইসলাম বাদ দিয়ে অবাধ পাশ্চাত্যকরণের পক্ষে বেশী সাফাই গায়। এর অংশ হিসেবেই মুসলিম মেয়েদের শালীন পোশাক বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অশালীন পোশাক পরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

## ২. পশ্চিমাকরণ কেন ব্যর্থ প্রমাণিত হল

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের সীমা ও বিশ্বাসের আওতায় যে কোন উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন বৈধ। কিন্তু যখন মানুষ তার ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি-নীতি ভুলে অন্ধের মত পাশ্চাত্যের অনুকরণ শুরু করে তখন সে ভুলে যায় কোনটা প্রয়োগযোগ্য আর কোনটা প্রয়োগযোগ্য না। নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা তাকে আরও পিছিয়ে দেয়। ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে কোন আধুনিকায়ন প্রক্রিয়াই সফল হতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী নেতারা এটাই করেন। তারা যদি এমন না করে নিজের ধর্মের দিকে তাকাতেন তাহলে দেখতেন পাশ্চাত্যের সব চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব ইসলামেই আছে। সমাজের উন্নয়নে আধুনিকায়নে পাশ্চাত্যের কাছে না গিয়ে ইসলামের কাছেই সমাধান পাওয়া যেতো, বিশেষভাবে নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেখানে বিশ্বে একমাত্র ইসলামই নারীর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে।

## ৩. বর্তমান অবস্থায় স্থিতাবস্থা যারা বজায় রাখতে চায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গী

পাশ্চাত্যের আগ্রাসনে ভীত একদল সমাজবিদ শংকা করছেন যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এই অপস্রোতকে ইসলামী আদর্শ রোধ করতে পারবে না। তারা আরও ভয় পাচ্ছেন যে এই পাশ্চাত্যকরণের ফলে সৃষ্ট অবাধ মেলামেশা মুসলিম সমাজের নৈতিক মানকে ধ্বংস ও পর্যুদস্ত করবে; ইসলামের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে দেবে। তাই তারা এই অপস্রোত থেকে নারীকে দূরে রাখতে তাকে আরও ঘরে আবদ্ধ করে শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে চাচ্ছেন। এজন্য তারা কুরআন বা হাদিসে বর্ণিত নারীকে অনেক অধিকারকে রদ করে দিচ্ছেন। এবং কিছু হাদিসের ভুল ও বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা ব্যবহার করছেন।

## ৪. নারীর বেহেশতে যাবার জন্য কি শুধু সতীত্ব রক্ষা, নামাজ, রোযা আর স্বামীর আনুগত্যই যথেষ্ট?

এ ধরনের একটি হাদিসে আছে যে কয়টি কাজ করেই নারী বেহেশত লাভ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে এই হাদিসের এমন ব্যাখ্যা করা ভুল যে মুসলিম নারীর বেহেশত লাভের জন্যে একটি কাজই করতে হবে। কারণ-

ক. ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ আছে যা সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয। কিন্তু ঐ হাদিসের ব্যাখ্যা করে যারা নারীর অন্যান্য কাজ বাদ দিতে চান তারা কি নারীর উপর আল্লাহর আরোপিত ফরয যাকাত এবং হজ্জও নিষিদ্ধ করবেন?

খ. স্বয়ং রাসূল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে সব কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। (কাজেই একটি হাদিসের ভিত্তিতে তাঁর সমগ্র জীবনের বাস্তবতাকে উল্টে দেয়া যায় না- অনুবাদক)।

## ৫. পুরুষেরা নারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন- এর ব্যাখ্যা

এ ধরনের শঙ্কা এক হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেছেন যা সহীহ। লক্ষ্য করা দরকার যে এখানে ফিৎনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অনূদিত অর্থ দাঁড়ায় ভ্রান্তি (temptation)। কিন্তু এর আরও অর্থ আছে যার মানে পরীক্ষা (test or trial)। কুরআনে বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য ফিৎনা (অর্থাৎ পরীক্ষা)" কাজেই এখানে স্বামী-স্ত্রী, সম্পদ বা সন্তান কাউকেই হেয় করা হয়নি বা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। বরং মানুষকে এটাই সতর্ক করা হয়েছে যে যখন সে আল্লাহর রহমতে স্ত্রী, স্বামী, সন্তান, সম্পদ লাভ করবে তখন এসব যেন তাকে খোদার স্মরণ থেকে দূরে নিয়ে না যায়। জীবনের প্রতিটি বিষয়ই একেকটি পরীক্ষা (test)।

## ৬. ধর্ম ও মনের দিক থেকে মেয়েরা কি পুরুষের চেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থানে?

কোন আলোচনার প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) এমন উক্তি করেছেন তা জানা প্রয়োজন। রাসূল (সঃ) মেয়েদের সৎ কাজের উপদেশ দিতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে বানিয়েছেন। তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে ধর্মের দিক থেকে নারীর পিছুটান কোথায়; তার উত্তরে তিনি বলেন, তাদের ঋতুস্রাবের দিনগুলোয় তারা নামায পড়তে পারে না। (এখানে উল্লেখ্য যে শরীর থেকে রক্তঝরার সময় নারী পুরুষ উভয়েরই অযু নষ্ট হয়। নামাজ পড়তে পারে না যতক্ষণ না তারা গোসল করে) অতঃপর রাসূল (সঃ) মেয়েদের ভাল কাজ করার মাধ্যমে নামাজ না পড়ার ঘাটতি (অবশ্যই এ জন্য তারা আদৌ দায়ী নয়) পুষিয়ে নিতে বলেন। (অবশ্য তাঁর এ কথায় মেয়েদের প্রতি মমত্বই ফুটে উঠে, অবজ্ঞা নয় –অনুবাদক)। একই সময়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল মেয়েদের মনের দিক থেকে অসুবিধে কোথায়, তখন তার জবাবে তিনি বলেন যে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মেয়ের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে।

এই সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয়টির ব্যাখ্যা আগেই দেয়া হয়েছে। (আরও উল্লেখ্য যে রাসূলকে যে ভাষায় প্রশ্ন করা হয়েছে উত্তর সেভাবেই এসেছে। প্রেক্ষিত বিবেচনা না করে শুধু উত্তরের বাক্য বিবেচনা করলে চলবে না।- অনুবাদক)। কোনভাবেই রাসূল (সঃ) বলছেন না যে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান, বরঞ্চ এরকম বলা ইসলামের শিক্ষারই বিরুদ্ধ কথা।

## ৭. মেয়েরা কি পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মত

এই উক্তি বিভিন্ন হাদিস সংকলনে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও এটা লিখা হয়েছে যে আল্লাহ নারীদের 'পাঁজরের হাড় থেকে' তৈরী করেছেন আর কোথাও লিখা হয়েছে যে 'নারী পাঁজরের হাড়ের মত'। দ্বিতীয় বর্ণনাটাই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে

রাসূল (সঃ) যেটা বোঝাতে চেয়েছেন তার অর্থ হচ্ছে পাঁজরের হাড় প্রকৃতই বাঁকা। কেউ যদি তাকে জোর করে সোজা করতে চায় তবে তা ভেঙ্গে যাবে। তেমনি নারীকে আল্লাহ যে সহজাত বৈশিষ্ট্য ও প্রবৃত্তি নিয়ে তৈরী করেছেন, কোন মানুষ (সম্ভবত স্বামী) যদি তাকে তার বৈশিষ্ট্য জোর করে বদলাতে চায়, তবে সেও ভেঙ্গে যাবে। একদল আইনবিদ এ ভেঙ্গে যাওয়াকে মনে করছেন যে, তা বিবাহ বিচ্ছেদে রূপ নিতে পারে। কাজেই দেখা যায় যে, এই পাঁজরের হাড়ের কথা বলে রাসূল (সঃ) নারীকে অপমান করছেন না বরং তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে পুরুষকে উপদেশ দিচ্ছেন যাতে পুরুষেরা নারীদের (স্ত্রী, কন্যা, বোন) সাথে আরো সহনশীল আচরণ করে।

এর প্রমাণস্বরূপ আর একটি হাদিসে দেখা যায় রাসূল (সঃ) বলছেন, "নারীর প্রতি দয়ালু হও কারণ তারা পাঁজরের হাড়ের মত। আমি তাদের প্রতি দয়ালু হতে তোমাদের বলছি"।

## ৮. এসব ব্যাখ্যার যথার্থতার প্রমাণ

ইসলামের মূল সূত্রই হচ্ছে কুরআন এবং হাদিস। সামগ্রিকভাবে কুরআনের কোথাও এমন কোন কথা নেই যাতে নারীকে খাট করা হয়েছে। আবার এমন কোন হাদিসও নেই যা কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটা হাদিসের দু'একটা বাক্য উদ্ধৃত করে নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা তৈরীর চেষ্টা করা ভুল। কুরআন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে যে, নারী ও পুরুষ উভয়ে সৎ কাজের জন্যে সমান পুরস্কার পাবেন।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ যেমন, মিসরের কাশিম আমীন এবং হুদা শরাভী

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ৮ঃ২৮, ৬৪ঃ১৪

প্রশ্ন-৮ ঃ আল কুরআন ৭৪ঃ৩৮, ৩৩ঃ৩৫

# জি- ২৩- বর্তমান সমাজে মুসলিম নারী

**প্রশ্ন ঃ**

১. পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের মোকাবেলায় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি?

২. ইসলামী পুনর্জাগরণের মূলভিত্তি কি?

৩. সামাজিক রীতিনীতি কি ইসলামী আইনের গ্রহণযোগ্য অংশ?

৪. বর্তমান সমাজে নিজের অবস্থার উন্নয়নে মুসলিম নারী কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

৫. পরিবারের মধ্যে থেকে সামাজিক উন্নয়নে মুসলিম নারী কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

৬. বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে মুসলিম নারীর ভূমিকা কি?

৭. নারীর উন্নয়নে মুসলিম পুরুষের কি ভূমিকা রাখা উচিত?

**উত্তর ঃ**

**১. পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন**

চারটি মূলনীতি ভিত্তি করে এই পুনর্জাগরণ আন্দোলন চলছে। তা হলো ঃ

ক. এটা সবার কাছে প্রচার করা যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী সমাজের সকল স্তরের সব কাজে জড়িত ছিল। ইসলামী সভ্যতা ও মূল্যবোধের পতনের সাথে নারীর উপর বিভিন্ন বিধি নিষেধসহ অবরোধ নেমে আসে। কাজেই এই আন্দোলন নারীকে আবার সমাজে সক্রিয় হতে বলে, এবং অবশ্যই তা ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে।

খ. মুসলমানদের মাঝে এই চেতনা জাগ্রত করা যে তারা হবে পথিকৃৎ, অনুকরণকারী নয়; নেতা, অনুসরণকারী নয়। কাজেই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। সমাজ ব্যবস্থার যে কোন উন্নয়ন বা সংস্কার হতে হবে আল্লাহর ও রাসূলের (সঃ) অনুমোদিত পন্থায়।

গ. সবার কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আদায় যে ইসলামই নারীর মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এই অধিকার আদায়ে মুসলিম মেয়েদের সচেতন করা।

ঘ. সবার মাঝে এই অনুভূতি জাগানো যে ইসলামী সভ্যতার সমস্যা ও বিপদ ইসলামের ও ইসলামী আইনের কোন দুর্বলতা বা অপরিপূর্ণতা নয় বরং মুসলমানদের ইসলামের শিক্ষা ও তার প্রয়োগ থেকে দূরে সরে যাবার পরিণতি মাত্র। কাজেই এ থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায়, তা হচ্ছে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তন। সমস্যা মুসলমানদের নিয়ে এবং এটা ইসলাম ধর্মের সমস্যা নয়।

## ২. ইসলামী পুনর্জাগরণের মূলভিত্তি

যে কোন ধর্মীয় পুনর্গঠন আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। এর অর্থ হচ্ছে মানবজীবনের সার্বিক পুনর্বিন্যাস সাধনে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বা সামষ্টিক ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ নির্দ্বিধায় বাস্তবায়নের দৃঢ় মানসিকতা। এই আধ্যাত্মিক ভিত্তি বিনির্মাণের পর আসে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি নির্মাণের প্রশ্ন। বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি নির্ভর করে ইসলামের 'নির্ভরযোগ্য উৎস' থেকে প্রকৃতভাবে ইসলামকে বুঝা।

এই আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হচ্ছে মুসলমানদের এমন জ্ঞান অর্জন যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ নির্ধারিত মাপকাঠিতে যে কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতা, ঠিক বা বেঠিক হবার প্রশ্নের সমাধানে সক্ষম হবে। মূলতঃ ইসলামের শিক্ষা আক্ষরিক অর্থে ও ভাবার্থে (in letter and spirit) প্রয়োগ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে আঞ্চলিক রীতিনীতি ও চর্চা যা ইসলামী শিক্ষাকে বিতর্কিত করতে পারে তা বেছে চলতে হবে।

## ৩. সামাজিক রীতিনীতি (Custom) প্রসঙ্গে

ইসলামী আইনে সামাজিক রীতিনীতি কোনো কোনো সময় অবদান রাখতে পারে। তবে তা কখনই ইসলামী আইনের নিঃশর্ত উৎস হতে পারে না। বস্তুতঃ অনেক স্থানীয় রীতিই অনৈসলামিক হতে পারে। সামাজিক রীতিনীতির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে তা অবশ্যই ইসলামসম্মত হতে হবে বা অন্ততঃ পক্ষে তাতে ইসলামবিরোধী কিছু থাকতে পারবে না। যদি এমন কোন রীতি থাকে যা ইসলাম বিরোধী তবে তা অবশ্যই বাতিল বা বর্জন করতে হবে, এর অন্যথা হতে পারবে না।

## ৪. সমাজে নিজেদের অবস্থানের উন্নয়নকল্পে মুসলিম নারীর ভূমিকা

পুরুষের মত প্রত্যেক নারীও এই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপক দায়িত্ব তার উপরও সমানভাবে আছে- এই অনুভূতি নিয়ে প্রতিটি মেয়ের কাজ করা উচিৎ। এভাবে কাজ করলে সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক-এ সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারবে।

## ৫. পারিবারিক পর্যায়ে কিভাবে মুসলিম নারী সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে?

সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে পরিবার মুসলিম নারীর সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র। বধু, মাতা, কন্যা তিনভাবেই নারী পরিবারে সক্রিয়। বিয়ের পূর্বে একটি মেয়ে তার তৎপরতায় তার পরিবার পিতা, মাতা, ভাই, বোনদের ও আত্মীয়দের মাঝে ভালবাসা ও শান্তির পরিবেশ তৈরী করতে পারে, যা অবশেষে সমাজেই শান্তি আনবে। বিবাহিত জীবনে সে স্বামীর সৎপথে চলার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণাদাতা হতে পারে। সংসারে

যত্নবান থেকে স্বামীকে সৎকাজে উৎসাহ আর অসৎকাজ থেকে দূরে রাখতে পারে। তার যদি সন্তান থাকে তবে তাদের মাধ্যমে সমাজের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের কাণ্ডারীর ভূমিকা রাখতে পারে। সে শুধু সন্তানদের শারীরিকভাবেই বড় করবে না বরং আধ্যাত্মিকভাবেও। বস্তুতঃ সন্তানের দ্বীন শিক্ষার প্রথম ইনস্টিটিউট মা।

## ৬. বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে মুসলিম নারীর ভূমিকা

বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে নারী, সমাজের সবার কল্যাণকামী বোনের ভূমিকা রাখবে। কুরআনে ৯ নং সূরার ৭১ নং আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। মনে রাখতে হবে যে এই কাজের জন্য তাকে আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে। এ জবাবদিহিতা এড়ানো যাবে না।

আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন মুসলিম নারী (পুরুষের মতই) প্রথমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা অর্জন করে নিজের সব পছন্দ অপছন্দের উপর আল্লাহর ইচ্ছাকে স্থান দিতে হবে।

আর দ্বিতীয় কাজ হবে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পোশাকে, চলাফেরায়, ব্যবহারে, নামাজে, রোযায়, দানশীলতায় তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন করা। সমাজে সচেতন মুসলিম হিসেবে ভূমিকা রাখবার জন্য ইসলামের সীমার মধ্যে পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

তৃতীয়ত মুসলিম নারী ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তার সাথে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করবে এবং এই কাজে তার অংশ নেয়ার যৌক্তিকতা অন্য মুসলমানদের বুঝাবে।

সর্বশেষে সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেয়া বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের জবাব দেবে। ইসলামই যে নারীর অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা সরবে প্রকাশ করবে। এবং প্রজ্ঞার সাথে এসবের প্রয়োগ ঘটাবে, নতুন কিছু আমদানীর পরিবর্তে।

## ৭. মুসলিম নারীর উন্নয়নে পুরুষের ভূমিকা

উপরে নারীর দায়িত্ব হিসেবে যা যা উল্লেখ করা হল তার অধিকাংশই নারী পুরুষ উভয়ের যৌথ দায়িত্ব। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব একই। পারিবারিক পর্যায়ে পুরুষ তার মা, স্ত্রী বা কন্যা ইসলামে বর্ণিত উপায়ে আচার-ব্যবহার করবে। সে তার পরিবারের নারীদের পৃথক ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দেবে এবং তাদের পরিচয় ও অধিকার নিশ্চিত করবে। সে এটা স্বীকার করবে যে নারী তার কাজের জন্য স্বামীর কাছে নয় আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। কাজেই সে তার স্ত্রীর মধ্যে যাতে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় তার ব্যবস্থা করবে। কোন কোন

পুরুষ তাদের স্ত্রী-কন্যাদের আল্লাহর প্রতি কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ান। অথচ উচিত হচ্ছে সে তাদের আল্লাহর কাজে শুধু অনুমতিই দেবে না বরং উৎসাহ যোগাবে। ইসলাম বলে যে নারীর দায়িত্ব শুধু পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম নারীকে সমাজ সচেতন হিসেবেই দেখতে চায়। কাজেই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করার মত উপযুক্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রভৃতি অর্জনের জন্যে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রত্যেক পুরুষ তার স্ত্রী, কন্যা এবং বোনকে তৈরী করবে, যাতে তারা সামাজিকভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল সামাজিক রীতির উদাহরণ হচ্ছে আতিথেয়তা বা মহত্ত্ব, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মুবাহ সামাজিক রীতি হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট বৈধ খাবারের প্রতি আগ্রহ। আর ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ সামাজিক রীতি হচ্ছে মেয়ের মতের তোয়াক্কা না করে বিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৯ঃ৭১

* যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রোগব্যাধি, অজ্ঞতা, প্রভৃতি থেকে মুক্ত করা নারীর দায়িত্ব।

# জি- ২৪ যৌনতার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

**প্রশ্ন ঃ**

১. এই বিষয়ের সাথে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব বিষয়ের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২. যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের সাধারণ নীতিমালা আলোচনা করুন।

৩. উপরে বর্ণিত ইসলামের যৌনতা বিষয়ক নীতিমালার পক্ষে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিন।

৪. যৌন বিষয়ে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ইসলামের মত কি?

৫. যৌন বাড়াবাড়ির পরিণতি কি?

৬. যৌনতা বিষয়ে ইসলামের পন্থা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

**উত্তর ঃ**

## ১. এই বিষয়ের সাথে ইসলামে পরিবারের গুরুত্বের সম্পর্ক

ইসলামে পরিবার হচ্ছে সমাজের এবং সমাজ কাঠামোর একক (cornerstone) এবং পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নারী। তিনি পরিবারের শৃঙ্খলা ও বন্ধন তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আর ইসলামী মতে পারিবারিক বন্ধনই হচ্ছে বৈধভাবে যৌনচাহিদা পূরণের একমাত্র সুযোগ।

## ২. যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের নীতি

যৌনতা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। ইসলামে মানুষের সব আচরণই আল্লাহর প্রতি ঈমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই যে মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ীত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত এবং আখেরাতের জবাবদিহি ও জীবন সম্পর্কে সজাগ তার প্রতিটা কর্মই হবে পরিমিত ও পরিশীলিত। এজন্য ইসলামী পন্থায় যে কোন অভ্যাস সম্পর্কে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আগে তার ঈমানকে মজবুত করতে হয়।

ইসলামী মতে মানুষের তিনটি চাহিদা আছে ঃ আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দৈহিক। এই তিনটি চাহিদা পূরণের ভারসাম্যপূর্ণ সুষম ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। আধ্যাত্মিক চাহিদার জন্য ইসলাম আল্লাহর স্মরণ এবং নামাজ সহ ধর্মীয় কাজে উৎসাহিত করে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য পৃথিবী ও বিশ্বজগতের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে উন্মুক্ত। দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য বাসস্থান ও যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের বৈধ পন্থা ইসলামে নির্দেশিত আছে। উপরন্তু ইসলাম যৌন চাহিদা পূরণকে আধ্যাত্মিক বিকাশের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে না যা কোন কোন ধর্মে মনে করা হয়।

## ৩. এই নীতিমালার পক্ষে কুরআন ও হাদিসের দলিল

কুরআন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং ভাল কাজ ও সঠিক আচরণের নির্দেশনায় ভরা। কুরআনের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় মানুষের তিন ধরনের চাহিদা আছে ঃ আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দৈহিক (উদ্ধৃতি সংযুক্ত)। কুরআন থেকে এটাও স্পষ্ট যে আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায় এসব চাহিদা পূরণ মানুষের জন্য বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'মানুষের চোখে আকর্ষণীয় সম্পদ হচ্ছে নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত রূপা' (৩ঃ১৪)। এখানে কুরআন এসব জাগতিক বিষয়ে আকর্ষণের জন্য মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করেনি; শুধু মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছে যে এসব যেন তাকে খোদার স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়। 'এই হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদ, কিন্তু খোদার নৈকট্য এর চেয়ে অনেক উত্তম পাওয়া'। সুতরাং ইসলাম নির্দেশ দেয় বস্তুগত চাহিদা অর্জনের প্রচেষ্টা ও পারলৌকিক জীবনের পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে। ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয় এবং পরিত্যাজ্য হচ্ছে অনৈতিক এবং অবৈধভাবে পার্থিব আনন্দে জড়িয়ে পড়া এবং প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া।

## ৪. যৌনতা বিষয়ে বাড়াবাড়ি

মানব সভ্যতায় এ ব্যাপারে দুই রকম বাড়াবাড়ি দেখা যায়। একটিতে যে কোন যৌন তৎপরতাকে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির পরিপন্থী এবং অশুভ অশুচি বলে ধরে নেয়া হয়, যার ফলশ্রুতিতে চিরকুমার, সংসারত্যাগী যাজক শ্রেণীর বিকাশ। এরা বিয়ে এবং যৌন সম্পর্ককে কোন নেয়ামত না মনে করে শয়তানের বাহন হিসেবেই মনে করে। এ ব্যাপারে আর এক রকম বাড়াবাড়ি হচ্ছে সব ধরনের নীতি নৈতিকতার বাধা সরিয়ে প্রবৃত্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া। প্রথম ধরনের বাড়াবাড়ি বিভিন্ন মানসিক বিকারের জন্ম দেয়। আর দ্বিতীয় ধরনের বাড়াবাড়ি সমাজে ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তির বিস্তৃতির (সাথে সাথে ভয়ংকর রোগের- অনুবাদক) বিস্তার ঘটায়। পরিবার ও মানবিক বন্ধনকে ধ্বংস করে দেয়। উভয় পন্থাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়। ইতিহাস থেকে এটাই শিক্ষণীয় যে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিৎ যাতে নৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যেই মানুষের যৌন চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকবে। যা ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে মুক্তি দেবে এবং পরিবারকে রক্ষা করবে।

## ৫. যৌন বিষয়ে বাড়াবাড়ির পরিণতি

অমুসলিমসহ অনেক পর্যবেক্ষকের মত হচ্ছে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা জন্ম দিয়েছে অসংখ্য অপরাধের। এই বাড়াবাড়ি ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি, চরিত্রহানি এবং মানবিকতাবোধ ধ্বংসের কারণ হয়েছে। (ইতিহাসে দেখা যায় বহু যুদ্ধে এক বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে ঐ বাহিনীর সৈনিকদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য)। যখন মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয় তখন তার মাঝের মানবিক শিষ্টাচার ধ্বংস হয়ে জন্ম নেয় স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদিতা, পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বহীনতা, মিথ্যাবাদিতা ও সার্বক্ষণিক নিজের বিবেকের সাথে দ্বন্দ্ব। এ থেকেই উদ্ভূত হয় ব্যভিচার, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, সমকামিতা, ইতরকামিতার মত

জঘন্যতা, যার ফলশ্রুতিতে শুধু ব্যক্তিজীবনই কলুষিত ও অশান্ত হয় না বরং গোটা সমাজ এবং বিশেষ করে পরিবার অধঃপাতে যায়।

## ৬. যৌনতার বিষয়ে ইসলামের সমাধান

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা রোধে এবং একে ধর্ম ও নৈতিকতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে ইসলাম বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। ইসলাম প্রথমত ব্যক্তির মধ্যে ঈমান ও খোদাভীতি জাগ্রত করে তাকে নিয়ত আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতিসম্পন্ন করেছে। যার ফলে সে যৌন বিষয়ক যে কোন লোভের কাছে নত হবে না। তারপর তাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সত্য-মিথ্যা, সঠিক-বেঠিক, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্যকে পৃথক করবার। তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে ইসলামে বিয়ে ভিন্ন আর কোন যৌন সম্পর্কের ব্যবস্থা নেই। ইসলামে সমকামিতা, ইতরকামিতা নিষিদ্ধ।

এরপর পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে বৈধভাবে যৌনতৃপ্তির সবচাইতে বাস্তব ব্যবস্থা ইসলাম নিয়েছে। কুরআন এবং হাদিস থেকে দেখা যায় যে–

ক. ইসলামী মতে পরিবার ও স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার;

খ. স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মাঝেও ইসলামে কিছু নিয়ম আছে যাতে কেউ স্বার্থপর হয়ে না উঠে;

গ. যারা বিয়েতে অসমর্থ তাদের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য রোযার বিধান রয়েছে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ১৮ঃ১০৭, ১৫ঃ২৯, ৩২ঃ৯, ৩৮ঃ৭২, ২ঃ৩১, ১৬ঃ৭৮, ৬ঃ২, ৩৮ঃ৭১, ৩ঃ১৪-১৫, ২৮ঃ৭৭

প্রশ্ন-৬ ঃ রাসূল (সঃ) নিম্নলিখিত হাদিসসমূহে ইসলামের সুস্থ যৌনাচার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

ক. আমি তোমাদের মাঝে সবচাইতে ধার্মিক এবং খোদাভীরু, তথাপি আমি নামাজ পড়ি এবং ঘুমাই, আমি রোযা রাখি এবং রোযা ভাঙ্গি আর আমি বিবাহিত জীবন যাপন করি। এবং তোমাদের মাঝে যে আমার পথ থেকে সরে যায় সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

খ. যে বিয়ে করেছে সে তার বিশ্বাস অর্ধেক পূর্ণ করেছে, এখন বাকী অর্ধেক বিশ্বাস পূরণে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হও।

গ. তিনি বলেন তিন ধরনের মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পায় ঃ জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় রত, আর যে ব্যক্তি চরিত্র রক্ষার জন্য বিয়ে করতে চায়। তিনি আরও বলেন স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পায়, কারণ তারা এই আনন্দ বৈধ ও হালাল পন্থায় করছে।

ঘ. রাসূল (সঃ) বলেন, মুসলিম পুরুষেরা যেন তাদের স্ত্রীদের কাছে পশুর মত না যায় বরং তার আগে একজন 'দূত' পাঠাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করল যে এই 'দূত' কি, তখন তিনি বললেন, ভালবাসার কথা অথবা আদরের চুম্বন। এছাড়া তিনি অন্তরঙ্গ মেলামেশার তথ্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

## জি- ২৫ বাগদান (Engagement) ও পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

**প্রশ্ন ঃ**

১. ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের অবস্থান অত্যন্ত উচ্চে। এর গুরুত্ব ও দর্শন কি?

২. জীবন সাথী নির্বাচনের জন্য ইসলাম কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখতে বলে?

৩. মেয়েদের পাত্র নির্বাচনের জন্যও কি একই বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত?

৪. ইসলামী আইনে মেয়েরা কি নিজেদের জন্য বর সন্ধান করতে পারে?

৫. ডেটিং ও অবাধ মেলামেশার অনুমতি না থাকায় ইসলামসম্মত পন্থায় যোগ্য জীবন সাথী নির্বাচন আদৌ সম্ভব কি?

**উত্তর ঃ**

### ১. ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব ও দর্শন

কুরআন বিয়েকে তিনটি প্রেক্ষিতে গুরুত্বের সাথে দেখে ঃ

ক. এটা সামগ্রিকভাবে মানব ঐক্য ও সংহতির প্রাথমিক উৎস;

খ. সমাজের একক পরিবার। পরিবারের সূচনা বিয়ের মাধ্যমে। আর বিবাহ বন্ধন হচ্ছে পৃথিবীতে মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখার একমাত্র বৈধ মাধ্যম;

গ. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে।

কুরআন বলে বিয়ে হচ্ছে আল্লাহর মহাজ্ঞানের এক নিদর্শন (Sign)। কারণ বিয়ে হচ্ছে মানবের প্রকৃতি এবং চাহিদার প্রতি আল্লাহর অনুমতি, স্বীকৃতি ও ভালবাসার প্রতীক। এই বক্তব্য অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বিয়েকে সম্মানিত করেছে যেখানে বিয়েকে পৃথিবীতে মানবের পতন এবং অব্যাহত পাপের প্রক্রিয়া হিসেবেই চিন্তা করা যায়।

বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনায় আযওয়াজ শব্দের ব্যবহার (৩০ঃ২১) লক্ষ্য করার মত, যার অর্থ স্বামী বা স্ত্রী (Spouse), যার মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে বিয়ে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক। কোন কোন ধর্মের মত এটা নয় এমন যে বিয়ে মানে পুরুষ তার যৌন সাথী খুঁজে নিচ্ছে। এর মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে মানবিক ও আধ্যাত্মিক সাম্যেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুরআনে আরও উল্লিখিত আছে যে, বিয়ে হচ্ছে প্রশান্তি, তৃপ্তি ও নিশ্চয়তার উৎস, যা স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, আকর্ষণ ও ভালবাসা থেকে আসে। ইসলামে মানব-মানবীর পারস্পরিক ভালবাসা বৈধ, অনুমোদিত, পবিত্র এবং আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্ত। আল্লাহ মানব-মানবীর এই ভালবাসাকে অনুমতি দেন ও বরকত দেন যতক্ষণ তা অনুমোদিত সীমার মধ্যে চর্চা হয়। বিয়ের পরিণতিতে যে গর্ভসঞ্চার হয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি কোন শাস্তি নয় বরং বিবাহিত দম্পতির আশা আনন্দের উৎস এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির পুরস্কার। সবশেষে বলতে হয় যে ইসলাম বৈরাগ্যকে বা চিরকৌমার্যকে অনুমোদন দেয়নি। আর অননুমোদিত বিষয়কে অনুমোদিত বানাবার চেষ্টা অপরাধ।

## ২. জীবন সাথী নির্বাচনে লক্ষণীয়

এ ব্যাপারে হাদিসে বিশেষ নির্দেশনা আছে। রাসূল (সঃ) বলেন বিয়েতে কারো পছন্দের ব্যাপারে মানুষ চারটি বিষয় দেখে, যথাঃ সম্পদ, আভিজাত্য, সৌন্দর্য এবং খোদাভীতি। এর মধ্যে ভাগ্যবান এবং শ্রেষ্ঠ সেই যে একজন ধার্মিক মেয়েকে বিয়ে করে। রাসূল (সঃ) মানুষকে আরও সতর্ক করে দেয় যে যদি তারা শুধুমাত্র সম্পদের আকর্ষণেই কাউকে বিয়ে করে তবে আল্লাহর রোষানলে পড়বে। অবশ্য এর মাধ্যমে রাসূল (সঃ) সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয়কে উপেক্ষা করতে বলেননি। বরং তিনি খোদাভীতি এবং সৎচরিত্রের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে এ দুটোই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তিনি আরও বলেছেন যে মুসলমানরা তাকেই বিয়ে করবে যে প্রেমময় ভালবাসার যোগ্য ও সন্তান ধারণক্ষম।

## ৩. মেয়েদের জন্য বর নির্বাচনের পূর্বশর্ত

সাধারণতঃ ছেলেরাই বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়, আর রাসূল (সঃ)-এর কাছে বিয়ে সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে মূলতঃ তারাই আসত। এজন্যে উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোতে পুরুষদের সম্বোধন করা হয়েছে। আসলে হাদিসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এছাড়াও কয়েকটি হাদিস আছে যাতে বিশেষভাবে মেয়েদের অথবা তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেন, "এমন লোকের কাছে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দেবে না যারা ভাল নয় বরং মন্দ, এমন যারাই করবে তারা পরিবারকে ধ্বংস করবে।" তিনি আরও বলেন, "যদি কেউ তোমার মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয় তবে তার কাছে মেয়ে বিয়ে দেবার পূর্বে তার চরিত্র এবং খোদাভীতি সম্পর্কে নিশ্চিত হও। যদি তোমরা এটা না কর তবে জমিনে অশান্তি সৃষ্টি হবে।"

সাধারণভাবে বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে- উভয়ের পূর্বশর্ত একই।

## ৪. মেয়েরা কি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারে?

কুরআন কিংবা হাদিসে এমন কোন নিষেধাজ্ঞা নেই যে মেয়েরা বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারবে না। বরং এমন কিছু উদাহরণ আছে তাতে বোঝা যায় মেয়েদের এমন প্রস্তাব পাঠাবার অনুমতি আছে। বিবি খাদিজা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর চরিত্রে, মাধুর্যে এবং সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর এক মহিলা সহযোগীর সাথে পরামর্শ করে রাসূল (সঃ)-কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রাসূল (সঃ)-এর জীবনে দেখা যায় একবার এক মহিলা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সরাসরি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। যদিও রাসূল (সঃ) সেই মহিলাকে বিয়ে করেননি, তবুও তিনি এমন কোন কথা বলেননি যে মেয়েরা এভাবে প্রস্তাব দিতে পারে না।

তবে সাধারণতঃ মেয়েরা পুরুষ পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেতেই সম্মানিত বোধ করেন।

### ৫. ডেটিং এবং অবাধ মেলামেশা ছাড়া জীবন সাথী নির্বাচন প্রসঙ্গে

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা ডেটিং সহ যে কোন ধরনের বিবাহপূর্ব অবাধ ও একান্ত মেলামেশায় নিষেধ করে। যারা বলে যে বিয়ের পূর্বে ডেটিং ও মেলামেশার মাধ্যমে পরস্পরকে পুরোপুরি জেনে বুঝে বিয়ে করলে এই বন্ধন দৃঢ় হয় তাদের জন্য শুধু এই যুক্তিই কি যথেষ্ট নয় যে যেসব দেশে এ সুযোগ অবারিত সেসব দেশে বিয়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে বর বা কনে বাজারের পণ্য নয় যে ব্যবহার করে, যাচাই বাছাই করে পছন্দ করতে হবে। বর বা কনে কারো জন্য এটা শোনা সুখবর হবে না যে তার সাথী বিয়ের আগে অন্য কারও সাথে ঘনিষ্ঠতা করেছে। যে সব মুসলমান বিয়ের আগে ছেলে-মেয়েকে পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও আলাপের সুযোগ দেয়না তারাও ভুল করেন। রাসূল (সঃ) কয়েক জায়গাতেই নারী পুরুষকে আদেশ দিয়েছেন বিয়ের আগে দেখে নিতে। কারণ তিনি বলেন এতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ তৈরী হয়। ইসলামে সম্ভাব্য বর কনের পরস্পরকে দেখার ও আলাপের অনুমতি আছে তবে তা একাকী বা নিভৃতে নয়, তৃতীয় ব্যক্তি বা পক্ষের উপস্থিতিতে।

### সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ২৫ঃ৫৪, ১৬ঃ৭২, ৭ঃ১৮৯, ৫ঃ৯০

প্রশ্ন-২ ঃ রাসূল (সঃ) বলেন, যে শুধুমাত্র মেয়ের সম্পদ দেখে বিয়ে করে আল্লাহ তার দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেবেন। যে শুধুমাত্র মেয়ের বংশ মর্যাদা দেখে বিয়ে করে আল্লাহ তাকে হেয় করবেন। আর যে এমন মেয়ে খুঁজে যে তাকে ভদ্রতা ও সচ্চরিত্র উপহার দেবে অথবা তার এবং তার আত্মীয়দের প্রতি দয়ালু হবে, আল্লাহ তাকে তার স্ত্রীর জন্য এবং তার স্ত্রীকে তার জন্য রহমত হিসেবে উপহার দেবেন।

রাসূল (সঃ) আরও বলেন, আল্লাহর আনুগত্যের পর নারীর সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তার স্বামীর প্রতি মমতাময়ী, সুন্দর এবং সহাস্য হওয়া। এবং স্বামীর যে কোন যৌক্তিক আদেশ মেনে নেয়া। এমন নারী স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পদের হেফাজত করে এবং তার সাথে করা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ২৪ঃ৩২

প্রশ্ন-৫ ঃ এটা বর্ণিত আছে যে রাসূলের সাহাবী মুগীরা ইবনে শোবা রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন যে তিনি বিয়ে করছেন, তখন রাসূল (সঃ) বলেন যে তার প্রতি অনুভূতি সৃষ্টির জন্য তাকে দেখ।

# জি- ২৬ বাগদান (Engagement) (চলমান)

**প্রশ্ন ঃ**

১. বাগদান এর সময় প্রস্তাবিত বর কনের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও আলাপের সময় উভয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতি প্রয়োজন কেন?
২. কারো বাগদত্তাকে তার পরিবারের অজ্ঞাতে দেখা যায় কি?
৩. বাগদানে কোন নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?
৪. বাগদান ভেঙ্গে গেলে বাগদানের সময় প্রদত্ত উপহার কি ফেরৎ দিতে হয়?
৫. মেয়ে কর্তৃক প্রদত্ত উপহারও কি বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে গেলে ফেরৎযোগ্য?
৬. আনুষ্ঠানিক উপহার প্রদান ছাড়া বাগদানে আর কোন আর্থিক দায়িত্ব আসে কি?
৭. বাগদানে পালনীয় আর কি মৌলিক দিক আছে?
৮. পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার (Compatibility) গুরুত্ব কি?
৯. কোন্ কোন্ মহিলাকে বিয়ে করা পুরুষের জন্য নিষেধ?

**উত্তর ঃ**

**১. প্রস্তাবিত বর কনের একান্ত ও নিভৃতে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করার কারণ**

বাগদান (engagement) বিয়ের প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া কিন্তু কোনভাবেই বিয়ের সমতূল্য নয়। বাগদানের পরিণতিতে বিয়ে নাও হতে পারে। এজন্যেই ভবিষ্যতে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের সুনাম, নির্মলতা ও সততার উপর যেন কোন প্রশ্ন না আসতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এজন্যই তাদের একান্ত সাক্ষাৎ নিষেধ। এছাড়াও কোন অসৎ লোক এই সুযোগের অপব্যবহার করতে পারে। বাগদানের নাম করে নিভৃতে কোন সরল মেয়েকে পেয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে পরে বাগদান ভেঙ্গে দিতে পারে। এজন্যে এই ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে।

সাধারণভাবে ইসলামে বিবাহিত বা নিকটাত্মীয় ব্যতিত কোন পুরুষ ও মহিলার একাকী অবস্থান নিষিদ্ধ।

**২. সম্ভাব্য কনেকে দেখার অনুমোদন**

রাসূল (সঃ)-এর সাহাবা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর বিয়ের পূর্বে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত স্ত্রীকে দেখতেন। বস্তুতঃ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তৈরির জন্য দেখার অনুমোদন ইসলামে আছে।

### ৩. বাগদানের আনুষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গে

বাগদান পালনের জন্য কোন নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা ইসলামে নেই। এটা একজন পুরুষ কর্তৃক একজন মহিলাকে দেয়া বিয়ের অঙ্গীকার (informal promise) যা সাধারণতঃ নিকটাত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে কিছু উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

### ৪. বাগদান ভেঙ্গে গেলে বাগদানের উপহার ফেরত প্রসঙ্গে

ইসলামে উপহার হিবা সম্পর্কে কিছু আইন আছে। ইসলাম মতে উপহার দুই ধরনের,

ক. অফেরৎযোগ্য নিঃশর্ত উপহার (যেমন- গরীব নিঃস্ব মানুষকে প্রদত্ত দান/উপহার)

খ. শর্তযুক্ত উপহার (যেমন, বাগদানের উপহার বিয়ের আশাতেই দেয়া হয়)। এই দ্বিতীয় ধরণের উপহারের ক্ষেত্রে আইনবিদরা বলেন যে, যদি মেয়ে পক্ষ থেকে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং উপহার ফেরৎযোগ্য অবস্থায় থাকে তবে তা ফেরৎ দিতে হবে। যদি উপহার ফেরৎযোগ্য অবস্থায় না থাকে (যেমন, ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া অথবা বিক্রি করে দেয়া) তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর বিয়ে যদি ছেলেপক্ষ থেকে ভাঙ্গা হয় তবে মালিকী মতে উপহার ফেরত দিতে হবে না। হানাফী এবং অন্যান্য মতে উপহার ফেরতযোগ্য অবস্থায় থাকলে ফেরত দিতে হবে।

### ৫. মেয়ে পক্ষ প্রদত্ত বাগদানের উপহার প্রসঙ্গে

যদি মেয়ে পক্ষ ছেলেকে বাগদানে কোন উপহার দেয় তবে বিয়ে ভেঙ্গে গেলে উপরে বর্ণিত আইন তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

### ৬. বাগদানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য আর্থিক দায়িত্ব

বাগদান হচ্ছে বিয়ের অঙ্গীকার যার সাথে যুক্ত আছে নৈতিক দায়িত্ব যে কোন সংগত কারণ ছাড়া কোন পক্ষ এই অঙ্গীকার থেকে সরবে না। এই নৈতিক দায়িত্ব ছাড়া কোন আর্থিক দায়িত্ব বাগদানের মাধ্যমে কারো উপর বর্তায় না।

তবে যদি বাগদানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কোন চাকুরীরত মেয়ে তার প্রস্তাবিত স্বামীর পরামর্শে চাকুরী ছেড়ে দেয় এবং এ অবস্থায় বিয়ে ভেঙ্গে যায় তবে সেই মেয়েকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রস্তাবিত মোহরানার অর্ধেক হবে। ডঃ সাবুনী এ কথা বলেন।

### ৭. বাগদানে পালনীয় মৌলিক বিধান

ক. রাসূল (সঃ) বলেন যে, কোন পুরুষ অপর পুরুষের বাগদত্তার সাথে বাগদান করতে পারবে না। এটা শুধু ভদ্রতার ব্যাপারই নয় বরং উভয় পরিবারের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি প্রতিহত করে।

খ. একই আইন মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন মহিলা অপর মহিলার সাথে বাগদানে আবদ্ধ পুরুষের সাথে বিয়ের আলোচনা করতে পারবে না।

গ. কোন পুরুষ কোন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে তার ইদ্দত কাল পুরো না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের আলাপ করতে পারবে না। তালাকের পর তিনমাস অপেক্ষা করতে হবে কারণ এই সময়ের মধ্যে তালাকপ্রাপ্ত স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনও হতে পারে।

ঘ. কোন মহিলা বিধবা হবার পর একশ ত্রিশ দিন পার হবার আগে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে না। তবে এক্ষেত্রে অথবা সদ্য তালাকপ্রাপ্তা এবং ইদ্দতকালীন সময়ে সম্ভাব্য বিয়ের বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়া যেতে পারে, যা তা'রিদ নামে পরিচিত।

ঙ. বাগদান প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্বে সম্ভাব্য পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যত (Compatibility) যাচাই করে নেয়া উচিৎ।

চ. কুরআনে নিষিদ্ধ মহিলাদের সাথে বাগদান নিষিদ্ধ।

## ৮. পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার গুরুত্ব ঃ

রাসূল (সঃ) বলেন, "একজন মহিলার তার জন্য উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পুরুষকেই বিয়ে করা উচিৎ"। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, একজন পুরুষ আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় নারীর সমপর্যায়ের হবেন। অবশ্য কুরআনে এর চাইতে উত্তম ব্যাখ্যা আছে যার অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষের মধ্যে বিয়ের সফলতার ব্যাপারে যৌক্তিক অঙ্গীকার থাকলে উভয়েই উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য। কুরআন বলে প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রত্যেক বিশ্বাসীর সমপর্যায়ের, এবং গ্রহণযোগ্যতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হচ্ছে খোদাভীতি। রাসূল (সঃ) নিজের তত্ত্বাবধানে এমন অনেক বিয়ে দিয়েছেন যাতে আর্থিক বা সামাজিক সামঞ্জস্য ছিল না। তাহলে এটা নিশ্চিত হয় যে ঈমান ছাড়া বাকী সব সামঞ্জস্যতার প্রশ্ন কোন বাধ্যবাধকতা নয়। অবশ্য তাই বলে অন্যান্য বিষয়গুলো উপেক্ষারও নয়। এবং এটা সুস্পষ্ট যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্তর বছরের বৃদ্ধের সাথে নিশ্চয়ই ২০ বছরের তরুণীর বিয়ে মানানসই হবে না; এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বড় ব্যবধান দু'ব্যক্তির সামঞ্জস্যহীনতা প্রদর্শন করতে পারে।

## ৯. যেসব মহিলা (এবং পুরুষ)-কে বিয়ে নিষেধ

### স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঃ

স্থায়ীভাবে নিম্নবর্ণিত মহিলাদের বিয়ে হারাম ঃ

ক. রক্ত সম্পর্কে উপরের (যেমন, মা, খালা, ফুফু), এবং নীচের (যেমন, কন্যা বা নাতনী), আত্মীয় এবং পিতা মাতার রক্তসম্পর্কিতরা।

খ. বিয়ের মাধ্যমে সম্পৃক্ত আত্মীয়, যেমন- শাশুড়ী, স্ত্রীর পূর্বে পক্ষের কন্যা, পিতার বা পুত্রের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী।

গ. দুধমাতা এবং তার সূত্রে সম্পৃক্ত মেয়েরা (দুধমাতার কন্যা, বোন, মাতা ইত্যাদি)। রাসূল (সঃ) বলেন, 'রক্তের সম্পর্কের কারণে যারা নিষিদ্ধ, একই বক্তব্য দুধমাতার সম্পর্কে।"

**অস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঃ** যে কোন অবিশ্বাসী বা বিশ্বাসহারা মহিলাকে এবং ইদ্দতকালীন যে কোন মহিলাকে বিয়ে নিষেধ। অবশ্য অবিশ্বাসী মহিলা ঈমান আনলে তাকে বিয়ে করা যাবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ রাসূল (সঃ) বলেন, "কোন অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা একসাথে থাকলে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান।"

প্রশ্ন-৭ ঃ তা'রিদ (Ta'arid)-এর উদাহরণ হচ্ছে কোন সদ্যবিধবা অথবা ইদ্দতকালীন মহিলার এ আশা ব্যক্ত করা, "আমি খুব শীঘ্রই বিয়ের আশা করছি" অথবা তাকে এভাবে প্রস্তাব করা যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাকে তোমার মত ধার্মিক স্ত্রী উপহার দেন।

প্রশ্ন-৮ ঃ আল কুরআন ৪৯ঃ১০, ৪৯ঃ১৩, ২ঃ২২১

# জি- ২৭ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন- ১
## (নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ)

**প্রশ্ন ঃ**

১. কয়েক ধরনের মহিলাকে বিয়ে হারাম ঘোষণার কারণ কি?

২. এছাড়া বিয়ে সংক্রান্ত আর কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

৩. ব্যভিচারী তওবা করলে তার ক্ষমার কোন সুযোগ আছে কি?

৪. স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে তাদের সম্পর্ক কি ভেঙ্গে যায়?

৫. অমুসলিমকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়?

৬. কোন মুসলিম ছেলে কি আহলে কিতাব (ইহুদী, খ্রীস্টান) মেয়েকে বিয়ে করতে পারে?

৭. অনেকে বলেন যে যেহেতু খৃষ্টানরাও আল্লাহর সাথে শরীক করে, সেহেতু তাদের আহলে কিতাব ধরা যায় না- এ ব্যাপারে কি বলবেন?

৮. আহলে কিতাব থেকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কি সতর্কতা নিতে হবে?

**উত্তর ঃ**

### ১. মুসলিম বিয়ে আইনে কয়েক ধরনের মহিলাকে বিয়ে হারাম কেন?

যাদের বিয়ে করা হারাম তাদের তালিকা কুরআনে ৪ নং সূরার ২২ থেকে ২৪ আয়াতে বিস্তারিত দেয়া হয়েছে। এই নিষিদ্ধ হবার পেছনে নিম্নলিখিত যুক্তি দেয়া যায় ঃ

ক. মৃত পিতার বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে নিষিদ্ধ করে প্রাক ইসলামী যুগের আরবদেশের প্রচলিত এক জঘন্য প্রথাকে বাতিল করা হয়। সেযুগে পিতার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা পিতার অন্যান্য সম্পদের সাথে তার বিধবা স্ত্রীদেরও মালিক হয়ে যেত। ইসলাম মাতৃতুল্য এই মহিলাদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে তাদের মায়ের মর্যাদাকেই তুলে ধরেছে। ইসলাম আরও নিশ্চিত করেছে যে নারী সম্পত্তির মত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার বিষয় হতে পারে না। উপরন্তু, ঐ নারী তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভাগ পাবে। বস্তুতঃ সৎমাকে ইসলাম মায়ের আসনেই নিয়ে এসেছে।

খ. পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতাতেই মা, কন্যা, ও বোনকে বিয়ে নিষিদ্ধ, কারণ তাদের প্রতি ভালবাসা, সম্মান যৌনতার উর্ধ্বে।

গ. খালা ও ফুফুরাও মায়ের মতই এবং ভাগ্নী, ভাইঝিরাও কন্যার মত, তাই তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ।

এই সব মহিলারাই 'মাহরিম' যাদের বিয়ে করা হারাম। একইভাবে মহিলাদের জন্যও তাদের ঐরকম সম্পর্কীয়রা মাহরিম। নিকটাত্মীয়দের বিয়ে হারাম করে ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে সমাজে মানুষের আত্মীয়তাকে বিস্তৃত করতে চায়। আধুনিক বিজ্ঞান মতেও দেখা যায় যে, আত্মীয়দের মাঝে বিয়ে হলে সন্তানদের মধ্যে জন্মগত ও জীনবাহিত (Genetic) রোগের পরিমাণ বেড়ে যায়।

এছাড়াও মুসলিমদের বিয়ে নিষিদ্ধ তালিকা হচ্ছে ঃ

ঘ. দুধমাতা, ঐ দুধমাতার অন্যান্য দুধসন্তানেরা (কারণ তারা তার বোন / ভাই), অথবা দুধমাতার বোন- কারণ এসব বোনেরা ছেলের খালা হয়ে যায়।

ঙ. ঐ ব্যক্তির পুত্রবধূ, কারণ ইসলামে সে কন্যার সমতুল্যা।

চ. দু'বোন একই সময়ে এক পুরুষের স্ত্রী হতে পারবেনা। কেননা, এক্ষেত্রে বোনদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত, পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতাশূন্য ও অবিশ্বাসপূর্ণ হবে।

ছ. এবং বর্তমানে বিবাহিত (অর্থাৎ অন্যের স্ত্রী)-কে বিয়ে করা যাবে না।

## ২. আর কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ব্যভিচারের অপরাধী তারা সৎ এবং নির্মল কাউকে বিয়ে করার অধিকার রাখে না। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ নিম্নরূপ ঃ

ক. ইসলামের নৈতিক শিক্ষা যেকোন রকম অবৈধ যৌনাচারকে নিষেধ করে। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ব্যভিচারী অসৎদের এটাই বোঝানো হয়েছে যে তাদের জন্য কোন পুরস্কার নেই। বরং সৎ চরিত্রবানদের জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

খ. এই কঠোর ব্যবস্থা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে নিবারক (Deterrant)-এর কাজ করবে।

গ. ইসলাম মতে বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রশান্তি এবং বন্ধুত্ব। কাজেই একজন সৎচরিত্রবান খোদাভীরু নারী বা পুরুষ প্রশান্তি পাবেন না যদি তার সাথী দুশ্চরিত্রের হয়। ইসলাম এটা নিশ্চিত করেছে যে এক্ষেত্রে সমকক্ষ নয় এমন দু'জনের বিয়ে সফল হবে না।

ঘ. ব্যভিচারীর সাথে চরিত্রবানের বিয়েতে বিভিন্ন যৌন রোগের বিস্তারের সম্ভাবনাও থাকে যা এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

## ৩. ব্যভিচারকারীর তওবা প্রসঙ্গে

ইসলামে আন্তরিক তওবার জন্য তিনটি শর্ত জরুরী ঃ ক. অপরাধের তাৎক্ষণিক অবসান; খ. অপরাধীর তীব্র অনুশোচনা বোধ; এবং গ. ভবিষ্যতে আর একই অপরাধ না করার

দৃঢ় সংকল্প। এভাবে যদি আন্তরিকতার সাথে তওবা করা হয়, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমার সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সে সৎ চরিত্রবান মানুষের সাথে বিয়ের অধিকার পাবে কিনা তা কুরআনে স্পষ্ট করে বলা নেই। আইনবিদরা মনে করে যেহেতু তওবার মাধ্যমে বড় অপরাধের ক্ষমার সুযোগ রয়েছে সেহেতু ব্যভিচারীও এই সুযোগ পেতে পারেন। তবে তওবাকারী যদি মহিলা হয় এবং তাকে কোন পুরুষ বিয়ে করতে চায় তবে আইনবিদরা বলেন তিনমাস অপেক্ষা করে তার গর্ভাবস্থা নিশ্চিত করতে। যদি গর্ভবতী হয় তবে তার সন্তানের জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

## ৪. স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে

স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ আনলে ইসলামের শিক্ষা কি তা জি- ১৩ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দুই পক্ষই পাঁচবার কসম খেলে কারোরই শাস্তি হবে না তবে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। ইসলামী আইনে স্বামী এবং স্ত্রীর স্থায়ীভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

## ৫. অমুসলিম/ ভিন্নধর্মাবলম্বীকে বিয়ে প্রসঙ্গে

ইসলামী আইনে মুশরিক, নাস্তিক (খাঁটি মার্ক্সবাদীরাও) এবং যারা রাসূল (সঃ)-এর খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসী নয় তাদের বিয়ে করা হারাম।

## ৬.আহলে কিতাবকে বিয়ে প্রসঙ্গে

কুরআন মুসলিম পুরুষদের আহলে কিতাবের সতী মেয়ে বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। আহলে কিতাব বলতে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বোঝায়। তবে কোন কোন আইনবিদ এদের ছাড়াও যারা আন্তরিকভাবে এক আল্লাহ, রাসূলদের এবং কিতাবে বিশ্বাস করে তাদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশ্য এই ছাড় তাদের প্রতি সহনশীলতা ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের একটা সুযোগ মাত্র, কোন নির্দেশনা নয়।

## ৭. যারা খ্রীস্টানদের আহলে কিতাব বলে স্বীকার করতে চান না কারণ তারা খোদার সাথে শরীক করে প্রসঙ্গে

রাসূল (সঃ)-এর সময়েই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবা অভিযোগ করেন যে সেই সময়কার খ্রীস্টানরা যেহেতু যীশুকে খোদার পুত্র মনে করে সেহেতু তারাও মুশরিক। এতদসত্ত্বেও কুরআনে কাফেরদের কথা একভাবে এবং ইহুদী খ্রীষ্টানদের কথা অন্যভাবে বলা হয়েছে। ইহুদী খ্রীষ্টানদের 'আহলে কিতাবের' মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাবদের সতী নারীকে বিয়ের অনুমতি কুরআনে দেবার পরও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রমুখ একে নিরুৎসাহিত করতেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে অন্য মুসলিম পুরুষদের বলতেন।

## ৮. আহলে কিতাবীদের সতী নারীকে বিয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী আইনবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার 'ফতওয়া মুয়াসিরা'-তে বলেন আহলে কিতাবী মেয়ে বিয়ের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে–

ক. ইহুদী বা খ্রীষ্টান মেয়ে 'স্বধর্মে ধার্মিক' হতে হবে; নিছক জন্মসূত্রে আহলে কিতাবী, বাস্তবে অধার্মিক হলে চলবে না।

খ. প্রস্তাবিত মেয়েকে সতী হতে হবে। মুসলমানরা ভাল করে খোঁজ নেয় যেন সেই মেয়ের নৈতিক মান ইসলামী নৈতিক মানে মানোত্তীর্ণ হয়। যেমন, অবিবাহিত মেয়ে হলে সে যেন কুমারী (Virgin) হয়।

গ. প্রস্তাবিত মেয়ে যেন এমন জাতির না হয় যারা সক্রিয়ভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত কেননা কুরআন এসব মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করতে সতর্ক করেছে।

ঘ. নিজের বা অন্য মুসলিমদের উপর যেন কোন নেতিবাচক পরিণতি না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

**এমন বিয়ের সম্ভাব্য কিছু ক্ষতিকর দিক ঃ**

ক. মুসলিম মেয়েরা যারা শুধু মুসলিম ছেলেকেই বিয়ে করতে পারে তারা যখন দেখবে মুসলিম ছেলেরা অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করছে তখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

খ. পরিবারের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে, বিশেষতঃ যখন পিতা ছেলেমেয়েদের ইসলামী কায়দায় বড় করতে চাইবে আর মা ভিন্ন ধারায় বড় করতে চাইবে।

এধরনের বা অন্য রকমের নেতিবাচক ফলাফলের আশংকা থাকলে এমন বিয়ে করা বৈধ নয়, বিশেষভাবে এমন সমাজে যা এমনিতেই ইসলাম বিরোধী।

**সূত্র নির্দেশিকা ঃ**

প্রশ্ন-১ ঃ আত্মীয়দের মাঝে বিয়ের ফলে জীনবাহিত রোগের আধিপত্যের কথা বিবেচনা করে সমকালের প্রখ্যাত মুসলিম আইনবিদ আল গাযালী কাজিন (Cousin) দের মাঝে বিয়ে না করতে বলেছেন, যদিও কুরআনে তা নিষেধ করেনি।

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ২৪ঃ৩, ৫ঃ৬, ৪ঃ২৫, ২৪ঃ২৬

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ২৪ঃ৩, ২৫ঃ৬৮-৭০,

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ২ঃ২২১, ৬০ঃ১০

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৫ঃ৬

প্রশ্ন-৭ ঃ আল কুরআন ২২ঃ১৭, ৯৮ঃ১

প্রশ্ন-৮ ঃ আল কুরআন ৬০ঃ৮-৯, ৫৮ঃ২২

# জি- ২৮ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন- ২
## (বিয়ের বৈধতা)

**প্রশ্ন ঃ**

১. অমুসলিম পুরুষকে মুসলিম নারী বিয়ে করতে পারবে না কুরআনে এমন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

২. মুসলিম মেয়ে আহলে কিতাব পুরুষকে বিয়ে করতে পারবেনা কেন?

৩. যারা বলে মুসলিম ছেলে আহলে কিতাবী মেয়ে বিয়ে করলেও সন্তান লালন পালন-এর ক্ষেত্রে একই সমস্যা হতে পারে, তাদের যুক্তির জবাবে কি বলবেন?

৪. যদি একটি অমুসলিম দম্পত্তির একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কি হবে?

৫. মুসলিম বিয়ে চুক্তি কি Sacred অথবা Civil?

৬. বিয়ে চুক্তির বৈধতার শর্ত কি কি?

৭. এর বাইরে আর কোন শর্ত আছে কি?

৮. অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন মুসলিম মেয়ে বিয়ে করতে পারে কি? যদি পারে, তাহলে এর স্বপক্ষে প্রমাণ কি?

**উত্তর ঃ**

### ১. মুসলিম মেয়ের অমুসলিম পুরুষ বিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে

কুরআন স্পষ্টভাবে মুসলিম মেয়েদের অমুসলিম পুরুষ বিয়ে নিষেধ করেছে। এই আয়াত কুরআনে তখন নাযিল হয় যখন মক্কা থেকে অমুসলিম স্বামী/পিতার ঘর ছেড়ে আসা মুসলিম মেয়ের স্রোতে মদীনা ভরে গিয়েছিল। ৬০ নং সূরার ১০ নং আয়াতে রাসূল (সঃ)-কে বলা হয় যে, যে মেয়েরা শুধুমাত্র আল্লাহর পথে হিজরত করেছে তাদের অবিশ্বাসীদের কাছে যেন ঠেলে দেয়া না হয়। সেই থেকে মুসলিম মেয়েদের অমুসলিমের সাথে বিয়ে নিষেধ; সেই সাথে আহলে কিতাবের সাথেও মুসলিম মেয়েদের বিয়ে বারণ। কারণ ৫ নং সূরার ৬ নং আয়াতে শুধুমাত্র আহলে কিতাব চরিত্রবান মেয়েদের মুসলিম পুরুষের বৈধ বলা হয়েছে, আহলে কিতাব চরিত্রবান পুরুষদের জন্যে নয়।

### ২. আহলে কিতাবের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ হবার কারণ

প্রথমত এই নিষেধাজ্ঞা কোন মানুষ আরোপিত নয়। এটা সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার, যিনি তার আদেশ নিষেধের মাধ্যমে মানব-মানবীর কল্যাণ করেন। এর সম্ভাব্য কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সাধারণতঃ স্বামীই পরিবারের প্রধান এবং পরিচালক থাকেন। সেক্ষেত্রে একজন আহলে কিতাব স্বামীর পরিচালনায় একজন মুসলিম মেয়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম স্বামীর কাছে আহলে কিতাব

মেয়ে নিরাপদ। কারণ তার ধর্মগ্রন্থ, তার নবী-রাসূলদের প্রতি মুসলিম স্বামীরও স্বীকৃতি থাকে এবং তার ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সে সজাগ থাকে, প্রভৃতি। অমুসলিম স্বামীর ক্ষেত্রে এসবই অনুপস্থিত থাকতে পারে। ইসলাম শুধু একটি বিশ্বাসই নয় পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অমুসলিম স্বামীর সংসারে ইসলামী জীবন পরিচালনায় মুসলিম মেয়ে ব্যর্থ হবারই কথা।

## ৩. যারা বলে যে মুসলিম পুরুষের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হতে পারে

মুসলিম ছেলে আহলে কিতাব মেয়ে বিয়ে করলে তারও নিজের বিশ্বাস বজায় রাখা ও ছেলেমেয়েকে ইসলামী কায়দায় বড় করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে- এই সত্য ইসলামও স্বীকার করে। সেজন্যেই এমন শংকা থাকলে এ ধরনের বিয়ে ইসলাম নিষেধ করে। বস্তুতঃ ইসলামে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক পার্টনারশীপ, যা শুধুমাত্র মোমেন-মোমেনার মধ্যেই সফলভাবে সম্ভব। ইসলামের এ অনুমোদন কেবল আহলে কিতাবধারীদের প্রতি সহনশীলতা (tolerance) ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনস্বরূপ (goodwill)। কিন্তু এ সুযোগ শর্তমুক্ত নয়। যেখানে অশুভ সম্ভাবনা নেই এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত ভাল এমন ক্ষেত্রেই ইসলাম আহলে কিতাব বিয়ে অনুমোদন করে। আর শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত বিষয় শর্ত ভংগের সম্ভাবনা থাকলে অননুমোদিত (হারাম) হয়ে যায়। এবং এরকম শর্তযুক্ত বিয়ের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে।

## ৪. অমুসলিম দম্পত্তির মধ্যে একজন ইসলাম গ্রহণ করলে

অমুসলিম দম্পত্তির মাঝে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্ত্রী অমুসলিম (আহলে কিতাব) থাকতে চাইলে অসুবিধে নেই। কিন্তু স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে এবং স্বামী ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। কারণ ইসলাম অমুসলিমের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ের অনুমতি দেয় না। অবশ্য এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে ভাঙার প্রয়োজন নেই, বরং তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সময় অপেক্ষা করবে যার মধ্যে স্বামীকে পরিবার অটুট রাখতে ইসলাম গ্রহণে সময় দেয়া হবে (ঐ সময় স্বামী স্ত্রীর মাঝে কোন দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না)। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে স্বামী মুসলমান না হলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। আজকাল পশ্চিমা জগতে অনেক নওমুসলিম মেয়েই এই সমস্যায় পড়ছে এবং সেই প্রথম যুগের মুসলিম মেয়েদের মতই দৃঢ়ভাবে ঈমানের পরীক্ষায় জয়ী হচ্ছে।

## ৫. ইসলামের বিয়ে চুক্তি Sacred অথবা Civil

ইসলামী আইনে বিয়ে কোন Sacred এবং Mundane অথবা Civil এবং Religious-এই পার্থক্য নেই। সেজন্যে কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পরিচালনায় এই বিয়ে সম্পন্ন হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। খ্রীষ্টানদের মত ইসলামে কোন যাজক নেই। যে কোন মুসলমান নামাজ পড়াতে ও বিয়ে পড়াতে পারেন। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে ইমাম সাহেব দিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়। তবুও এটা কোন বাধ্যবাধকতা নয়। মুসলিম

বিয়ে এই অর্থে Sacred (পবিত্র) যে এটা আধ্যাত্মিক আইনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ঃ এটা দুজন মানুষের পবিত্র বন্ধন ও চুক্তি।

### ৬. বিয়ে চুক্তি বৈধতার শর্ত ঃ

ক. বর কনে উভয়ের সজ্ঞান ও স্পষ্টভাবে সম্মতি।

খ. দু'জন আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন (মুসলিম) সাক্ষী। যদি কনে আহলে কিতাব হয়, তবে একজন সাক্ষী তার পক্ষের হতে পারবে বলে ইমাম আবু হানিফা বলেন।

গ. বর কনে অবশ্যই বিয়ে নিষিদ্ধ (মাহরিম) সম্পর্কের হবে না।

### ৭. আরও যে সব শর্ত প্রযোজ্য ঃ

ঘ. যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বিয়ে হয় (যা কদাচিৎ দৃষ্ট) তবে তার অভিভাবকের নির্দিষ্ট সম্মতি, অথবা অভিভাবক না থাকলে মুসলিম বিচারকের সম্মতি।

ঙ. কোন পক্ষ থেকে রোগ, অক্ষমতা বিষয়ে বা অন্য যে কোন বিষয়ে কোন সত্য গোপন করা বা কোন মিথ্যা তথ্য দেয়া যাবে না। কাবিনে এমন শর্ত যুক্ত থাকতে পারে যে এমন কোন তথ্য গোপন করলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

চ. অভিভাবকের অসম্মতিতে কোন মেয়ে নিজ দায়িত্বে বিয়ে করলে, তার অভিভাবক মেয়ের মঙ্গলার্থে আদালতে এই বিয়ে বাতিলের আবেদন জানাতে পারে। যেমন, আবেগবশত কোন মেয়ে এমন কাউকে বিয়ে করে বসতে পারে যে ড্রাগ আসক্ত। এমন ক্ষেত্রে কনের সর্বোচ্চ স্বার্থে পিতা বিয়ে রদ করার আবেদন করতে পারে।

### ৮. মুসলিম মেয়ের পিতার অমতে বিয়ে প্রসঙ্গে

ইমাম আবু হানিফাসহ একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, মুসলিম মেয়ে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এর বিরুদ্ধে বলেন। তারা রাসূলের (সাঃ) একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেন যেখানে তিনি বলেন যে মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়ে বাতিল। আর এর বিপক্ষের বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেন যে, কুরআনের আয়াতে দেখা যায় যে বিয়ে মেয়ের হাতে। আর যেহেতু মেয়েরা আর্থিক চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তি করার অধিকার রাখে, সেহেতু তারা বিয়েরও অধিকার রাখে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ৬০ঃ১০, ৫ঃ৬

প্রশ্ন-৬ ঃ বিয়েতে মত দেবার একটি প্রচলিত নমুনা হচ্ছে,

মেয়ের পিতা বা উকিল ঃ "আমি আপনার কাছে আমার কন্যা (নাম) কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের মাঝে সম্মত মোহরানার শর্তে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বিয়ে দিচ্ছি।"

বর অথবা তার অভিভাবক ঃ আমি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সম্মত মোহরানার শর্তে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করছি।

প্রশ্ন-৮ ঃ আল কুরআন ২৪ঃ৩২, ২ঃ২৩২ রাসূল (সাঃ) বলেন, ".... যদি কোন নারী তার অভিভাবকের অসম্মতিতে বিয়ে করে, তবে তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে।"

# জি- ২৯ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন- ৩
## (বিয়ে চুক্তি)

**প্রশ্ন ঃ**

১. প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার বিয়েতে অভিভাবকের ভূমিকা কি?

২. যেহেতু ইসলামে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত নেই, সেহেতু ইসলামে কি বাল্য বিবাহের অনুমতি আছে?

৩. একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে পছন্দ করা বা সম্মতি দেয়ার অধিকার মুসলিম নারীকে ইসলাম দেয় কি? এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে এ অধিকারের প্রয়োগ কেমন?

৪. বিয়েতে প্রদত্ত উপহার কি যৌতুকের মত?

৫. মেয়ের প্রাপ্ত মোহরানা কি তার জন্য ফার্নিচার কেনার বা অন্য কাজে তার পরিবার ব্যয় করতে পারে?

৬. মোহরানার সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সীমা ধার্য করা যায় কি?

**উত্তর ঃ**

### ১. প্রাপ্ত বয়স্কার বিয়েতে অভিভাবকের ভূমিকা

এব্যাপারে দু'টো মত রয়েছে। যারা মনে করেন মেয়ের বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি অত্যাবশ্যক তারা এ ব্যাপারে তিনটি যুক্তি দেখান ঃ

ক. কুরআনে যেখানে মেয়েদের বিয়ের কথা বলা হয়েছে তাতে তাদের অভিভাবককে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে মনে হয় মেয়ের বিয়ে অভিভাবকের মধ্যস্থতাতেই হতে হবে।

খ. রাসূলের একটি হাদিসে দেখা যায় যে তিনি বলেছেন বিয়েতে মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি না থাকলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

গ. মেয়ের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই বিয়ে চুক্তিতে এমন প্রিয় কারো পরামর্শ নেয়া উচিত, যারা তাকে অত্যন্ত ভালবাসে, যেমন- মা-বাবা/ অভিভাবক।

যারা বলেন মেয়ের বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি অত্যাবশ্যক না তারা যুক্তি দেখান যে ঃ

ক. কুরআনে সূরা বাকারায় ২৩০ এবং ২৩২ নং আয়াতে বিয়ের আলোচনায় মেয়েদের সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে।

খ. ইসলামী আইন মেয়েদের আর্থিক চুক্তিসহ অন্যান্য সিভিল চুক্তি স্বাক্ষর করার অধিকার দিয়েছে। সেহেতু তাদের বিয়েতেও স্বেচ্ছায় অগ্রসর হবার অধিকার আছে।

গ. তারা বলেন, রাসূল (সঃ)-এর অভিভাবকের মত সংক্রান্ত হাদিস কেবল অপ্রাপ্তবয়স্কার মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ ভিন্ন দু'টি মতের প্রতি কারো দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক না কেন, সাধারণভাবে মুসলিম মেয়েরা এটা পছন্দ করে যে তাদের অভিভাবক তাদের স্বামীর হাতে তুলে দেবেন এবং তাদের হয়ে সম্মতি দেবেন।

## ২. অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিয়ে প্রসঙ্গে

কুরআন এবং সুন্নাহ্য় বিয়ের কোন বয়সসীমা নির্ধারিত নেই। এর কারণ কুরআন কালোত্তীর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এখানে সব জাতির, সব কালের, সব স্থানের, সব মানুষের জন্যই কল্যাণকর বিধান রয়েছে। (বয়স সীমা নির্ধারিত থাকলে অনেক সমাজের জন্যই তা অসুবিধেজনক হত।- অনুবাদক)

আলোচনার স্বার্থে কয়েকটি শব্দের পৃথক অর্থ বোঝা প্রয়োজন- বাল্য বিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ এবং Consummation of Marriage। সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, বাল্য বিবাহের প্রচলন ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেও ছিল, পরেও আছে; কিন্তু এর মানে এটা ছিল না যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সাথে সাথে শুরু হত। এ বিয়ে চুক্তির কারণ ছিল দুটি সমাজ ও পরিবারের মধ্যে বড় মিল ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির এক প্রতিশ্রুতি। আগে থেকে প্রচলিত এ ব্যবস্থাকে ইসলাম কতগুলো শর্ত প্রয়োগ করে বাস্তবতার কাছে নিয়ে এসেছে। এই শর্তগুলো হল ঃ

ক. অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের (বা একজন বিচারকের) পূর্ব সম্মতি আবশ্যক।

খ. বিয়ের পর মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত Consummation of Marriage (স্বামী-স্ত্রীর মিলন) হবে না।

গ. মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হবার পর স্বামীর সাথে মিলিত হবার আগেই বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত দিতে পারবে। যদি তার মত নাবাচক হয় তবে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। ইসলামে এটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি যে, মেয়েদের বিয়েতে তাদের মত দেয়ার স্বাধীনতা আছে।

## ৩. বিয়েতে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দের অধিকার ও মুসলিম সমাজে এর স্বীকৃতি

কুরআন এবং সুন্নাহ্য় বিবৃত ইসলামে বিয়েতে মেয়ের সম্মতির ও বর পছন্দের অধিকার সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু মুসলিম সমাজে এ অধিকার চালু রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশে এ জাতিতে বিভিন্ন অনীহা বিরাজমান। অবস্থা ভেদে 'A' থেকে 'F' মান পর্যন্ত grade-এ ভাগ করা যায়! এটা নির্ভর করে মুসলমানরা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান কতটা রাখে ও কতটা পালন করে। যখন কুরআন বিয়েকে আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক

পার্টনারশীপ হিসেবে বর্ণনা করে তখন এটা স্পষ্ট যে দুই পক্ষের সানন্দ সম্মতি ছাড়া এটা সফল হতে পারেনা। হাদিসে একাধিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাসূল (সঃ)-এর কাছে মহিলারা যখন এই অভিযোগ নিয়ে আসেন যে বিয়েতে তাদের সম্মতি ছিলনা, তখন রাসূল (সঃ) বিয়ে বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

## ৪. বিয়ের উপহার ও যৌতুক-এর পার্থক্য

ইসলামে বিয়ের উপহার যৌতুক (dowry) নয়। যৌতুক সাধারণত মেয়ে পক্ষ বরকে নগদ দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামে বরকেই নগদ মোহরানা প্রদান করতে হয়' যা কুরআন অনুসারে 'সাদাকা' বা উপহার হিসাবে চিহ্নিত, যা নবজীবনের প্রতি ভালবাসা ও প্রতিশ্রুতির নিদর্শনস্বরূপ। আবার এই মোহরানা কোন কোন সমাজে মেয়ে নেবার সময়ে মেয়ের পিতাকে যে ক্ষতিপূরণ মূল্য দেয়া হয় তার সমার্থক নয়। কারণ মোহরানা মেয়ের পিতা পায়না এটা নিরঙ্কুশভাবে মেয়ে পায়। এটা কোন মূল্য নয় বরং উপহার।

## ৫. মেয়ে পক্ষের মোহরানা খরচের অধিকার

মোহরানা নিরঙ্কুশভাবে মেয়ের। কাজেই মেয়ের পরিবার কর্তৃক এই টাকা খরচ করা ইসলাম পরিপন্থী। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও আসবাব নিশ্চিত করা স্বামীর দায়িত্ব। তবে মেয়ের অনুমতি নিয়ে কেউ কেউ নতুন সংসার শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব মোহরানার অর্থে কিনে থাকে। এক্ষেত্রে ঐসব আসবাবের মালিকানা স্ত্রীর থাকবে।

## ৬. মোহরানার সীমা নির্ধারণ

কুরআন বা হাদিসে মোহরানার কোন ন্যূনতম বা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। ইসলাম উভয়ের জন্য বিয়েকে সহজ ও গ্রহণযোগ্য করতে চায়। তাই দেখা যায় রাসূল (সঃ) কখনো মোহরানা হিসেবে মাত্র একজোড়া জুতা, বা কুরআনের একটি সূরা তিলাওয়াৎ বা ঈমান আনাকেই অনুমোদন করেছেন। রাসুল (সঃ) বলেছেন যে, সবচেয়ে রহমাত প্রাপ্ত বিয়ে হবে সেটা, যেটা সহজে হয়েছে অর্থাৎ যেটায় খরচ খুব বেশি হয়নি।

রাসূল (সঃ) (সঃ) এর মৃত্যুর পর ওমর (রাঃ) মোহরানার সীমা নির্ধারণ করতে চাইলে একজন মহিলা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে তা প্রতিহত করেন যাতে বলা হয়েছে কেউ যদি তার সমস্ত সম্পদও মোহরানা হিসেবে দেয় তাও অনুমোদিত।

ইসলামে এটা নিশ্চিত করে যে বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন। এটা কোন ব্যবসা নয় যে মেয়ে পক্ষ ইচ্ছেমত মোহরানা ধার্য করে অর্থ লুটে নেবে। এ হৃদয়ের বন্ধনকে জাগতিক দরকষাকষির উর্ধ্বে রাখতে হবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ Edward Weston-Mark, 'History of Human Marriage'

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৩০ঃ২১,

বুখারী শরীফে উদ্ধৃত আছে যে, রাসূল (সঃ) সেই বিয়ে বাতিল করে দেন যা মেয়ের পিতা মেয়ের অমতে দিয়েছিলো।

রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, যে মহিলার আগে একবার বিয়ে হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত অভিভাবকের উর্ধ্বে। আর কুমারী মেয়েরও অনুমতি নিতে হবে, তার নীরবতাই হবে তার অনুমতি।

একবার একজন মহিলা রাসূল (সঃ)-এর কাছে এসে যখন বলেন যে তার অমতে বিয়ে হয়েছে, তখন রাসূল (সঃ) সেই বিয়ে বাতিল করে দেন। তখন সেই মহিলা বলেন যে, তিনি পরে বিয়ে মেনে নিয়েছেন; তবু রাসূলের কাছে এসেছেন এটা প্রতিষ্ঠিত করতে যে মেয়ের অমতে বিয়ে দেবার অধিকার তাদের পিতার নেই।

প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৪

# জি- ৩০ ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন- ৪ (বিয়ে চুক্তি)

**প্রশ্ন ঃ**

১. বিয়ে চুক্তির সময় যদি মোহরানার অংক নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে কি বিয়ে বাতিল হয়ে যায়?

২. মোহরানা নির্ধারিত হবার পর বিয়ের সময় যদি তা পুরোপুরি আদায় করা না হয় তাহলে কি হবে?

৩. আইনের দৃষ্টিতে কখন মোহরানা পাওনা হবে?

৪. যদি স্বামী-স্ত্রীর দৈহিন মিলনের আগেই তালাক হয়, তাহলে কি স্ত্রী মোহরানার টাকা পাবে?

৫. মোহরানা ছাড়া অন্যান্য শর্তও কি বিয়ে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়?

৬. যদি কনে বিয়েতে এমন শর্ত রাখতে চায়, যেমন বিয়ের পর স্বামীকে নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থান করতে হবে, তবে এমন শর্ত কি রাখতে পারবে?

৭. ন্যূনতম আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া বিয়েতে পালনযোগ্য আর কোন আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?

৮. এক সময় ইসলাম অস্থায়ী বিয়ে অনুমোদন করেছিল। তেমন বিয়ে কি এখনও অনুমোদিত?

**উত্তর ঃ**

## ১. মোহরানার অংক বিয়ে চুক্তিতে নির্ধারিত না থাকলে

ইসলামী আইনবিদরা একমত যে, বিয়ের সময় মোহরানার পরিমাণ নির্ধারিত 'না' থাকলে বিয়ে বাতিল হয় না। তবে ভবিষ্যৎ ভুল বুঝাবুঝি এড়াবার জন্য বিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ই তা নির্ধারণ করে রাখা উচিৎ। যদিও ইসলাম মতে দু'জন সাক্ষী থাকলে চুক্তি লিখিত না হলেও চলে তবে লিখিত চুক্তিই উত্তম। বিয়ে চুক্তির সময় মোহরানা নির্ধারিত না থাকলে এবং পরে এই নিয়ে বিতর্ক হলে ইসলামী আইনে 'মোহর আল মিসলি'র সুযোগ আছে, যা অনুযায়ী বিচারক মেয়ের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান অনুযায়ী মোহরানার অংক নির্ধারিত করে দেবেন। এই বিচারকের রায় উভয়ে মানতে বাধ্য থাকবে।

## ২. বিয়ের সময় মোহরানার অর্থ পুরোপুরি না দেয়া হলে

ইসলামী আইনমতে বিয়ের সময় মোহরানার পুরো অর্থ না দেয়া হলে বিয়ে ভাঙবে না। ইসলামী আইন এ ব্যাপারে শিথিল করা হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানকে সফল ও সহজ করার জন্য। কাজেই মোহরানা বিয়ের সময় পুরোপুরি বা আংশিক দেয়া যেতে পারে এমনকি পুরোটাই বকেয়া থাকতে পারে। মোহরানার অনাদায়কৃত অংশকে 'মুয়াজ্জিল' বলা হয়। তবে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলনের পূর্বেই মোহরানা পুরোপুরি বা আংশিক দেয়া উত্তম। এটা প্রতিশ্রুতি এবং আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।

### ৩. পুরো মোহরানা কখন পাওনা হবে

তিন ক্ষেত্রে মোহরানার পুরো অর্থ আইনত পাওনা হয় ঃ

ক. স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর পুরো মোহরানাই স্ত্রীর পাওনা হয়ে যায়।

খ. স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বে যে কেউ মারা গেলে পুরো মোহরানা পাওনা হয়।

গ. বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর মিলন না হলেও তারা যদি একান্তে বসবাস করে যাতে সামাজিক ভাবে মনে হয় স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়েছে, তাহলেও স্ত্রী পুরো মোহরানা পাওনা হবে।

### ৪. স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বে তালাক হলে মোহরানা প্রসঙ্গে

ইসলামী আইন মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং কোন বিবেকবর্জিত মানুষ যেন তাদের প্রতারিত বা বঞ্চিত করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ। যদি বিয়ের পর দৈহিক মিলনের আগেই তালাক হয় তাহলেও স্ত্রী মোহরানার অর্ধেক অর্থ পাবে। মোহরানার পরিমাণ নির্ধারিত না থাকলে কুরআন অনুসারে স্বামী 'মুতা' বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানে (consolation gift) বাধ্য থাকবে। অবশ্য যদি মেয়ে পক্ষ কর্তৃক কোন মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে অথবা কোন সত্য গোপন করে বিয়ে দেয়া হয় এবং সেজন্যে বিয়ে ভাঙ্গে তবে স্ত্রী মোহরানা পাবে না।

### ৫. মোহরানা ছাড়া বিয়ে চুক্তিতে আর শর্ত রাখা যাবে কি?

ইসলামী আইনে মোহরানা ছাড়াও স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ বিয়ে চুক্তিতে অন্য যে কোন বৈধ ও পারস্পরিক সম্মতিতে করা আইনানুগ শর্ত রাখতে পারেন। রাসূল (সঃ) বলেন, এমন শর্ত পালনে উভয়েই বাধ্য থাকবে। কারণ চুক্তি মেনে চলা মুসলমানদের দায়িত্ব। উপরন্তু এটা এমন মহৎ চুক্তি যা একজন মানুষকে আরেক জনের জন্য বৈধ করে। তবে শর্ত আরোপের সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন আল্লাহ্ স্বীকৃত কোন বৈধ অধিকারকে অবৈধ বা অবৈধ অধিকারকে বৈধ না করে।

### ৬. এমন শর্ত দেয়া যাবে কিনা যা স্বামীকে নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যেতে বারণ করবে

এ বিষয়ে ইসলামী আইনবিদরা দু'ধরনের মত ব্যক্ত করেন। শাফায়ী এবং হানাফীরা বলেন যে এমন শর্ত দেয়া যাবে না যা মানুষের বৈধ/হালালভাবে স্বাধীন চলাফেরার অধিকার কেড়ে নেয়। অন্য আইনবিদরা যেমন ইমাম হানবালী বলেন যে, যদি স্বামী বিয়ের সময় এমন শর্ত মেনে নেয় তবে সে তা পালন করতে বাধ্য। তারা বলেন এর ফলে স্বামী কেবল একটি বিষয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট দেশ বা স্থান ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

### ৭. আইনগত আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বিয়েতে অনুমোদিত অনুষ্ঠানাদি

ক. বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় এমন একজনকে উপস্থিত রাখা ভাল যিনি আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসার পর বর-কনে ও সবার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদিসের আলোকে বিয়ের উদ্দেশ্য, দায়িত্ব ও গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

খ. সাক্ষীর উপস্থিতিতে বর কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব ও কন্যার প্রস্তাব কবুল করা আনুষ্ঠানিকভাবে হওয়া উচিৎ।

গ. বিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিয়ে পরিচালনাকারী ব্যক্তি বিবাহিতদের সাফল্য কামনা করে সবাইকে নিয়ে দোয়া করতে পারেন এবং বর-কনেকে মোবারকবাদ জানাতে পারেন এই বলে যে, বারাকাল্লাহ্ ফিকুম (আল্লাহর সন্তুষ্টি আপনাদের জন্যে হোক)।

ঘ. বিয়ের কথা যথাসম্ভব প্রচার করা প্রয়োজন, যাতে সবাই বর কনের আনন্দে শরীক হতে পারে, এবং সামাজিকভাবেও তাদের সহাবস্থান স্বীকৃত হয়।

ঙ. বিয়ের দিন অথবা তার পর বর তার আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের ডেকে আপ্যায়ন করাবে (যার নাম ওয়ালিমা)। এই অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ইসলামের নৈতিক সীমার মধ্যে এবং সেখানে গরীব ও মিসকীনরাও আমন্ত্রিত থাকবে।

## ৮. অস্থায়ী বিয়ে

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা যে রকম ধাপে ধাপে করা হয়েছে, সে রকমই ইসলাম-পূর্ব আরবের বিশৃঙ্খল ও বাছ বিচারহীন জীবনকে কিছু সময় সহ্য করতে হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ইসলামের সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করা গেছে। নবী (সঃ) পুরুষদের জন্যে অস্থায়ী বিয়ে বহাল রেখেছেন যারা বড় সময়ের জন্যে (এক রাত নয়, কয়েক মাস) ঘরের বাইরে থাকে (যুদ্ধের প্রয়োজনে)- যাতে তারা নিজেদেরকে ব্যভিচার থেকে দূরে রাখতে পারে। সাধারণ বিয়ের মতই শর্ত এ বিয়েতে থাকত; কেবল এ বিয়ে চিরস্থায়ী সম্পর্কের জন্যে করা হত না। যত সময় যেতে থাকল, মুসলিমরা ঈমানে দৃঢ় হল, তখন মদ্যপান নিষিদ্ধ করার মতই এরকম অস্থায়ী বিয়ের প্রচলন পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। অস্থায়ী বিয়ে নিষিদ্ধ কারণ ঃ

ক. ইসলামে কুরআন অনুযায়ী বিয়ের এক উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা; এবং

খ. রাসূল (সঃ) 'শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত' এরকম বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ২ঃ২৩৬-২৩৭

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ৫ঃ১

বেআইনী শর্তের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন কোন মহিলা যদি কোন পুরুষকে এই শর্ত দেয় যে, "আমি তোমাকে বিয়ে করব যদি তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দাও।" রাসূল (সঃ) নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, কোন পুরুষ প্রথম স্ত্রীকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না।

প্রশ্ন-৭ ঃ বিয়ের কথা বহুল প্রচারের জন্য রাসূল (সঃ) বলতেন বিয়ের অনুষ্ঠান মসজিদে করার জন্য। রাসূল (সঃ) বলতেন যে সবচেয়ে জঘন্য আয়োজন হচ্ছে সেটা যেখানে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া এবং গরীবদের অবজ্ঞা করা হয়।

প্রশ্ন-৮ ঃ আল কুরআন ১৬ঃ৭২, ৩০ঃ২১

# জি- ৩১. বহুবিবাহ ও ইসলাম-১ (ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত)

**প্রশ্ন ঃ**

১. বহু বিবাহ কি?
২. আদর্শ মুসলিম পরিবার কি একাধিক স্ত্রী সম্পন্ন?
৩. বহুবিবাহের ঐতিহাসিক ভিত্তি কি? প্রাচীন সভ্যতা সমূহে এটা কিভাবে চালু ছিল?
৪. বহু বিবাহ সম্পর্কে ইহুদী সভ্যতায় কি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়?
৫. ইহুদী জনগণের মাঝে বহুবিবাহের চর্চা কেমন ছিল?
৬. এটা কি বলা যায় যে খ্রীষ্টবাদ সবসময় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ছিল?
৭. এমন কোন ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে কি যাতে দেখা যায় যে চার্চ বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে?

**উত্তর ঃ**

## ১. বহুবিবাহ

সাধারণতঃ 'বহুবিবাহ' বলতে একই স্বামীর একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখাকে বুঝায়। অবশ্য দু'একটি প্রাচীন সমাজে একই স্ত্রীর একসাথে একাধিক স্বামীর ঘর করার নজিরও দেখা যায়। তবে তা ইসলামসহ সব একেশ্বরবাদী ধর্মেই নিষেধ।

## ২. আদর্শ মুসলিম পরিবার

যদিও ইসলামে বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়নি তবুও আদর্শ মুসলিম পরিবার বলতে এক স্বামী এক স্ত্রীর পরিবারকেই বুঝায়। ইসলামে এটা কেবল অনুমোদিত একটা বিষয়। ইসলাম বহুবিবাহের সূচনা করেনি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রথা চলে এসেছে। ইহুদীদের মাঝেও এই প্রথা ছিল। খ্রীস্টানরাও এর উর্ধ্বে নয়। বরং ইসলামই বহুবিবাহ সম্পর্কে খোলাখুলি সরলভাবে আলোচনা করেছে এবং এর উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

## ৩. বহুবিবাহের ঐতিহাসিক ভিত্তি

সমাজবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন যে, মিসর, পারস্য, ভারত, ইউরোপ, প্রাচীন আরব ও শ্লাভ সভ্যতাসহ প্রায় সকল প্রাচীন সভ্যতায় বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। এমনকি যেসব সমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল সেখানেও যারা চাইত তাদের জন্য বহুগামীতার ব্যবস্থা ছিল। যেমন 'কোড অব হামুরাবি'তে যদিও এক স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার নিয়ম ছিল কিন্তু সেখানেও উপপত্নী রাখবার ব্যবস্থা ছিল। একইভাবে গ্রীক-রোমান সভ্যতায়ও একক স্ত্রী বিশিষ্ট পরিবার দেখা গেলেও বহুগামিতা ছিল খোলামেলা বিষয়।

## ৪. বহু বিবাহ ও ইহুদী সভ্যতা

যদিও সাধারণভাবে মনে করা হয় ইহুদী-খ্রীষ্টান আইন বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখা যায় যে বহু নারী, রাজা এবং বিচারকের

একাধিক স্ত্রী ছিল এবং কোথাও এটাকে নিষিদ্ধ বা অনৈতিক বলা বা ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। যেমন, গিডিয়ন (Gideon)-এর অসংখ্য স্ত্রী ছিল এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে যে তার চরিত্র এত পবিত্র ছিল যে, স্বয়ং খোদার জ্যোতি তার উপর চলে আসত। আবাদন (Abadon) যিনি আট বছর ইসরাইল শাসন করেছেন তাঁর চল্লিশজন পুত্র ছিল এবং অবশ্যই একাধিক স্ত্রী ছিল। ডেভিড এর একশ স্ত্রী ছিল, Rehoboam-এর ১৮ জন স্ত্রী এবং তিনশত উপপত্নী ছিল এবং অব্রাহাম যাকে একত্ববাদীদের পিতা বলা হয় তাঁরও দু'জন স্ত্রী ছিল।

## ৫. ইহুদী জনগণের মাঝে বহুবিবাহের চর্চা

প্রখ্যাত সমাজবিদ এডওয়ার্ড ওয়েস্ট-মার্ক তার 'Short History of Marriage's-এর তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৬ সালে প্রকাশিত) বলেন,

"ইউরোপীয় ইহুদীদের মধ্যে মধ্যযুগ পর্যন্ত বহুবিবাহের চর্চা ছিল এবং আরব বিশ্বের ইহুদীদের মধ্যে আজও এই চর্চা আছে। প্রথমতঃ জার্মান এবং ফ্রান্সে এর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয় দ্বাদশ শতকে, যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপে ইহুদীদের মাঝে বহুবিবাহ বন্ধ হয়। তবুও ইহুদী বিবাহ আইনে বহু বিবাহের অনেক পথ রয়েছে যা বহুবিবাহ যখন অনুমোদিত ছিল, তা থেকে উৎসারিত।"

যারা বলেন যে যেসব ইহুদী, মুসলিম সমাজের সংস্পর্শে এসেছে, তারা মুসলমানদের দেখে বহুবিবাহ করেছে, তারা ঠিক বলেন না। কারণ ইসলাম তার আইন কখনই অমুসলিমদের উপর চাপায়নি। মুসলিম এলাকায় বাসরত ইহুদীরা তাদের বহুবিবাহের চর্চা বন্ধ করতে চাইলে যে কোন সময় আইন করে বন্ধ করতে পারত। অবাক হবার কথা হচ্ছে যে, যখন ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তখন কিছু ইয়েমেনী ইহুদী দুই বা ততোধিক স্ত্রীসহ ইসরাইলে আগমন করে।

## ৬. খ্রীষ্টবাদ ও বহু বিবাহ

এটা বহুল প্রচলিত ধারণা যে খ্রীষ্টবাদ কঠোরভাবে বহুবিবাহের বিরোধী। কিন্তু এই ধারণার পক্ষে তাদের ধর্মগ্রন্থে কোন দলিল পাওয়া যায় না, যদিও এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করা উত্তম-এমন কথা দেখা যায়; কিন্তু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এমন কোন আদেশ নেই। ওল্ড টেস্টামেন্ট খ্রীষ্টান ঐতিহ্যের অংশ, তাতে দেখা যায় যীশু (আঃ) বলেন, "আমি আমার পূর্ববর্তী নবীদের আইন ধ্বংস করতে আসিনি বরং তাকে পূর্ণতা দিতে এসেছি।" কাজেই আগের নবীদের আমলে বহুবিবাহ অনুমোদিত থাকলে তার আমলে তা নিষিদ্ধ হয়নি। তারপরও খ্রীষ্টানদের মধ্যে বহুবিবাহের চর্চা ইহুদীদের তুলনায় কম হবার সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে ঃ

ক. প্রাথমিক যুগের খ্রীস্টান যাজকরা এবং সাধারণভাবে সকল খ্রীষ্টান বিয়ে ও যৌন সম্পর্কের উপর তীব্র ঘৃণাবোধে ভূগতেন। বিয়েকে তারা শয়তানী কাজ বলে মনে করতেন।

খ. প্রাথমিক যুগের খ্রীস্টানদের মাঝে আত্মাকে পরিশুদ্ধির (Soul-Saving) চেষ্টায় প্রাধান্য দেখা যায়।

গ. খ্রীস্টবাদ প্রথমে গ্রীক-রোমান সভ্যতার এলাকাতে বিস্তার লাভ করে যাদের মধ্যে এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চালু ছিল।

ঘ. ওয়েস্ট মার্কের মতে, প্রাথমিকভাবে খ্রীস্টবাদ গরীবদের মাঝেই প্রসার লাভ করে যাদের একাধিক বিয়ের সামর্থ্য ছিল না।

## ৭. খ্রীস্টবাদে বহুবিবাহ অনুমোদনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

এডওয়ার্ড ওয়েস্টার্ন মার্ক তাঁর History of Human Marriage' গ্রন্থে বলেন, 'যদিও গ্রীক রোমান সমাজে এক বিবাহেই একমাত্র বৈধ ব্যবস্থা ছিল তবুও একথা বলা যাবেনা যে খ্রীস্টানদের জন্য বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল'... এবং যদিও নিউ টেস্টামেন্টে এক বিয়েকেই আদর্শ এবং স্বাভাবিক বলা হয়েছে, তবুও বহু বিবাহকে নিষেধ করে কিছু বলা হয়নি; ব্যতিক্রম শুধু বিশপ বা ডিকন (Deacon)-র ক্ষেত্রে। "(চার্চের) ফাদাররা ইহুদী রাব্বীদের ভোগবাসনা (Sensuality)-র জন্যে অভিযুক্ত করলেও চার্চ কাউন্সিল থেকে বহুবিবাহের বিপক্ষে কিছু বলা হয়নি এবং সেইসব সমাজের রাজারা প্রকৃতিপূজারী যুগের মতই অনেক স্ত্রী রাখার ক্ষেত্রে কোন বাধার সম্মুখীন হননি।'

এরকম সম্প্রতির কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে ঃ

ক. সপ্তম শতকের মাঝামাঝি আয়ারল্যান্ডের আরমাইক রাজার দু'জন রাণী এবং দু'জন উপপত্নী ছিল।

খ. চার্লস দ্য গ্রেট-এর দুই স্ত্রী এবং অসংখ্য উপপত্নী ছিল এবং তার এক আইনে দেখা যায় যে যাজকরা বহুবিবাহ সম্পর্কে জানতেন।

গ. প্রুশিয়ার রাজা উইলিয়াম- ২ এবং হেস-এর ফিলিপ একাধিক বিয়ে করেন যাজক মার্টিন লুথারের অনুমতি নিয়ে। মার্টিন লুথার বলেন যে, 'খোদা এটা নিষেধ করেননি।'

ঘ. এনাব্যাপটিস্ট এবং মরমনস সহ কয়েকটি খ্রীস্টান সম্প্রদায় বহুবিবাহ সমর্থন করে।

ঙ. ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসানের পর (১৬৫০ সালে) নুরেমবার্গে আইন পাশ হয় যে প্রত্যেক পুরুষ দু'জন নারী বিয়ে করতে পারবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৫ ঃ J. Hastings সম্পাদিত 'The Dictionary of the Bible'-এ বলা হয়েছে, "বহুবিবাহ একটি বাস্তবতা কারণ আব্রাহাম, জেকব, ডেভিড, সলোমন এ চর্চা করেছেন।"

Deut Ch.17. 17-এ রাজাদের সতর্ক করে দেয়া হয় ১৮ এর বেশী বিয়ে না করতে এবং সাধারণের জন্য এ সংখ্যা চার।

প্রশ্ন-৬ ঃ আদম এবং হাওয়া (আঃ)-কে এক স্বামী-স্ত্রী দম্পত্তি হিসেবে দেখা যায় আর আল্লাহ নারী-পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় বানিয়েছেন।

"Short History of Marriage," Vol. iii, Edward Weston-Mark, 1926.
"History of Human Marriage," Edward Weston-Mark, 1925.
"The dictionary of the Bible, J. Hasting সম্পাদিত, 1963 (পৃষ্ঠা ৬২৪)

# জি- ৩২ বহুবিবাহ ও ইসলাম- ২ (ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত)

**প্রশ্ন ঃ**

১. মরমন (Mormon) সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীস্টানরা কি বহুবিবাহ অব্যাহত রেখেছিল?

২. সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন সভ্যতায় ও জাতিতে বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকার কারণ কি?

৩. এটা কি বলা যায় যে ইসলাম বহুবিবাহ চালু করেনি, এটাকে শুধুমাত্র স্বীকৃতি দিয়েছে।

৪. কুরআনে বহুবিবাহের অনুমতি সূচক কোন উদ্ধৃতি আছে কি?

৫. ৪নং সূরার ৩ নং আয়াতের পটভূমি ও ব্যাখ্যা কি?

৬. বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সমব্যবহারের অর্থ কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. মরমন সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীস্টানদের বহুবিবাহ

১৮৪৭ সালে মরমনরা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে (Promised Land of Utah) বসবাস শুরু করে এবং ব্যাপকভাবে বহুবিবাহের প্রসার ঘটায়। ব্রিগাম ইয়াং-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মরমন চার্চ বহুবিবাহকে আধ্যাত্মিক বিধান হিসেবে প্রচার করত। ১৮৯০ সালে ফেডারেল সরকার বহুবিবাহকে নিষেধ করলেও মরমনদের মাঝে এই চর্চা অব্যাহত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার কর্তৃক তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়। তাদের সম্পদে ভাটা পড়ায় মরমন চার্চের প্রেসিডেন্ট উইলসন উডরাফ বহুবিবাহ বন্ধ করে বলেন যে, এটাও আধ্যাত্মিক আদেশ। এবং এ আধ্যাত্মিক আদেশ আসে চার্চের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পর! ১৯৬৭ সালে সাময়িকী 'Journal'-এ (June সংখ্যা) বেন মারকন প্রতিবেদন দেন যে, তখনও অন্ততঃ ত্রিশহাজার মরমন পরিবারে একাধিক স্ত্রী ছিল।

## ২. বহুবিবাহ প্রথার কারণ

সমাজ বিজ্ঞানী হামুদাহ আবদ আল-আতি সহ অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে বহুবিবাহ কোন সমাজ বিরোধী বা অবিবেচক কাজ ছিল না বরং এক জটিল বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যার বিভিন্নরকম কারণ রয়েছে। তাঁর রচিত 'The Family Structure in Islam' গ্রন্থে তিনি এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ চিহ্নিত করেছেন। যথা ঃ

**ব্যক্তিগত**

ক. কোন বিবাহিত মানুষ অপর মহিলার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে তাকে বিয়ে করতে চাইল।

খ. প্রথম স্ত্রীর এমন শারীরিক বা অন্য সমস্যা দেখা দিল যে সে স্বামীর দৈহিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হল।

গ. সাংস্কৃতিক কারণ, যেমন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একাধিক স্ত্রী রাখার রীতি অন্য ব্যক্তিদের বহুবিবাহের দিকে প্রভাবিত করতে পারে।

ঘ. কোন কোন সমাজে গরীব লোকের প্রথম বা একমাত্র স্ত্রী হবার চেয়ে ধনী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হতে চাইত।

## ১. জনসংখ্যাগত

ক. পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা সাম্য ব্যাহত হলে সেসব সমাজে অনেক নারীর বিয়ে না হতে পারে এবং এক্ষেত্রে বহুবিবাহকে তারা উত্তম বিকল্প পথে মনে করতে পারে। (যুদ্ধ বা অন্য কারণে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে- অনুবাদক)

**জৈবিক ঃ**

ক) পুরুষের যৌন প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে বহুবিবাহের দিকে বেশি।

## ২. সামাজিক

ক. কোন কোন সমাজে বহুবিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা হয়।

খ. কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী বাড়ির কাজে প্রথম স্ত্রীর জন্য সহায়ক হয়।

গ. যে সব সমাজে শিশু মৃত্যুর হার বেশী তাদের মাঝেও বহু বিবাহের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

আবদ আল-আতি বলেন, 'এসব কারণ পরস্পরে যুক্ত হয়ে অন্যান্য সামাজিক ফ্যাক্টর যেমন- ঐতিহ্য, নৈতিকতা, রীতি ও আইন ইত্যাদির' সাথে মিশে বহু বিবাহকে বাস্তবতা দিয়েছে। (পৃষ্ঠা- ১১)

## ৩. ইসলাম কি বহুবিবাহকে অনুমতি দিয়েছে

ইসলাম বহুবিবাহ প্রথা উদ্ভাবন বা চালু করেনি। এটা আগে থেকেই চালু ছিল বরং ইসলামই একমাত্র তৌহিদবাদী ধর্ম যা বহুবিবাহকে কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করে সীমাবদ্ধ করেছে। ইসলামে এটা কোন অত্যাবশ্যকীয় বা নির্দেশিত কাজ নয় শুধু বিশেষ কিছু অবস্থার প্রেক্ষিতে সুযোগ মাত্র।

এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ইসলামে অনুমোদিত অনেক কাজও ইসলামের অন্য আইন ভংগ হবার প্রেক্ষিতে অননুমোদিত হয়ে যেতে পারে। যেমন কেউ যদি এই মতলবে দ্বিতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রথম স্ত্রীর সাথে সুব্যবহার করবে না তবে তার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে অনুমোদিত নয়। (কারণ এখানে অবিচার সম্পৃক্ত) যদিও

নীতিগতভাবে বহুবিবাহ অনুমোদিত। (পাঠকদেরকে সর্বদা এসব মৌলিক নীতিমালার আলোকে ইসলামের নীতির বিচার করতে হবে-অনুবাদক)

## ৪. বহুবিবাহ প্রসঙ্গে কুরআন

বহুবিবাহ প্রসঙ্গ কুরআনের ৪ নং সূরার ৩ নং আয়াতে এসেছে যা থেকে দেখা যায় ঃ

ক. বহুবিবাহ মুসলমানের জন্য 'আবশ্যক' কিছু নয়।

খ. একের অধিক বিয়ে শর্তযুক্ত (Conditional)।

গ. সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী বিয়ে করার সীমা নির্ধারিত হয়েছে, যদিও এর আগে এর কোন সীমা ছিল না।

ঘ. উক্ত আয়াতে এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতেই একাধিক বিয়ের কথা বলা হয়েছে ঃ কোন মুসলমানের তত্ত্বাবধানে থাকা এতিমের সাথে যথাযথ ব্যবহার প্রসঙ্গে।

## ৫. উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিত ও ব্যাখ্যা

হযরত আয়েশা উক্ত আয়াত নাযিলের পটভূমি প্রসঙ্গে বলেন যে, কয়েকজন এতিম বালিকার তত্ত্বাবধায়ক এক পুরুষকে নির্দেশনা দিতেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতটি নাযিল হয় ওহুদ যুদ্ধের পরক্ষণেই। ওহুদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হন। তাঁদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। তাদের খাদ্য, আশ্রয় ছাড়া পারিবারিক পরিবেশে থাকাও জরুরী ছিল। এবং এ কারণে তাদেরকে বিভিন্ন অভিভাবকের নিকট রাখা হল। এমনি কয়েক এতিম বালিকার তত্ত্বাবধায়ক পুরুষ একটি বালিকাকে তার প্রাপ্য মোহরানার চেয়ে কম দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইল। এই আয়াতে মুসলমানদের সাবধান করে বলল, এতিমের প্রতি ন্যায়বান থাকতে এবং ন্যায্য মোহ্রানা দিতে না পারলে তাদের বিয়ে না করতে। সর্বোচ্চ চার বিয়ে করার অনুমোদন দেয়া হয়। প্রখ্যাত একজন তাফসীকারক তাঁর 'আল কাশফ আল তাফসীর' গ্রন্থে বলেন যারা সন্দিহান যে আরেক বিয়ে না করলে তার দ্বারা ব্যভিচার সংগঠিত হতে পারে তাদের জন্যই এ সুযোগ রাখা হয়েছে। কুরআনের কঠোরভাবে সতর্ক করা যে, এতিমদের সাথে অবিচার না করা এবং অন্যদিকে ব্যভিচারের বিষয়ে ইসলামের শক্ত অবস্থান একজন সত্যিকার মুসলমানকে ভীত করে দেয় এবং তখন বহুবিবাহ এ দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছিল।

অবশ্য এই আয়াতে এটাও সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় তাদের অবশ্যই উভয় স্ত্রীর সাথে সমব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

## ৬. স্ত্রীদের সাথে সমব্যবহার এর অর্থ

স্ত্রীদের সাথে সমব্যবহার বহুবিবাহের 'অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত'। এছাড়া দ্বিতীয় বিয়ের আশা করা অবান্তর। রাসূল (সঃ) বলেন যে, "যে ব্যক্তি দুই স্ত্রীর একজনের প্রতি

পক্ষপাতিত্ব করবেন, সে হাশরের ময়দানে শরীরের এক অংশ নীচু অবস্থায় হাযির হবে।"- এটি একটি সংকেত যে ঐ ব্যক্তি অসাম্য ব্যবহারের জন্যে 'চিহ্নিত' ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হবে হাশরের ময়দানে। যে ব্যক্তি একাধিক বিয়ের চিন্তা করে তার এ দৃঢ়তা ও আস্থা থাকতে হবে যে, সে 'মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুবিচার করতে পারবে। সমব্যবহার বলতে বুঝায় সকল স্ত্রীকে এক মানের খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন, সময় এবং সহানুভূতি দিতে হবে। শুধু এক ক্ষেত্রেই হয়ত সমান থাকা যাবে না তা হচ্ছে ভালবাসা ও আবেগ। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (সঃ) আল্লাহর কাছে পানাহ্ চেয়েছেন- এভাবে, "হে আল্লাহ! এটাই আমার পক্ষে অপক্ষপাতিত্ব (বা বিভাজন) যা আমার নিয়ন্ত্রণে। অতএব আমাকে তুমি পাপী করোনা যা তোমার নিয়ন্ত্রণে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ


প্রশ্ন-২ ঃ 'The Family Structure of Islam', Hamudah Abd Al Ati,
'Sokomo Law and Custom', H. Cory, New York, 1953.
'In the Heart of the Bantuland', D. Campbell, London, 1922

প্রশ-৪ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৩

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কাশাফ তাফসীর', আসগর মাকশারী।

প্রশ-৬ ঃ আল কুরআন ৪ঃ১২৯

# জি- ৩৩ বহুবিবাহ ও ইসলাম- ৩ (কেন অনুমোদিত)

**প্রশ্ন ঃ**

১. কেউ কেউ বলে যে, ইসলাম বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং এ ব্যাপারে কুরআনের উদ্ধৃতি দেয়- এ বিষয়ে মন্তব্য করুন।

২. চারজন স্ত্রী- এই সংখ্যা নির্ধারনের কারণ কি?

৩. ইসলামের মৌলিক শিক্ষা যদি এক বিবাহই হয় তবে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হল কেন?

৪. বহুবিবাহের অনুমতি দেবার সামাজিক কারণগুলো কি?

**উত্তর ঃ**

**১. কুরআনে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে**

যদিও চতুর্থ সূরার (নিসা) ৩ নং আয়াতে বহুবিবাহের সুযোগ রয়েছে তবুও সব স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহারের পূর্বশর্ত রাখা হয়েছে। একই সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "কিন্তু তোমরা কখনই সমান ব্যবহার করতে পারবে না.."- এই আয়াত থেকেই অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে কুরআনে বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়েছে। দু'টি কারণে এই ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ নয়-

ক. ৪নং সূরার ৩নং আয়াতে এটা স্পষ্ট যে একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারবে। তাহলে সেই কুরআনেই আবার অন্যত্র এটা নিষিদ্ধ হয় কেমন করে?

খ. এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে রাসূল (সঃ) নিজে এবং তাঁর সাহাবীরা একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তাহলে এমন কি মনে হওয়া উচিৎ যে তাঁরা কুরআন অমান্য করেছিলেন? এটা নিশ্চিত যে কুরআনে আদ্‌ল (Justice) সমব্যবহার বহুবিবাহের পূর্বশর্ত হিসেবে রেখেছে। এই 'সমব্যবহার' বলতে একই মানের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন, সময় প্রদান সহ পার্থিব বিষয়াদিতে সমতার কথাই বলা হয়েছে। আর ১২৯ নং আয়াতে যে সমতা সম্ভব নয় বলা হয়েছে তা মূলতঃ ভালবাসা ও আবেগ প্রসূত আকর্ষণ যাতে সমান বন্টন মানুষের জন্য কঠিন। কুরআন সমব্যবহারের কথা বলে পুরুষকে সতর্ক করেছে। আরও বলা হয়েছে কেউ যেন প্রথম স্ত্রীর বিনিময়ে (অর্থাৎ তার সুবিধা ও তার প্রতি ভালবাসা বাদ দিয়ে) দ্বিতীয় স্ত্রী না আনে।

**২. সর্বোচ্চ সীমা চারজন স্ত্রী হবার কারণ**

চারজনের এই সর্বোচ্চ সংখ্যা স্বয়ং সর্বজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা ন্যায়ের প্রতীক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করা। যদি এ সংখ্যা তিন, পাঁচ বা অন্যকোনটিও হত, তবুও কারো না কারো উৎসাহ থাকত তার কারণ জ্ঞাত হবার। নিম্নে এই সংখ্যা চার হবার সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল–

ক. এটা বলা হয়ে থাকে যে একজন মেয়ে স্বামী ছাড়া সর্বোচ্চ তিনদিন সুখী থাকতে

পারে। যদি একজনের সর্বোচ্চ চার স্ত্রী থাকে এবং সে একদিন পর পর এক একজন স্ত্রীর কাছে থাকে তাহলে প্রতি স্ত্রীর সর্বোচ্চ বিরহকাল হবে তিনদিন।

খ. খুব ধনী ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষেই চারের অধিক স্ত্রী রাখা সম্ভব নয়। অবশ্য এ দুটি ব্যাখ্যার কোনটাই সন্তোষজনক নাও হতে পারে। যার প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহর কাছে। তবে এটা নিশ্চিত যে এই চার সংখ্যা একবিবাহ (Monogamy) এবং বহুগামিতা (Sensuality/ unlimited Plurality)-এর মাঝে একটি সাম্য এবং যুদ্ধসহ বিভিন্ন কারণে নারী পুরুষের সংখ্যাসাম্য বিপর্যস্ত হলে তার সমাধান। যদি স্বামীর পক্ষে চার এর কম তিন বা দুই স্ত্রী নিয়ে সমস্যার সমাধান হয় তবে আরো ভাল আর এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করাতো সর্বোত্তম।

## ৩. বহুবিবাহের অনুমতির সম্ভাব্য কারণ

কুরআনে বহুবিবাহের অনুমতি প্রদানের কারণ (যা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম সমাধান) আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা দরকার। যদিও বহুবিবাহের বিষয়টি অনেকের চোখেই খারাপ লাগে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এই অনুমোদন কোন মানুষের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। এ সুযোগ আল্লাহর তরফ থেকে সরাসরি ওহীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, যিনি নারীও নন, পুরুষও নন। কাজেই এর মাধ্যমে পুরুষকে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ অনুমতির পেছনে কিছু বাস্তব কারণ আছে। এসব বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে আল্লাহ এবং তাঁর জ্ঞানের অসীমত্বের উপর দৃঢ় ঈমান নিয়ে। কারো এমন বললে চলবে না যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত বহুবিবাহের অনুমতির যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানা যাবে ততক্ষণ আমি খোদায় বিশ্বাস করবো না।" আরও মনে রাখা দরকার যে, কুরআন হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহর নাযিল করা সর্বশেষ জীবন বিধান। এরপর আর কোন কিতাব আসবে না। কাজেই পরবর্তী সব সমাজ, জাতি ও সময়ের চাহিদা পূরণের মত আইনগত সুযোগ এতে রাখা প্রয়োজন ছিল। যদি শুধুমাত্র সপ্তম শতকের মানুষের চাহিদা পূরণের বিধান এতে থাকত বা শুধুমাত্র আরব বিশ্ব বা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বা কোন নির্দিষ্ট জাতির সমস্যার সমাধান এতে থাকত, তবে এটা সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন হত না। নির্দিষ্ট কয়েকটি সমস্যার সমাধান এতে থাকলে এটাকে সব সমস্যার সমাধানের নির্দেশক গ্রন্থ বলা হত না। বহুবিবাহের যৌক্তিক কারণ অতীতে ছিল। বর্তমানেও থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতেও তৈরী হতে পারে। এই বিভিন্ন সময় ও অবস্থার বাস্তবতা মোকাবেলার জন্যেই ইসলামে এই সুযোগ রাখা হয়েছে।

## ৪. বহুবিবাহের সম্ভাব্য সামাজিক কারণ ঃ

ক. কোন কোন সমাজে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা বেশী থাকতে পারে। ঐ সমাজে যদি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয় তবে অনেক বিয়ের যোগ্য মেয়ে, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্বামী পাবে না। এমতাবস্থায় এসব মেয়ের সামাজিক জীবন বিপন্ন হতে পারে। তারা বিপথে যেতে পারে।

খ. পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ জীবনেরই অংশ হিসেবে থেকেছে। সাধারণতঃ পুরুষরাই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং প্রচুর সংখ্যায় নিহত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজে অনেক বিধবার সৃষ্টি হয়েছে। আবার নারীর অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অসংখ্য পুরুষের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে খোদ ইউরোপেও বহুবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা চলে এই অসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্তে।

গ. যুদ্ধ ছাড়াও পুরুষরা সাধারণতঃ বিপদজনক কাজে বেশী জড়িত থেকেছে। যেমন, খনি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, শিকার ইত্যাদি কাজে জড়িত পুরুষদের মৃত্যু অনেক মহিলাকে অকালে বিধবা করেছে। যাদের অনেকেরই পুনঃবিবাহ প্রয়োজন ছিল পারিবারিক প্রশান্তির জন্যে।

ঘ. বেশী যৌন চাহিদাসম্পন্ন পুরুষ যদি এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না হয় এমতাবস্থায় তার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন না থাকলে তার দ্বারা অনৈতিক কাজ হতে পারে। ব্যভিচার এবং বিয়ে বহির্ভূত যৌনাচার শুধু আল্লাহর আইনেরই লংঘন নয় বরং সমাজকেও ধ্বংসের দুয়ারে নিয়ে যায়।

ঙ. কোন কোন সভ্যতায় বহুবিবাহ সামাজিক রীতি। আফ্রিকায় কোন কোন সম্প্রদায়ে খোদ চার্চ নব্যখ্রীস্টানদের একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে।

### ৫. বহু বিবাহের কারণ ঃ ব্যক্তিগত পর্যায়ে

ধরুন বিশেষ একজন সুখী যুবক যার স্ত্রী এবং দুই সন্তান আছে। আকস্মিকভাবে তাঁর স্ত্রী মারাত্মক অসুখে পড়লেন (মানসিক অথবা দৈহিক) অথবা এমন দুর্ঘটনার শিকার হলেন যে স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সামর্থ আর তার থাকল না। এ অবস্থায় ঐ যুবকের সামনে যে কয়েকটি পথ খোলা থাকল তা নিম্নরূপ ঃ

ক. বাকী জীবনের জন্য সে তার জৈবিক কামনাকে দমন করে রাখতে পারে- যা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

খ. সে তার স্ত্রীকে রেখে বিয়ে বহির্ভূত যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে- যা অনৈতিক, অসামাজিক।

গ. সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে- যা অমানবিক।

ঘ. সে আর একজন স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে তার প্রথম স্ত্রীর এবং তার ও ছেলেমেয়েদের সেবা করতে পারে। বস্তুতঃ এটাই একমাত্র সমাধান যা নৈতিকতা, মানবিকতা ও প্রবৃত্তি এই তিন বিষয়ে সাম্য রক্ষা করে।

### সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ৪ঃ১২৯

প্রশ্ন-৩ ঃ১৯৪৮ সালে মিউনিখে যুদ্ধোত্তর নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক যুবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুসলমানদের বহুবিবাহ প্রথার প্রস্তাব প্রথমে সমালোচিত হলেও শেষে যুক্তির বিচারে বহুবিবাহকে একটি সমাধান ধরে সম্মেলনের প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়। তাছাড়া ১৯৪৯ সালে বন-এর জনগণ বহুবিবাহকে সংবিধানে স্বীকৃত করার দাবী জানায়।

# জি- ৩৪ বহুবিবাহ ও ইসলাম- ৪ (প্রেক্ষিত ঃ স্ত্রীর অধিকার)

**প্রশ্ন ঃ**

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন্ কোন্ অবস্থায় মানুষের একাধিক বিয়ের প্রয়োজন হতে পারে?

২. দ্বিতীয় স্ত্রী হবার কি কি ঐচ্ছিক বিষয় রয়েছে?

৩. দ্বিতীয় বিবাহে ইচ্ছুক স্বামীর প্রথম স্ত্রীর কি কি সুযোগ থাকে?

৪. যদি বিয়ে চুক্তিতে স্ত্রীর তালাকের অধিকার স্বীকৃত না থাকে তবে প্রথম স্ত্রীর জন্য কোন পথ খোলা থাকে?

৫. যদি বিচারক প্রথম স্ত্রীর তালাকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন তখনও কি তার কোন সুযোগ থাকে?

৬. স্ত্রী স্বামীকে খোলা তালাক দিলে স্বামী তা মানতে বাধ্য কি না?

৭. একজন মহিলা কেন একাধিক স্বামী রাখতে পারে না?

৮. কোন মহিলার স্বামী গুরুতর অসুস্থ বা বন্ধ্যা হলে সে কি করবে?

**উত্তর ঃ**

**১. যেসব কারণে কোন ব্যক্তির বহু বিবাহ প্রয়োজন হতে পারে ঃ**

ক. বন্ধ্যাত্ব- কারো স্ত্রী সন্তান জন্মদানে অক্ষম হবার পরও যদি তার পিতৃত্বে সখ থাকে তবে তার সামনে যেসব পথ খোলা থাকে ঃ

(i) পিতৃত্বের সখ ত্যাগ করে ধৈর্য ধরা।

(ii) বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করা।

(iii) সন্তান পালক নেয়া। অবশ্য পাশ্চাত্যে যেভাবে দত্তক নেয়া হয় ইসলামে সেভাবে দত্তক নেয়ার সুযোগ নেই। তারপরও যদি কারো সন্তান পালন নিয়ে নিঃসন্তান দম্পত্তি সুখে থাকে তবে সেটা তো সবচেয়ে উত্তম।

(iv) প্রথম স্ত্রীকে স্বমর্যাদায় রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করা।

খ. যদি স্বামীর দৈহিক চাহিদা পূরণে স্ত্রী অক্ষম হয়। (অবশ্য এটা খুব কমই হবার কথা) এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য অনৈতিক কোন কাজ করা বা স্ত্রীকে তালাক দেবার চেয়ে আর একটি বিয়ে করাই কি শ্রেয় নয়।

**২. দ্বিতীয় স্ত্রী হবার সম্ভাব্য কারণ ও তার অধিকার**

ইসলামের বিয়ে সংক্রান্ত আইন যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা দ্বিতীয় বা যে কোন বিয়ের জন্যই অভিন্ন। দ্বিতীয় বিয়ের বৈধতার জন্যও চুক্তি ও কবুলের শর্ত জড়িত। যদি কোন মহিলা কারো দ্বিতীয় স্ত্রী হতে না চায় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, তবে সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও মনে হতে পারে যে কোন মহিলা সতীনের ঘর করতে বা কারো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হতে চাইবেন না তবুও এমন বিয়েও অনেক নারীর জন্য উত্তম বিকল্প হিসেবে নিরাপত্তা ও কল্যাণ এনে দিতে পারে। যেমন-

ক. একজন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যার দুই তিনটি সন্তান আছে: সন্তান ও নিজের জন্য একজন স্বামী তথা পুরুষ অভিভাবক দরকার। এ অবস্থায় কোন অবিবাহিত পুরুষ তাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তখন সে অবিবাহিত অবস্থার নিরাপত্তাহীন ও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকার চেয়ে কারো ২য় বা ৩য় স্ত্রী হতেও পছন্দ করবে।

খ. যেখানে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী: সেখানে সকল নারী যদি বৈষ্ণবী অথবা নান (ধর্মীয় সেবিকা) না হয়ে বিবাহিতা হতে চান তখন বহুবিবাহই তো গ্রহণযোগ্য সমাধান, যার মাধ্যমে সে অবৈধ পথে তার দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন পূরণ থেকে বিরত থেকে পরিবারের উষ্ণতা পেতে পারে।

এ দু'টো উদাহরণ তাত্ত্বিক নয় বরং রূঢ় বাস্তব। জীবনের কঠিন বাস্তবতা মোকাবেলা করতে গিয়ে যে সব মহিলাকে জীবনে নিরাপত্তা সম্মানের জন্য নিত্য সংগ্রাম অথবা অনৈতিক জীবন বেছে নিতে হচ্ছে তাদের দিকে তাকালে আর এসব বিধানকে অবাস্তব মনে হয় না।

## ৩. দ্বিতীয় বিবাহে ইচ্ছুক স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সুযোগ সমূহ

যদিও কোন মানুষের দ্বিতীয় বিয়ে করতে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি পূর্বশর্ত করা হয়নি এবং প্রথম স্ত্রীকেও এ ব্যাপারে কোন ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়নি তবুও এটা 'ইসলামী স্পিরিট নয় যে কেউ প্রথম স্ত্রীর সাথে কোন আলাপ না করে তাকে কোনভাবে না বুঝিয়ে তার অজ্ঞাতে দ্বিতীয় বউ ঘরে এনে তাকে অবাক করে দেবে। বস্তুত এটা ভীষণ অভদ্রতা।

এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর বাধাা দেবার অধিকার রয়েছে, যদি সে বিয়ের কাবিনে এই শর্ত আরোপ করে থাকে যে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। সব আইনবিদ একমত যে যদি স্বামী বিয়ের কাবিননামায় এমন শর্ত স্বাক্ষর করে তবে সে প্রথম স্ত্রীর অসম্মতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। এক্ষেত্রে অবশ্য তাকে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। প্রথম স্ত্রীর আরেকটি সুযোগ হচ্ছে, বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেবার একতরফা অধিকার দিয়ে দিবে এবং যখন ঐ স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করল এবং প্রথম স্ত্রী এতে সন্তুষ্ট নয়, তখন প্রথম স্ত্রী তালাকের জন্যে আদালতে যেতে পারে। এ অধিকারকে বলে 'আইসিমা (aisima)- বা বিচ্ছিন্ন হবার দায়িত্ব অর্পণ করা। (Delegated Repudiation)।

## ৪. যদি বিয়ে চুক্তিতে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা বা স্ত্রীর তালাকের অধিকার সম্পর্কে লিখা না থাকে সে ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর সুযোগ প্রসঙ্গে

কোন স্ত্রী যদি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে অসুখী হয় এবং বিয়ে চুক্তিতে লিখা না থাকায় আগে বর্ণিত ব্যবস্থাও নিতে না পারে তবুও সে স্বামীকে তালাকের উদ্যোগ নিতে পারবে। সে কাজীর কাছে গিয়ে স্বামীর বিয়েতে তার স্বার্থ, অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার অভিযোগ তুলে তালাক চাইতে পারে।

### ৫. যদি কাজী তালাকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে

কাজী তালাকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেও ইসলামী আইনমতে স্ত্রী স্বামীকে 'খোলা' তালাক দিতে পারে। এটা হচ্ছে যে কোন অবস্থায় নিঃশর্ত তালাক। স্ত্রী শুধু বলবে যে আমার পক্ষে তার ঘর করা অসম্ভব। অবশ্য খোলা তালাকে সে মোহরানা দাবী করতে পারবে না বা ফিরিয়ে দিবে।

### ৬. স্ত্রীর খোলা তালাক স্বামী মানতে বাধ্য কিনা

স্ত্রী স্বামীকে খোলা তালাক দিলে উক্ত স্ত্রীকে বিয়ে বন্ধন থেকে অব্যাহতি দিতে স্বামী বাধ্য এবং এ বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

### ৭. মেয়েদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কেন

মেয়েদের বহুবিবাহ পৃথিবীতে খুবই বিরল। ইসলাম বা অন্য কোন ধর্মে তো নেইই, এমনকি গোটা ইতিহাসে এমন উদাহরণ হাতে গোনা। বহুবিবাহে ছেলেদের অধিকারের বিষয়টি কুরআনে স্পষ্ট। (এতে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই উঠে না- অনুবাদক)

মেয়েদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হবার সম্ভাব্য কারণ ঃ

ক. একজন পুরুষ একই সাথে অসংখ্য মহিলার গর্ভে সন্তান দিতে পারে, কিন্তু একজন মহিলা বছরে মাত্র একটি সন্তানেরই জন্ম দিতে পারে। জীবজগতের এটাই বাস্তবতা। প্রতি সন্তানেরই পিতার প্রতি আকর্ষণ বা পিতৃপরিচয় জানার অধিকার আছে। একাধিক স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে সন্তানকে পিতৃপরিচয় স্পষ্ট করে দেয়া কঠিন।

খ. সাধারণতঃ প্রায় সব সভ্য জাতিতেই স্বামীই পরিবার প্রধান হয়ে থাকেন। যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকেন তবে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে পরিবার প্রধানের পদ নিয়ে।

গ. নারীর মনোদৈহিক গঠন থেকে এটাই দেখা যায় যে, নারীরা সাধারণতঃ সেক্সকে দৈহিক বিষয়ের চেয়ে মানসিক (emotional) অনুভূতির দিকে গণ্য করে এবং এজন্য তার সাধারণতঃ এককেন্দ্রিক। যে কারণে বলা যায় যে বহুগামীতা আসলেই নারীর স্বভাব বিরুদ্ধ। নারী মূলতঃ একজনকেই ভালবাসে, তাকে ঘিরেই তার স্বপ্ন ও কল্পনা আবর্তিত হয়।

### ৮. রুগ্ন বা বন্ধ্যা স্বামীর স্ত্রীর করণীয়

এ ব্যাপারে বন্ধ্যা বা রুগ্ন নারীর স্বামীর যা যা সুযোগ আছে তার সবই নারীর আছে, শুধুমাত্র বহুবিবাহের সুযোগ নেই। তার সুযোগসমূহ হচ্ছে−

ক. সে ধৈর্য্যের সাথে রুগ্ন স্বামীর সেবা করেই ঘর করতে পারে।

খ. রুগ্ন স্বামীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে (এ ক্ষেত্রে নারীর তালাকের পূর্ণ অধিকার আছে)।

**সূত্র নির্দেশিকা ঃ**

প্রশ্ন-৭ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৩, ৪ঃ১২৯

# জি- ৩৫ বহুবিবাহ ও ইসলাম- ৫ (নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ)

**প্রশ্ন ঃ**

১. বহুবিবাহের অসুবিধাগুলো কি?
২. বহুবিবাহের ক্ষতিকর ও কল্যাণকর দিকগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৩. মুসলিম বিশ্বে বহুবিবাহের প্রচলন কেমন?
৪. বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?
৫. বহুবিবাহের সুযোগের অপব্যবহার রোধে এর চর্চার ওপর আরো বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় কি?
৬. অমুসলিম সমাজে কি বহুবিবাহ প্রয়োজনীয় এবং চালু হতে পারে?
৭. এমন কোন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ আছেন কি যারা বহুবিবাহ প্রথা সমর্থন করেন?

**উত্তর ঃ**

**১. বহুবিবাহের অসুবিধাগুলো ঃ**

ক. **হিংসা-বিদ্বেষ :** কোন মেয়েই তার স্বামীর ভালবাসা, আকর্ষণ ও সম্পদে আর একজনের ভাগ বসানো সহজে মেনে নিতে পারে না। ফলে হিংসা বিদ্বেষের জন্ম হতে পারে।

খ. **অসমতা :** ইসলাম কঠোরভাবে স্ত্রীদের মধ্যে 'সমব্যবহার' করার কথা বলেছে। এই সমতা রক্ষা করতে আর্থিক এবং অন্যান্য দিকে পুরুষ ভীষণ বেকায়দায় পড়ে এবং অনেকেই শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করতে পারে না।

গ. **অশান্তি :** একই বাড়ীতে একাধিক স্ত্রীর উপস্থিতি স্ত্রীদের মাঝে এবং স্বামী-স্ত্রীতে নিত্য নানান ঝগড়ার জন্ম দেয়। এসব ঝগড়াঝাটি বিভিন্ন স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যেও আক্রান্ত করে।

কিছু সমস্যা সমাধানে ইসলাম সীমিত আকারে বহুবিবাহকে অনুমতি দেয়। এতে সন্দেহ নেই আর সব সুযোগের মত এরও অপব্যবহার হতে পারে। এসব অসুবিধে সত্ত্বেও কিছু বাস্তব সমস্যার সমাধান বহুবিবাহে পাওয়া যায়।

**২. বহুবিবাহের ক্ষতিকর ও কল্যাণকর দিকগুলোর তুলনামূলক আলোচনা**

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ সমাজগুলোতে এ সুযোগ না থাকায় যেসব অপরাধ ও সমস্যা হচ্ছে ইসলামী সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকায় তার চাইতে অনেক কম সমস্যা হচ্ছে। এর আগে বহুবিবাহের যেসব কারণগুলো আলোচনা করা হল তাতে দেখা যায় বহুবিবাহের যে সব বিকল্প আছে তার সবই মানুষকে হয় চরম কষ্ট নয়তো পাপের পথে ঠেলে দেয়। সেসব সমাজে ক্রমান্বয়ে নৈতিকতার অবাধ লঙ্ঘন শেষ পর্যন্ত পরিবার নামক ইনস্টিটিউটকেই বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত করে। মুসলমানরা একবিবাহের নামে এক স্ত্রী ঘরে রেখে আর অসংখ্য অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেয়ে বৈধভাবে স্ত্রীর স্বীকৃতি, অধিকার ও মর্যাদা

দিয়ে আর একজনকে ঘরে আনাই শ্রেয় মনে করে। কোন ধার্মিক মুসলিম মহিলাও স্বামীর পাপে জড়িত হবার চেয়ে দ্বিতীয় বিয়েকেই কম অপছন্দ করবে।

ইসলাম বহুবিবাহকে সবার জন্য সাধারণ বিষয় বলে ঘোষণা দেয়নি বরং কিছু সমস্যার নিরসনে একসাথে বাস্তবতা, নৈতিকতা ও মানবিকতার সমন্বয়ে সমাধান হিসেবে দেখিয়েছে।

## ৩. মুসলিম বিশ্বে বহুবিবাহের বর্তমান অবস্থা

পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রচারণায় মনে হয় মুসলিম সমাজ মানেই বহুবিবাহযুক্ত সমাজ, মুসলিম পরিবার মানেই চার স্ত্রীর সমাহার। এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা একভাগেরও কম বহুবিবাহের সুযোগ নিচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে এই সুযোগের এমন কোন যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে না যার জন্য এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে।

## ৪. বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে

দু-একজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন। তাদের এই প্রস্তাবনা দেখে মনে হয় পাশ্চাত্যের বহুবিবাহ ও ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণায় তারা অস্থির হয়ে আল্লাহর দেয়া আইন সম্পর্কে এই আপোষকামী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। যে সব বাস্তব কারণে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়, তা হচ্ছে ঃ

ক. ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মানুষ সরাসরি আল্লাহর দেয়া আইনকে বাতিল বা স্থগিত করতে পারে না। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মানুষের গোটা জীবনের সব কিছু বিবেচনা করেই মানুষের জন্য এই সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছেন। পাশ্চাত্যের প্রচারণায় লজ্জিত হয়ে এটা থেকে মুখ ফেরানো উচিত হবে না। আল্লাহ জানেন যে তালাক বা ব্যভিচারের চেয়ে এটা উত্তম।

খ. দুনিয়ার এক শতাংশেরও কম মুসলমানের মধ্যে বহুবিবাহ দেখা যায়। কাজেই এটা এমন কোন বিপদজনক সমস্যা নয় যার মোকাবেলায় এত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

গ. বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হবে এক নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। কারণ যেসব সমস্যার কারণে এই প্রথা চালু এটা নিষিদ্ধ হলে সেসব সমাধানে কোন বৈধ বা মানবিক পন্থা অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে নিষিদ্ধ করলে যেসব মানুষ এ ব্যবস্থায় সংযত থাকত তারা আর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে না। আর সমাজের এক অংশের পাপ ও ব্যভিচার ক্রমে গোটা সমাজকেই গ্রাস করবে।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মাত্র একটি 'মুসলিম' দেশে বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়েছে। এদেশের শাসক পাশ্চাত্যের এমন ধামাধরা যে সেখান থেকে যে বিধানই আসে তাই অবিকল অনুকরণ করে। এই নিষেধাজ্ঞার পরিণতি হয়েছে এই যে কেউ বৈধভাবে দ্বিতীয় বিয়ে করলে তার জেল হয় আর একই আদালতে কেউ ঘরে স্ত্রী রেখে হাজারো মহিলার সাথে ব্যভিচার করলেও বেকসুর খালাস পায়।

## ৫. বহুবিবাহের সুযোগের উপর বিধি নিষেধ আরোপ প্রসঙ্গে

মানুষের স্বভাবের প্রতি এক দয়া হিসেবে ইসলাম বহুবিবাহের সুযোগ দিয়েছে। আর সব সুযোগের মত বিবেকবর্জিত মানুষদের দ্বারা এর অপব্যবহার হতে পারে। এই সুযোগের অপব্যবহার রোধে ইসলামের সীমার মধ্যে আইনকে আরো কঠোর করতে ইসলামে কোন বাধা নেই। বস্তুত ইসলামই বহুবিবাহ প্রথার উপর কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করেছিল। যা হচ্ছে একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণের আর্থিক সামর্থ্য এবং সকল স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার। ইসলামের সীমার মধ্যে বহুবিবাহের অপব্যবহার রোধে আরও কঠোর শর্ত আরোপে কোন নিষেধ নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন মানুষকে কোনভাবে ব্যভিচারে উৎসাহী না করে। অনেক বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদ এর অপব্যবহার রোধে উদ্যোগী হয়েছেন। কেউ কেউ এমন সংশোধনী এনেছে যা দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনিয়ে বিচারকের কাছে দিয়েছে। তবে বাকী বিশেষজ্ঞরা (যেমন, শায়খ মুহাম্মদ আবু জাহরা) এই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ব্যক্তির বিবেচনায় রাখারই পক্ষপাতী।

## ৬. অমুসলিম সমাজে বহুবিবাহ চালু প্রসঙ্গে

যদিও অমুসলিমরা ইসলামে বহুবিবাহ প্রথার তুখোড় সমালোচক তবুও এই প্রথা তাদের সমাজের বহু নোংরামী, পাশবিকতা ও বিবাহ বিচ্ছেদকে কমাতে পারে। যেহেতু সব মানুষই একই প্রকৃতির একই প্রবৃত্তির এবং ইসলামের আইনও সবার জন্যেই সেহেতু এটা নৈতিকতা সংক্রান্ত সমস্যার বিশ্বজনীন সমাধান হতে পারে।

## ৭. বহুবিবাহের পক্ষের পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ

অনেক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী বহুবিবাহের পক্ষে বলেছেন। Annie Bessant বলেছেন, পাশ্চাত্যে বাহ্যিকভাবে এক বিবাহ চালু থাকলেও নেপথ্যে আছে দায়িত্বহীন বহুবিবাহের চর্চা (বহুগামীতা)। প্রফেসর Von Ernfeldt. প্রফেসর Havelog Ellis এবং R. landorff প্রমুখ বলেছেন বহুবিবাহকে অবশ্যই বৈধ ও স্বাভাবিক হিসেবে নিতে হবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ যেখানে স্বামীর একাধিক বিয়ের কোন সুযোগ নেই অথচ আরও এক বিয়ে প্রয়োজন তখন সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হতভাগা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়।

প্রশ্ন-৫ ঃ উনবিংশ শতকের শুরুতে প্রখ্যাত আলেম শেখ মোহাম্মদ আবদুহ ও তাঁর ছাত্র রশীদ রিযা বহুবিবাহের অপব্যবহারের সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।

শেখ মোহাম্মদ আবু জাহেরের চিন্তার প্রতিফলন হচ্ছে এরূপ: ১৯৫৩ সালে সিরিয়ায় আইন করা হয় যে বিচারক ইচ্ছে করলে কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি নাও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি ঐ ব্যক্তি আদালতের আদেশ অমান্য করে দ্বিতীয় বিয়ে করে তবে বিয়ে বৈধ থাকবে কিন্তু উক্ত ব্যক্তির আর্থিক জরিমানা হবে। এভাবে দ্বিতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির হাতেই থাকে।

# জি- ৩৬ দাম্পত্য সম্পর্ক- ১
## (স্ত্রীর অধিকার)

**প্রশ্ন ঃ**

১. বিয়ের মাধ্যমে মানুষ কি কি অধিকার ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়?

২. ইসলামে বিয়ের ধর্মীয় ভিত্তি কি?

৩. ইসলামে স্ত্রীর অধিকার কি কি?

৪. ভরণপোষণ বলতে কি বোঝায় এবং এর কুরআন ও হাদিসের ভিত্তি কি?

৫. ভরণপোষণের আইনে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে কি কি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে?

৬. ভরণপোষণের মধ্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবাও কি আসে?

৭. যদি স্বামী চাকুরীচ্যুতি বা ব্যবসায় লোকসানের কারণে স্ত্রীকে আগের মানে ভরণপোষণ না করতে পারে তবে কি হবে?

৮. কোন স্বামী কৃপণ হলে তার স্ত্রী কি তার অজ্ঞাতে তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে পারবে?

৯. কোন কোন পরিস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীর ভরনপোষণের অধিকার হারায়?

**উত্তর ঃ**

**১. বিয়ে থেকে উদ্ভুত অধিকার ও দায়িত্ব**

বিয়ের ফলশ্রুতিতে–

ক. বিয়ের পর স্ত্রীর মোহরানা পাওনা হয়।

খ. বিয়ের কাবিননামায় উল্লিখিত যে কোন শর্ত স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে মেনে চলতে বাধ্য।

গ. বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।

ঘ. স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ ভরণপোষণ পাওনা হয়।

ঙ. স্বামী-স্ত্রীর থেকে জন্মপ্রাপ্ত সকল সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়।

চ. বিয়ের পর স্ত্রীর মা এবং একই ধরনের আত্মীয়রা স্বামীর জন্য মাহরিম হয়ে যায়।

এসব বিষয় ছাড়াও যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিয়ের পরও স্ত্রীর পৃথক ব্যক্তিসত্ত্বা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বহাল থাকে। তার নাম পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন হয় না। সে যদি ইহুদি বা খ্রীস্টান হয় তবে তার ধর্ম পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়না। সে যদি স্বামীর মাযহাব থেকে ভিন্ন মাযহাবের হয় তাহলে তার মাযহাব পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না। তার পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা থাকে। সে যে কোন আর্থিক চুক্তি বা অন্য যে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে এবং সম্পদের অধিকারী হতে পারে।

## ২. ইসলামে বিয়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি

বিয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর উপর যেসব দায়িত্ব এসে পড়ে ইসলামে তার শুধু আইনগত ভিত্তিই নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিও আছে। এসব আইন আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকেই উৎসারিত। এই নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস বলে ঃ

ক. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহর দাসত্বের কথা সর্বাগ্রে মনে রাখবে। পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনই তাদের মূল দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্যই নারী পুরুষ একে অপরকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। বিয়ে বন্ধন বিশেষভাবে দু'জন মানুষকে এই সহযোগিতার সুযোগ এনে দেয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে চলতে সাহায্য ও সমর্থন করবে। কুরআন নির্দিষ্ট ভাবেই বলেছে যে মোমেন মোমেনা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারী।

খ. কুরআনে বিয়েকে এক পবিত্র বন্ধন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই কেউই যেন এই বন্ধনকে হালকা ভাবে না দেখে।

গ. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিয়েকে আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটা এমন এক বন্ধন যা ভালবাসা, সহানুভূতি আর সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। যেমন সুরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জন্য পোশাক'। এখানে এক সুন্দর উপমার মাধ্যমে বিবাহিত জীবনের মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। পোশাক যেমন মানুষকে সুন্দর করে তেমনি বিয়ে মানুষের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়ে তাকে সুন্দর করে। বিয়ে মানুষকে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দেয় যেমন পোশাক মানুষকে শীত থেকে গরম করে প্রশান্তি দেয়। পরনের পোশাক যেমন মানুষের সবচে কাছের তেমনি পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সবচেয়ে কাছের। বিয়ে মানুষকে অবৈধ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে যেমন পোশাক আশপাশের ধুলো-ময়লা থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। পোশাক যেমন শরীরের যে কোন দাগকে আড়াল করে রাখে তেমনি বিয়ে স্বামী স্ত্রীর দোষ ত্রুটিকে আড়াল করে রাখে।

রাসূল (সঃ) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি, তখন তার উত্তরে তিনি বললেন, "পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ এমন জিহ্বা যা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে, এমন হৃদয় যা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং বিশ্বাসী ধার্মিক স্ত্রী যে তার স্বামীকে ঈমান রক্ষা করতে সাহায্য করে"।

## ৩. স্ত্রীর অধিকার

আইনবিদরা স্ত্রীর অধিকারকে দু'ভাগে ভাগ করেছে–

ক. আর্থিক অধিকার- ভরণপোষণ ও অন্যান্য;

খ. ব্যবহারিক অধিকার- স্বামীর কাছ থেকে সুব্যবহার ও সহানুভূতি।

## ৪. কুরআন হাদিসের দৃষ্টিতে ভরণপোষণ

এটা ইসলামের মূলনীতি যে স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক তার পূর্ণ ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর। কুরআন ও হাদিসে এই মূলনীতিই ঘোষিত হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানের পূর্ণ ভরণপোষণ স্বামীর জন্য কোন দয়া দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়; এটা তার দায়িত্ব। ইসলামী আইন মতে সংসারে স্বামী-স্ত্রী সকল বিষয়ে পরস্পরকে সহায়তা করবে কিন্তু আর্থিক দায়িত্বটা পুরুষের একারই, তবে স্ত্রী চাইলে সে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারে।

## ৫. ভরণপোষণের আওতায় যে সব বিষয় আসে ঃ

ক. **আবাস ঃ** স্বামী তার সামর্থ্যের মধ্যে স্ত্রীর জন্য উপযুক্ত আবাসের ব্যবস্থা করবে। এমন বাসস্থানের ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য হবে এই যে সেটা স্ত্রীর জন্য নিরাপদ, আরামদায়ক হবে এবং তাতে তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের অনুমতি ছাড়া তার কোন আত্মীয়কে বাড়িতে রাখতে পারবে না। স্বামী এমন কোন আত্মীয়কে রাখতে পারবে না যে তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়।

খ. **খাদ্য ঃ** স্বামী সমাজে প্রচলিত মানের খাবার স্ত্রীর জন্য নিশ্চিত করবে।

গ. **পোশাক ঃ** এ ব্যাপারে ন্যায়সংগত পোশাকের বর্ণনা সূত্রে উল্লিখিত আছে।

ঘ. **সাহায্যকারী ঃ** এ ব্যাপারে অনেক আইনবিদ একমত যে সংসারের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য স্বামী কোন লোক রাখবে; বিশেষতঃ স্ত্রী যদি এ কাজে অনভ্যাসবশত অথবা অসুস্থতার জন্য অপারগ হয়।

## ৬. স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসাও ভরণপোষণের মধ্যে পড়ে। কারণ এটাকে বাদ দিয়ে ভরণপোষণ পূর্ণ হয় না। কুরআন বা হাদিসে এমন কোন উদ্ধৃতি নেই যাতে মনে হয় এ দু'টো ভরণপোষণের মাঝে পড়ে না।

## ৭. স্বামী ভরণপোষণে অক্ষম হলে স্ত্রীর করণীয়

এমন অবস্থায় স্ত্রী দু'টো কাজের যে কোন একটি করতে পারে : হয় সে স্বামীর সাথে থেকে তার দারিদ্র্যকে ভাগ করে নেবে; না হয় সে তালাক চাইবে। এর বাইরে হানাফী আইনবিদরা বলেন যে, এসময় স্ত্রী তার অভিভাবক বা নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে সাময়িকভাবে তার ভরণপোষণ নিতে পারে। অথবা সে তাদের কাছ থেকে টাকা ধার এনে স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। এই ধার পরে স্বামীকে শোধ করতে হবে।

জাহিরি মতবাদের আইনবিদরা বলেন, এমন অবস্থায় স্ত্রী তার সম্পদ থেকে স্বামীকে সাহায্য করবে, কারণ তালাকের চেয়ে এটা উত্তম। তারা আরও বলেন যে, এ ক্ষেত্রে স্বামীর ঐ সাহায্য ফেরৎ দেবার প্রয়োজন নেই।

যদি স্বামী বিয়ের সময় তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলে এবং স্ত্রীর চাহিদা সম্পর্কে উদাসীন থাকে তবে স্ত্রী তালাক চাইতে পারে।

## ৮. কোন স্ত্রীর স্বামী কৃপণ হলে

রাসূল (সঃ)-এর কাছে একবার আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এসে অভিযোগ করল যে, তার স্বামী পরিবার চালাতে পর্যাপ্ত অর্থ দেয় না। এ অবস্থায় সে 'আবু সুফিয়ানের তহবিল থেকে গোপনে টাকা খরচ করে, তখন রাসূল (সঃ) হিন্দাকে এভাবে টাকা সরাবার অনুমতি দিয়ে বলেন যে, সে যেন তার বৈধ প্রয়োজনের বেশী না নেয়। রাসূলের এই অনুমোদন ইসলামের এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কেউ তার বৈধ পাওনা আদায়ে নিজ হাতে ব্যবস্থা নিতে পারে। এছাড়া কারো কৃপণ স্বামীকে পথে না আনা গেলে স্ত্রী আদালতে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালত স্ত্রীর ভরণপোষণের পরিমাণ সাব্যস্ত করে দেবে।

## ৯. যে সব অবস্থায় স্ত্রী ভরণপোষণের অধিকার হারায়

এ ব্যাপারে আইনবিদরা একমত যে যদি কোন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য বা বিদ্রোহী হয় তবে সে ভরণপোষণের অধিকার হারাবে; বিশেষভাবে যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া গৃহত্যাগ করে অন্যত্র থাকে, অথবা তার অজ্ঞাতে কোথাও বেড়িয়ে এসে তার খরচ বহন করতে বলে। এমন সব প্রেক্ষিত ছাড়া আর সব অবস্থাতেই স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৯ঃ৭১, ৪ঃ২১, ১৬ঃ৭২, ৭ঃ১৮৯, ৩০ঃ২১, ২ঃ১৮৭

রাসূল (সঃ) বলেন, "জীবনে কিছু সুখ আছে, তবে সবচে বড় সুখ হল ভাল এবং ধার্মিক স্ত্রী"।

প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৩৪

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ৬৫ঃ৬

ইসলামী আইন স্ত্রীকে ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণ দিতে বলে। কেউ যদি ধনী হয় তবে তার স্ত্রীকে রেশমী পোশাক দেয়া তার দায়িত্ব আর গরীব হলে সূতী বস্ত্র দিলেও তার দায়িত্ব পূর্ণ হয়।

# জি- ৩৭ দাম্পত্য সম্পর্ক- ২
## (স্ত্রীর অধিকার)

**প্রশ্ন ঃ**

১. আর্থিক অধিকারের বাইরে স্ত্রীর আর কি কি অধিকার আছে?

২. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুব ভাল না হলেও স্ত্রীর এসব অধিকার বহাল থাকে কি?

৩. হিংসা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৪. মুসলিম স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে বলুন?

৫. উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরের আলোকে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন?

**উত্তর ঃ**

### ১. আর্থিক অধিকার ছাড়া স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার

ইসলামে আর্থিক অধিকারের চেয়েও ব্যবহারিক ও অন্যান্য অধিকার বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে সকল আর্থিক সুবিধা দিয়ে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে চলবে না। স্ত্রীকে সম্পত্তির মত বিবেচনা করা যাবে না, তার মানবিক দিক দেখতে হবে। ইসলামী মতে বিয়ে শুধু খাদ্য পানীয়ের পার্টনারশীপ নয়, এটা এমন এক পার্টনারশীপ যাতে অনুভূতি, আবেগ, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা- সব ভাগ করে নিতে হয়। কুরআন এবং হাদিসে এর পক্ষেই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল (সঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বড় ঈমানদার যার চরিত্র ব্যবহার ভাল এবং তোমাদের মাঝে সেই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম"। তাঁর নিজের জীবনে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে তাদের সকল অধিকার নিশ্চিত করে রাসূল (সঃ) বিশ্বজনীন অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের সব সুখ তাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন। সব সময় তাদের প্রতি কোমল ছিলেন, কখনও তাদের আঘাত দিয়ে কিছু বলেননি। "যখন তুমি খাবে তখন তাদেরও একই খাবার খাওয়াবে, তুমি যেমন পোশাক পড়বে তেমন পোশাক দেবে, তাদের কখনও অপমান করবে না, তাদের অপবাদ দেবে না এবং তাদের কাছ থেকে দূরে যাবে না...।"

### ২. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক না থাকলে স্ত্রী অধিকার প্রসঙ্গে

স্ত্রীর পাওনা ব্যবহারিক অধিকার বলতে ইসলাম এক মানদণ্ড দেয় যা অর্জন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান সর্বোচ্চ সাধ্য প্রয়োগ করবে। যদি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপও হয় তবু স্ত্রীর এসব পাওনা নিশ্চিত করতে স্বামীর চেষ্টা করা উচিৎ, কারণ ঃ

ক. এটা ইসলামের এক মৌলিক শিক্ষা যে ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগার অনুভূতির

উর্ধ্বে সকল মানুষের মধ্যে ন্যায়নীতি ও সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই আইন আরও জোরালো ভাবে কার্যকর।

খ. কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। কাজেই কোন স্বামীরই স্ত্রীর ভুলত্রুটির ব্যাপারে বেশী খুঁতখুঁতে না হয়ে নিজের ভুলের দিকে দেখা উচিৎ।

গ. রাসূল (সঃ) বলেন, "কোন মুমীন যেন তার স্ত্রীকে ঘৃণা না করে, যদি তার কোন কাজ তার (স্বামীর) অপছন্দ হয় তখন সে যেন তার (স্ত্রীর) ভাল কাজের কথা মনে করে"। ইসলাম এ শিক্ষাও দেয় যে, মুসলিম নারী-পুরুষ যেন তাদের ভবিষ্যৎ স্বামী বা স্ত্রীকে 'স্বপ্নের মানুষ' হিসেবে ভুলের উর্ধ্বে মনে না করে: জীবন সাথী সম্পর্কে অতি বড় আশা করে থাকলে স্বামী বা স্ত্রী কেউই তার সাথীর গ্রহণযোগ্য ভুলত্রুটিকেও ক্ষমা করবে না; এবং এটা সঠিক নয়।

ঘ. যদিও সিনেমা, নাটক ও উপন্যাসে বিয়েকে বেশী রোমান্টিক ও খুব সহজ বলে মনে হয়, বাস্তবে সুখের সংসার করতে হলে রোমান্সের চেয়ে পরস্পরকে সদয় ভাবে বোঝা ও মানিয়ে চলার অভ্যাস বেশী জরুরী।

### ৩. সন্দেহ প্রবণতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সন্দেহপ্রবণতার মানে যদি এই হয় যে স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ তার জীবনসাথীকে কারো সাথে অসৎ সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত রাখে তবে সেই অর্থে এটা ভাল। আর যদি এর মানে এই হয় যে, একে অপরের প্রতি বেশী অধিকারবোধ খাটাচ্ছে তবে তা বর্জনীয়। প্রথম ধরনের সতর্কতার ব্যাপারে রাসূল (সঃ) বলেন যে, তিন ধরনের লোক বেহেশতে যাবে না তার মধ্যে একজন হচ্ছে যে তার স্ত্রীর (বা স্বামীর) অপরের সাথে অবাধে মেলামেশা সম্পর্কে উদাসীন।

আবার একই সাথে রাসূল (সঃ) সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে আল্লাহ চান শালীনতার বিষয়ে সবাই তার স্ত্রী (বা স্বামীর) সম্পর্কে সচেতন থাকবে। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ পুরুষকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন যারা ঘর থেকে দূরে থাকে তারা যেন স্ত্রীদের সন্দেহ না করে।

### ৪. মুসলিম স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার

দৈহিক মিলনের সময় স্বামীর কাছ থেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভের অধিকারও সব মহিলার আছে। আইনবিদরা এ ব্যাপারে একমত যে এখানেও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব স্বামীর রয়েছে। রাসূল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবারা এ বিষয়ে কোন কুসংস্কারে ভোগেননি। এসব বিষয়কে আলোচনা বহির্ভূত বা গোপনীয় বা লজ্জার বলে এড়িয়ে যাননি। যার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর জীবনে। রাতে তিনি নাগরিকদের অবস্থা দেখতে বেরুতেন। এক রাতে এক বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি একজন মহিলা তার একাকীত্বের জন্য কাঁদছেন। তিনি তদন্ত করে জানলেন যে মহিলার স্বামী যুদ্ধে

যাবার কারণে অনেক মাস অনুপস্থিত। ওমর (রাঃ) তাঁর কন্যা হাফসা (রাঃ)-এর কাছ থেকে জানলেন যে একজন মহিলা সর্বোচ্চ চার মাস স্বামী সংগ ছাড়া ভাল থাকতে পারেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আইন জারী করলেন যে, যুদ্ধ বা ব্যবসা যে কোন উদ্দেশ্যেই কেউ বাড়ী থেকে চার মাসের বেশী অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

আরেকবার একজন মহিলা ওমর (রাঃ)-এর কাছে নালিশ করেন যে, তাঁর স্বামী এত ধার্মিক যে প্রতিদিন রোযা রাখেন এবং সারারাত নফল নামাজ পড়েন। এদিকে স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত রাখেন। ওমর (রাঃ)-এর সাথী কাব আল আসাদ (রাঃ) মহিলার সমস্যা বুঝলেন। তিনি মহিলার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন সর্বোচ্চ পর পর তিনদিন এরূপ এবাদত করার জন্য এবং চতুর্থ দিনটি অবশ্যই স্ত্রীর জন্য সংরক্ষিত রাখতে।

## ৫. এসব ঘটনার আলোকে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এসব ঘটনা এই উদাহরণই দেয় যে দাম্পত্য মিলন সংক্রান্ত বিষয়াদি ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনার বাইরের কোন বিষয় নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক মানসিক, দৈহিক সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর নেয়ামত। এই কারণেই রাসূল (সঃ) বলেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রতিবার মিলনের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। কারণ তারা আল্লাহ নির্ধারিত পন্থায় আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করছে। তিনি আরও কিছু ভদ্রতা শিক্ষা দেন যা এটাকে আরও সফল ও অন্তরঙ্গ করে। তিনি বলেন, স্বামীরা কোমলতার সাথে স্ত্রীদের কাছে যাবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যে তাদের মিলনে যদি কোন সন্তান জন্ম হয় তবে যেন সে শয়তান থেকে রেহাই পায় এবং স্ত্রীরও পরিতৃপ্তির দিকে খেয়াল রাখবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ৪ঃ১৯

রাসূল (সঃ) বলেন, "আমি তোমাদের নারীদের প্রতি দয়ালু ও বিবেচক হতে আদেশ করি।" তিনি আরও বলেন, "উত্তম চরিত্রের সেই যে মেয়েদের প্রতি ভাল, আর মন্দ লোকেরাই তাদের অপমান করে।" তার নিজের জীবনে দেখা যায় তিনি কত স্বাভাবিকভাবে বিবেচনার সাথে তাঁর স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার করতেন। একবার বিবি আয়েশাকে তাঁর বান্ধবীদের সাথে পুতুল খেলতে দেখে তিনি নিজেও তা আনন্দের সাথে উপভোগ করলেন। আরেকবার তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন।

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৫ঃ৯

রাসূল (সঃ) মুসলমানদের তাদের স্ত্রীদের রাগ-বিরাগ সম্পর্কে সহনশীল হতে বলেন। শক্তি প্রয়োগে তাদের পরিবর্তনের চেষ্টা করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মত, অতএব তাদের প্রতি দয়ালু ও বিবেচক হও।" (অর্থাৎ মেয়েরা এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির এবং তা অযাচিতভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করলে বাঁকা হাড়কে শক্তি প্রয়োগে যেমন ভেঙে যাবে- সেরকম ক্ষতি হতে পারে নারীর ব্যক্তিত্বে। এতে নারীদের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন- তা আমাদের অনুধাবন করা উচিত- অনুবাদক)।

# জি- ৩৮ দাম্পত্য সম্পর্ক- ৩ (জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)

**প্রশ্ন ঃ**

১. যদি কোন স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক না রাখে বা রাখতে অক্ষম হয় সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর কি অধিকার থাকে?

২. জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৩. কোন সব ক্ষেত্রে ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণকে বৈধ করে?

৪. গর্ভপাতের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

৫. টেস্টটিউব সন্তান এবং গর্ভভাড়া প্রদান (Surrogate Motherhood) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ক. যদি কোন নারীর ফেলোপিয়ান টিউবে সমস্যার কারণে জরায়ুতে ডিম্ব প্রবেশ করতে না পারে তবে সে কোন কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে কি?

খ. স্পার্ম ব্যাংক থেকে স্পার্ম নিয়ে কোন দম্পতি সন্তান নিতে পারে কি?

গ. Surrogate Motherhood (অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণ) ইসলাম অনুমোদন করে কি?

**উত্তর ঃ**

**১. যদি কোন স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক না রাখে বা রাখতে অক্ষম হয়**

নারীর প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণ তার ইসলাম স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। কোন স্বামী স্ত্রীর এ অধিকার পূরণ না করলে ইসলাম কঠোর ভূমিকা দেয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবে 'ইলা' নামে এক রীতি প্রচলিত ছিল, তাতে স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার জন্য স্বামী তার সাথে দৈহিক মিলন না করার প্রতিজ্ঞা করত। এভাবে মাসের পর মাস এমন কি কয়েক বছর চলে যেত। স্ত্রী তালাকের অধিকারও পেত না। ইসলাম এই প্রথা রদ করে। ইসলাম বলে যে কেউ কোন কারণে সর্বোচ্চ চারমাস স্ত্রীকে সঙ্গ বঞ্চিত রাখতে পারবে। এর বেশী সময় হলে স্ত্রী তালাক নিতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন চার মাসের পরও স্বামী স্ত্রীকে সঙ্গ না দিলে অথবা তালাকের সুযোগ না দিলে তাকে জেলসহ অন্যান্য শাস্তি দিতে হবে।

**২. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ**

জন্মনিয়ন্ত্রণ কথাটি আজকাল বেশ চালু। মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে মানুষের জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জন্মনিয়ন্ত্রণের সব ব্যবস্থা নেবার পরও অনেকসময় কন্ট্রাসেপ্টিভ ফেইলিউর এটারই প্রমাণ দেয়। সাধারণভাবে ইসলাম জন্মে উৎসাহই দেয়। রাসূল (সঃ) বলেন যে, মুসলিমরা 'বিয়ে করবে এবং সন্তান জন্ম দেবে'। ম্যালথাস এর মতবাদ উদ্ভুত ভীতি যে, মানুষের অত্যধিক জন্ম এক সময় পৃথিবীতে মানুষের দাঁড়াবার জায়গাও কেড়ে নেবে। এমনটি ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করেন না। আল্লাহ মুমিনদের নিশ্চিত করেছেন যে তিনি সবার রিযিক (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা) দেবেন। এজন্যে রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসেবে জন্মনিয়ন্ত্রণকে নেয়া ইসলাম সমর্থন করেনা। তবে ব্যক্তিগত

পর্যায়ে এর সংগত ব্যবহারকে অনুমতি দেয়। রাসূল (সঃ)-এর সময় প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে তিনি নিষেধ করেননি। অবশ্য রাসূল (সঃ) বলেছিলেন যে কেয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্ম হবার তা হবেই। কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না।

অল্পসংখ্যক, যারা ঢালাওভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বলেন তারা দু'টো যুক্তি দেন- ক. তারা একে দায়িত্বজ্ঞানহীন, অযৌক্তিক কাজ মনে করেন এবং খ. তারা একে শিশু হত্যার মতই মনে করেন। তাদের প্রথম যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় এজন্যে যে অনেক পরিস্থিতিতে অনেক দম্পতির জন্য এটা আবশ্যক হতে পারে। কাজেই এর সুযোগ বন্ধ করা ঠিক না। দ্বিতীয় যুক্তি এজন্যে গ্রহণযোগ্য নয় যে জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য, ডিম্ব নিষিক্তকরণ (Conception) বন্ধ করা। কাজেই এখানে 'হত্যার' প্রশ্ন আসে না। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব পদ্ধতি নিষিক্ত ডিম্ব (জাইগোট)-এর অপসারণ ঘটায় তার সবই হারাম (যেমন এম, আর)। যেসব পদ্ধতি ডিম্ব উৎপন্ন হতে দেয়না (যেমন- পিল), অথবা ডিম্বানু ও শুক্রানুর মিলন হতে দেয়না (যেমন- কনডম), ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ৩. যে সব ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ সঙ্গত

ক. মায়ের জীবন রক্ষার্থে- যদি গর্ভধারণে মহিলার মৃত্যুর শংকা থাকে তবে তার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ অনুমোদিত।

খ. যদি সম্ভাব্য শিশুর বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্মের নিশ্চিত আশঙ্কা থাকে।

গ. রাসূল (সঃ)-এর ভাষ্যমতে কোন স্তনদানরত মহিলার বাচ্চার দুধপানের বয়স শেষ না করে সন্তান ধারণ না করাই শ্রেয়। এবং ইসলামে এ সময়কে দুই বছর বলে মত রয়েছে।

ঘ. দারিদ্র্য এবং অনটন। যদিও আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন যে তিনি সবার রিযিক দেবেন। এই ছাড় শুধু তাদের জন্য যাদের ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের ভরনপোষণই দুঃসাধ্য হচ্ছে।

ঙ. আরও কিছু ব্যক্তিগত কারণ- যেমন স্ত্রী মা হবার পূর্বে লেখাপড়া শেষ করতে চাইছে বা এমন কিছু।

সর্বোপরি এটা প্রত্যেকের বিবেকের সাথে সমঝোতার বিষয়। আর এটা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথ সিদ্ধান্ত হতে হবে।

## ৪. গর্ভপাত প্রসঙ্গে ইসলাম

গর্ভপাত ইসলামে হারাম; তবে শুধু যেখানে মায়ের জীবন বিপন্ন হবার শংকা থাকে সেখানে এই আইন শিথিলযোগ্য। বর্তমানের কয়েকজন আইনবিদ আরও বলেন যদি আসন্ন সন্তান বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হবার আশংকা থাকে তাহলেও গর্ভপাত অনুমোদিত যদিও এটা বেশিরভাগের মত নয়। এমন কিছু করতে হলে তা অবশ্যই ১২০ দিন পুরো হবার আগে করতে হবে। কারণ ১২০ দিনের পর গর্ভপাত স্পষ্টভাবে হারাম। সব ক্ষেত্রেই গর্ভপাত ঘৃণ্য বিষয়। কারণ জীবনের শুরু ডিম্ব নিষিক্তকরণ থেকেই। (যদিও বলা হয় যে ১২০ দিন পর রুহ সঞ্চার হয়।)

## ৫. টেস্ট টিউব সন্তান ও অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণ প্রসঙ্গে

তিন ধরনের সমস্যায় টেস্ট টিউব সন্তান ও অন্যের গর্ভে সন্তান নেয়া হয়। সমস্যা তিনটি এবং তা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা যাক।

ক) স্বামী স্ত্রী উভয়েই শুক্র ও ডিম্ব উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু কোন কারণে স্বাভাবিক নিয়মে তা নিষিক্ত হচ্ছে না। এ অবস্থায় উভয়ের জনন কোষ সংগ্রহ করে টেস্ট টিউবে নিষিক্ত করে তা আবার স্ত্রীর গর্ভে স্থাপন করা হয়।

খ) স্বামীর বন্ধ্যাত্বের কারণে স্পার্ম ব্যাংক থেকে অন্যের শুক্র নিয়ে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার করা হয়।

গ) স্ত্রীর জরায়ু সন্তান ধারণে (Implantation) অক্ষম হলে স্বামী-স্ত্রীর নিষিক্তকৃত ডিম্ব অন্য কোন মহিলার জরায়ুতে স্থাপন করে বাচ্চা জন্ম পর্যন্ত বড় করা হয়।

**সমস্যা-ক)** এক্ষেত্রে আইনবিদরা বলেন যেহেতু স্বামী এবং স্ত্রীর জনন কোষের মিলনে সন্তান জন্ম হচ্ছে সেহেতু এটা ইসলাম সম্মত।

**সমস্যা-খ)** অধিকাংশ আইনবিদ এটাকে অনৈসলামী বলেন। কারণ প্রথমতঃ এটা প্রায় ব্যভিচারের কাছাকাছি; এবং দ্বিতীয়তঃ সন্তানের পিতৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন।

**সমস্যা-গ)** এটা খুব বিতর্কিত বিষয়। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী এটাকে অনৈসলামিক বলেছেন নিম্নলিখিত কারণে–

(i) এটা মাতৃত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অর্থকে নষ্ট করে। মায়ের গর্ভে সন্তানের বড় হওয়া, তার পুষ্টি থেকে পুষ্টি নেয়া, তীব্র কষ্ট নিয়ে সন্তান জন্ম দেয়া– এসবই মাতৃত্বকে মর্যাদা দেয়। আর এটাই এখানে উপেক্ষিত।

(ii) আইনতঃ ইসলামে সন্তানের মা সে যে জন্ম দেয় ও স্তন দেয়।

(iii) এটা বাচ্চা গর্ভে নেয়াকে ব্যবসায় পরিণত করবে।

(iv) যদি গর্ভদানকারী মহিলা বাচ্চার মাতৃত্ব দাবী করে তবে তীব্র আইনগত এবং মানবিক সমস্যা দেখা দিবে। তাঁর কাছ থেকে সন্তানকে দূরে নেয়া অমানবিক হবে।

(সম্প্রতি বৃটিশ কোর্ট এমন মামলার রায়ে সন্তান গর্ভধারণকারীনিকে সন্তানের মা বলে রায় দিয়েছেন– অনুবাদক)।

### সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ২ঃ২২৬

প্রশ্ন-২ ঃ সহীহ হাদিসে দেখা যায় যে, সাহাবারা রাসূলের কাছে আযলের (একটি বিশেষ ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি) অনুমতি চান। তিনি তাদের নিষেধ করেননি তবে বলেন যে, "আল্লাহ যাকে জন্ম দিতে চান তার জন্ম হবেই।"

প্রশ্ন-৩ ঃ আল গাযালী বলেন, সব গর্ভপাতই অন্যায়। যখন একটি ভ্রুন মাংসপিন্ডের মত তখনও, তারচেয়েও বড় অন্যান্য যখন ১২০ দিনের। আর জন্মের সময় শিশু হত্যা তো মহাপাপ।

প্রশ্ন-৪ ঃ 'Contemporary Versicts; আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী।

# জি-৩৯ দাম্পত্য সম্পর্ক-৪
## (স্বামীর অধিকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)

**প্রশ্ন ঃ**

১. এমন কোন অবস্থা আছে কি যে অবস্থায় Surrogate Motherhood গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে?

২. যদি পছন্দমত ছেলে বা মেয়ে সন্তান নেয়া যায় সেক্ষেত্রে ইসলামের কোন বিধি নিষেধ থাকবে কি?

৩. ইসলামী আইনে স্বামীর অধিকার কি কি?

৪. কিসের ভিত্তিতে স্ত্রীর স্বামীকে সম্মান করা উচিৎ?

৫. চতুর্থ সূরার ৩৪ নং আয়াতের অনুবাদে 'কাওয়ামুন' শব্দের অর্থ কি 'উত্তম' বা 'শ্রেষ্ঠ' করা যায়,'?

**উত্তর ঃ**

**১. জরায়ু ভাড়া প্রদান বা অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণ (Surrogate Motherhood) প্রসঙ্গে**

যারা মনে করেন যে কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণের অনুমোদন ইসলামে রয়েছে তারা ইউসুফ আল কারযাভীর একটি উদ্ধৃতি দেন। তারা বলেন Contemporary Verdicts গ্রন্থে আল্লামা ইউসুফ অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণের কতগুলো পূর্বশর্ত দিয়েছেন। তারা ভুলে যান যে যদি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এটা চালু হয়ে যায় তবে তার ক্ষতিকর দিক কমাতে তিনি এসব পূর্বশর্ত দিয়েছেন। এসব পূর্বশর্ত নিম্নরূপ ঃ

ক) অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণকারী মহিলা বিবাহিতা হতে হবে। অন্যথায় তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে (তার বিয়ের সম্ভাবনা নষ্ট হতে পারে– অনুবাদক)

খ) অন্যদের সন্তান গর্ভে ধারণের ব্যাপারে তার স্বামীর অনুমোদন লাগবে, কারণ এতে তাদের পারিবারিক জীবন ব্যাহত হতে পারে।

গ) বন্ধ্যা দম্পতির ভ্রূণ গর্ভ স্থাপনের পূর্বে তাকে তিন মাস নিজের স্বামীর সঙ্গ বর্জন করতে হবে, যাতে গর্ভের সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ থাকা যায়।

ঘ) পুরো গর্ভকালীন সময় ভ্রূণ-এর পিতা গর্ভধারণকারী মহিলার পুরো ভরণপোষণ করবে।

ঙ) এমন কারো গর্ভে সন্তান রাখা যাবে না যারা ভ্রূণ-এর পিতার মাহরিম আত্মীয়া। আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী মুসলমানদের এ ধরনের চর্চায় জড়িত না হতে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন এটা ইসলাম সম্মত নয় এবং পরিত্যাজ্য।

## ২. ইচ্ছেমত ছেলে বা মেয়ে সন্তান নেয়া প্রসঙ্গে

বিজ্ঞানীরা পশুর উপর পরীক্ষা চালাচ্ছেন নির্দিষ্ট লিঙ্গের ভ্রুণ তৈরির জন্য। এখনও মানুষের উপর এর পরীক্ষা হয়নি। তত্ত্বগতভাবে এটা সম্ভব যে, বিজ্ঞানীরা X বা Y ক্রোমজোমবাহী বা স্পার্মকে চিহ্নিত করে সেটিকে দিয়েই ডিম্বানু নিষিক্ত করে ছেলে সন্তানের বা মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয়া। এক্ষেত্রে মুসলমানদের জবাব হবে যে এভাবে ভ্রুণ-এর লিঙ্গ নির্দিষ্টকরণের চেষ্টায় 'আল্লাহর একক সৃষ্টি ক্ষমতার' কোন হ্রাস পাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা কোন কিছু সৃষ্টি করছেন না। কুরআন তো বলেই দিয়েছে যে কেউ এককভাবে কোন মশা, মাছিও তৈরি করতে পারবে না। কুরআন আরও বলেছে যে আল্লাহ কাউকে শুধু কন্যা দান করেন, কাউকে শুধু পুত্র আবার কাউকে পুত্র কন্যা দু'টোই অথবা কাউকে নিঃসন্তান রাখেন।

কাজেই বিজ্ঞানীদের এসব কাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কোন ক্ষয় হচ্ছে না। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। অনেকে বলেন গর্ভস্থ ভ্রুণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা যাবে না। তারা ঐ আয়াতের উদ্ধৃতি দেন যেখানে বলা হয়েছে যে, 'একমাত্র আল্লাহই জানেন গর্ভের ভেতরে কি আছে'। এখানে বোঝা দরকার যে মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বড়জোর গর্ভস্থ ভ্রুণের লিঙ্গ এবং অন্যান্য কিছু শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। আল্লাহ তো জানেন সেই ভ্রুণের ভাগ্য, চরিত্র, কবে কি অবস্থায় সে মারা যাবে, ইত্যাদি সব। কাজেই সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয়ের চেষ্টাও অনৈসলামী বলার যুক্তি নেই।

উত্তম এসব বিষয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠিত না হয়ে ছেলে বা মেয়ে যাই আল্লাহর উপহার হিসেবে আসে তার উপর সন্তুষ্ট থাকা

## ৩. ইসলামে স্বামীর অধিকার

স্ত্রীর কাছে পাওনা স্বামীর অধিকার রাসূলের (সাঃ) এই হাদিসে পাওয়া যায়, "সবচে উত্তম নারী সেই স্ত্রীলোক যার দিকে তাকালে তোমার নয়ন জুড়ায়, তাকে কিছু করতে বললে সে তা করে এবং যখন তুমি দূরে যাও তখন সে তার সতীত্ব ও স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করে।" এ হাদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে স্বামীর যেমন স্ত্রীর প্রতি কোমল হতে হবে সম্মান ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে, তেমনি স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি তা একনিষ্ঠ হতে হবে। তাকে সেভাবে ভালবাসতে হবে। তার কল্যাণ ও সুখের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য সুখ ও প্রশান্তি অর্জন সেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজেদের পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তুলবে। বিশেষভাবে স্ত্রী নিজেকে (ইসলামের সীমার মধ্যে) সুন্দরভাবে স্বামীর কাছে পেশ করবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, স্বামীকেও স্ত্রীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে হবে। কারণ স্ত্রীরও সেই অধিকার আছে, যা স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে আশা করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য স্বামী বা স্ত্রীকে পরস্পরের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য করা। এজন্যে ইসলাম মেয়েদের ঘরে সাজ-গোজ করতে বলে। আর পাশ্চাত্য বলে বাইরে যাবার সময় সবচেয়ে সুন্দরী সেজে যেতে, আর ঘরে কুৎসিতরূপে থাকতে– ইসলাম এটা অসমর্থন করে।

## ৪. স্বামীর আনুগত্য পাওয়ার ভিত্তি

'আনুগত্য' (obedience) শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন। কারো কাছে এর অর্থ পুরোপুরি আত্মসমর্পন। কারো মতে এর অর্থ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মান। এজন্যে কুরআনে 'আনুগত্য' বলতে কি বোঝানো হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। চতুর্থ সূরার ৩৪নং আয়াতে ধার্মিক মেয়েদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের সতীত্ব এবং তাদের স্বামীর অধিকার হেফাজত করে ইত্যাদি। এই বর্ণনার ঠিক আগে আর একটি কথা এসেছে যাতে স্বামীদের 'কাওয়ামুন' বলা হয়েছে। এই 'কাওয়ামুন' অর্থ ভরনপোষণকারী (maintainers) অথবা রক্ষক (protectors)। (যদিও কেউ কেউ ভুলক্রমে এর ব্যাখ্যা করে বলেন, নারীর উপর পুরুষ ক্ষমতাবান)। কাজেই স্বামীর আনুগত্যের বিষয়টি এখান থেকেই এসেছে যে তারা নারীকে রক্ষা করবে, ভরণপোষণ করবে এবং সংসারের পুরো দায়িত্বে থাকবে। এই হিসেবে তাদের সম্মান করা স্ত্রীর কর্তব্য।

## ৫. কাওয়ামুন শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে

কাওয়ামুন শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ বা ক্ষমতাবান' করা মারাত্মক ভুল। কুরআনের কোথাও এমন কথা নেই যে নারীর উপর পুরুষ শ্রেষ্ঠ। চতুর্থ সূরার ৩৪নং আয়াতও এর ব্যতিক্রম নয়। রাসূলের কোন হাদিসেও এমন ধারণা পাওয়া যায় না। কাজেই ঐ আয়াতের অর্থ হিসেবে পুরুষরা নারীদের রক্ষা ও ভরণপোষণকারী এটাই সবচাইতে গ্রহণযোগ্য।

অনুবাদের দোষের কারণে অমুসলিমদের মাঝে এ নিয়ে ভুল ধারণার জন্ম হচ্ছে। পুরুষকে কেন রক্ষকের (protector) দায়িত্ব দেয়া হল এই প্রশ্নও অনেকের। এই প্রশ্নের উত্তরে কুরআন ব্যাখ্যা দিয়েছে– 'তাদের মধ্যে কাউকে অন্যদের উপর কর্তৃত্ববান করা হয়েছে'। এখানে অমুসলিমরা এই 'কাউকে' এর ব্যাখ্যা করেন পুরুষ এবং 'অন্যদের' ব্যাখ্যা করে নারী হিসেবে এবং দাবী করেন নারীর উপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটাও অসার যুক্তি। কারণ ঃ

ক) ব্যাকরণগত- যদিও ঐ আয়াতে ব্যবহৃত আরবী সর্বনাম পুরুষবাচক (masculine pronoun), কিন্তু কুরআনে অনেক জায়গাতেই নারী-পুরুষকে এক সম্বোধনেই ডাকা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ মতে পুরুষবাচক সর্বনাম দিয়ে মেয়েদেরও সম্বোধন

করা যায় কাজেই ঐ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তাদের মধ্যে কাউকে (কোন কোন নারী এবং পুরুষ) অন্যদের (নারী এবং পুরুষ) উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।

খ) নেতৃত্ব প্রশ্নে ঃ আয়াতটি পরিবার সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিল হয়েছে। পরিবারের ভরণপোষণ সহ সার্বিক দায়িত্ব ইসলামে স্বামীর উপর ন্যস্ত, তাই স্বামীকে পরিবারে কিছুটা preference দেয়া হয়েছে। এটা কোনভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়।

## সূত্র নির্দেশশিকা ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ২৫ঃ৭৪, ২ঃ২২৮

প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ২ঃ২২৮, ৪ঃ৩৪

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ২ঃ২২৮, ৪ঃ৩৪

চতুর্থ সূরার-৩৪ নং আয়াত 'ফাদল' শব্দটি আছে, যা কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহর রহমত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা একটা নিরপেক্ষ অর্থবাচক শব্দ। এখানে এর ব্যবহার এটাই প্রমাণ করে যে নারীদের ভরনপোষণ ও রক্ষার সামর্থ্য পুরষকে দিয়ে আল্লাহর তাদের রহমত করেছেন এর মানে এই নয় যে পুরুষ নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। Contemporary Verdict's, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী।

# জি-৪০ দাম্পত্য সম্পর্ক-৫ (স্বামীর অধিকার)

**প্রশ্ন ঃ**

১. রাসূলের (সঃ) এমন কোন হাদিস আছে কি যাতে স্বামীকে মান্য করার জন্য স্ত্রীকে আদেশ করা হয়েছে?

২. পরিবারের নেতৃত্ব স্বামীকে দেয়ার মাধ্যমে কি পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে?

৩. উপরের প্রশ্নের জবাবে মুসলমানরা কি বলবে?

৪. মেয়েরা কেন পরিবারের নেতা হতে পারবে না?

৫. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের সীমা কতদূর?

**উত্তর ঃ**

## ১. রাসূল (সঃ) এর ভাষ্যমতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য

রাসূল (সঃ)-এর কয়েকটি হাদিসে স্বামীকে স্বামীর আনুগত্য করতে আদেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে এটা করলে বিনিময়ে বেহেশত পাবে। এক সহীহ্ হাদিসে তিনি বলেন, যদি কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তবে হাশরের ময়দানে তাকে বলা হবে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তিনি আরও বলেন যে, স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় কোন স্বামী মারা গেলে স্ত্রী বেহেশত পাবে। আবার যদি কোন স্বামী স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট অবস্থায় মারা যায় তবে তার (স্ত্রীর) নামাজ কবুল হবে না। যখন মুসলিম নারীদের পক্ষে একজন নারী রাসূল (সঃ)-কে বললেন যে, যেহেতু মেয়েদের সম্মুখ যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন হচ্ছে না, সেহেতু তারা পুরুষদের মত শহীদ হয়ে মর্যাদাবান হতে পারছেন না। তখন রাসূল (সঃ) তাঁকে বললেন সব মেয়েদের বলে দাও যে, তাদের স্বামীর আনুগত্য এবং তাদের সন্তুষ্টি মেয়েদের জন্য শাহাদাতের সমান। রাসূল (সঃ) বলেন, আমি যদি কোন মানুষকে অন্য আর একজন মানুষকে সেজদা করতে বলতাম তবে আমি স্ত্রীদের তাদের স্বামীদের সেজদা করতে বলতাম। এই হাদিসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ক) রাসূল (সঃ) উপমার ছলে একথা বলেছেন। কারণ ইসলামে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করার কোন সুযোগ নেই। কাজেই রাসূলের এই উক্তির সাথে মেয়েদের পুরুষের তুলনায় খাটো হবার কারণ নেই। বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করার ইংগিতই রয়েছে। বুদ্ধিমতী মায়েরা মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাবার সময় বলে, 'তোমার স্বামীর দাসীর মত হয়ে যাও, দেখবে সেও তোমার দাস হয়ে গিয়েছে।' এর মানে পুরুষকে যে ভালবাসা, আকর্ষণ সহযোগিতা ও আনুগত্য দেয়া হবে সেও তাই দেবে।

খ) এই উক্তি পরিবারের ভিতরে সহযোগিতাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

## ২. যেসব কারণে মানুষ মনে করে যে ইসলামে নারীকে পুরুষের নীচে স্থান দেয়া হয়েছে

যারা এমন কথা বলেন তারা তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমতঃ তারা বলেন সম্পদে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক, কাজেই নারীর মর্যাদাও পুরুষের অর্ধেক। দ্বিতীয়তঃ তারা বলেন আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক। তৃতীয়তঃ তারা বলেন যে কুরআন পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতে দিয়ে নারীকে তার আনুগত্য করতে বলেছে। পক্ষান্তরে নারীর হাতে নেতৃত্ব দেয়নি। তার আনুগত্য করতে পুরুষকে বলেনি। এসবই প্রমাণ করে যে ইসলামে নারীর স্থান পুরুষের নীচে।

এই ধারণা সাধারণতঃ অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই প্রচার করেন, যারা সামগ্রিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না কুরআন প্রদত্ত মানব-মানবীর পারস্পরিক মর্যাদা দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। (কিছু মুসলমান যারা কুরআনের শিক্ষা যথাযথভাবে বোঝেন না তারাও এমন ধারণা পোষণ করেন। –অনুবাদক)

## ৩. উপরের প্রশ্নের জবাব

উপরের প্রশ্নের আলোচনায় ইসলামে নারীর মর্যাদার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি পাওয়া যায় তার জবাব নিম্নরূপ ঃ

ক) কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া (খোদাভীতি)। নারী বা পুরুষ হবার মাঝে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

খ) কুরআন আরও বলে যে নারী এবং পুরুষ উভয়ে 'এক আত্মা' থেকে তৈরি। কাজেই সৃষ্টির ভিত্তিতেই উভয়ে সমান। কেউ কারো 'অর্ধেক' হবার প্রশ্নই উঠে না।

গ) উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ বন্টনের প্রশ্নে ইসলাম মানুষের উপর প্রদত্ত দায়িত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছে। এখানে লিঙ্গভেদে কাউকে খাটো করার প্রশ্ন অবান্তর। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 'জি-১৫'-এ দেখুন)

ঘ) আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রেও মেয়েদের খাট করা হয়নি। এটা শুধু এ জন্যেই যে মেয়েরা এসব কাজে সাধারণতঃ যুক্ত থাকত না। চুক্তির জটিল ধারা যাতে একজন অপরজনকে মনে করিয়ে দিতে পারে তাই এ ব্যবস্থা। যাতে নারীর উপর বেশি চাপ না পড়ে। (এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা জি-১৮ অধ্যায়ে)।

ঙ) কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে সমাজের প্রত্যেকটা অংশে কাজ এবং দায়িত্বের বিভাজন ও বণ্টন হওয়া উচিৎ। ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে কিছু দায়িত্ব আলাদা করে দিয়েছে। যেহেতু নারীর ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক দায়িত্ব পুরুষের সেহেতু পরিবারের নেতৃত্বও তাকে দেয়া হয়েছে। ইসলামে নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়।

## ৪. মেয়েরা কেন পরিবারের প্রধান হতে পারবেন না

মেয়েরা কেন পরিবারের প্রধান হতে পারবেন না এই প্রশ্ন উঠার পেছনে কয়েকটি বিভ্রান্তি কাজ করেছে, যথা ঃ

ক) স্বামীর হাতে পরিবার প্রধানের দায়িত্ব আসায় পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হয়েছে।

খ) পরিবার প্রধানের দায়িত্ব পুরুষের উপর দিয়ে তাকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।

গ) ইসলামে নারীকে স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে তার আনুগত্য করতে বলেছে। এটা নারীর ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় ক্ষুন্ন করছে।

বাস্তবে এই তিনটি ধারণাই ভুল। প্রথমতঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব ও অধিকার বন্টন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ, যিনি নারী বা পুরুষ কোনটাই নন। কাজেই কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের ধারণা অমূলক। তিনি মানুষকে একটি সুষম সুখী পরিবার গঠনের নির্দেশনা দেন।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষের হাতে পরিবারের নেতৃত্ব নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কোন নিদর্শন নয়। ইসলামকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এটা সর্বস্তরেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এখানে নামাজে একজনকে নেতৃত্ব দিতে হয়। যখন তিন বা ততোধিক লোক সফরে যায় তখন একজনকে নেতা বানাতে রাসূল (সঃ) আদেশ করেন। রাসূল (সঃ) বলেন যে, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (মেষচালক)। সমাজবিদরা গবেষণা করে দেখছেন মানুষের গোটা ইতিহাসে দু'ধরনের পারিবারিক নেতৃত্ব আছে। একটা বহির্জগতের (instumental) সাথে সম্পৃক্ত যার নেতৃত্বে থাকেন সাধারণতঃ পুরুষ। আর ঘরের অভ্যন্তরে চাবিকাঠি থাকে নারীর হাতে (expressive leadership)। ইসলামে এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি।

তৃতীয়তঃ স্বামীর হাতে নেতৃত্ব থাকায় স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব খর্ব হবার কোন ভয় নেই। বিয়ের মাধ্যমে নারীর স্বতন্ত্র পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়না। ইসলাম শুধু এটুকুই বলে যে যেহেতু স্বামীকেই পরিবারের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা বিধান করতে হবে সেহেতু পরিবার প্রধানের দায়িত্ব তার। বিয়ে এমন একটা সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর যার ভিত্তি। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেই (শুরা) স্বামীর কাজ করা উচিৎ।

## ৫. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের সীমা প্রসঙ্গে

ইসলামে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য প্রশ্নাতীত ও নিরংকুশ নয়। একমাত্র আল্লাহই প্রশ্নাতীত ও নিরংকুশ আনুগত্য প্রাপ্য যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা, আর সবার প্রতি আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সীমার মধ্যে। রাসূল (সঃ) বলেন, "কেউ যদি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী কোন আদেশ করে তবে তা যেন কেউ না মানে।" অন্ধ-নির্বিচার

আনুগত্য ইসলাম বিরোধী। কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ইসলামসম্মত পোশাক পরতে নিষেধ করে তবে আনুগত্য করা যাবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে মদ খেতে বা ইসলামী পোশাক না পড়তে আদেশ করে, তখন আনুগত্য করা যাবে না। বরং এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহই শ্রেয়। ইসলাম আরও শিক্ষা দেয় যে স্বামী শুধু বৈধ বিষয়েই স্ত্রীর আনুগত্য পাবে। যেমন, কেউ তার স্ত্রীকে তার সম্পত্তি দেবার নির্দেশ দিতে পারবে না। সে যা আদেশ করবে তা হতে হবে সামাজিক, ন্যায্য, যৌক্তিক এবং সুন্দর। কোন স্বামী স্বৈরাচারীভাবে স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করতে পারবে না। শুরা (পারস্পরিক পরামর্শ) একটা অত্যাবশ্যকীয় ইসলামী বিষয়। সমাজ ও পরিবারের সকল স্তরে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৪৯ঃ১৩, ৪ঃ১

প্রশ্ন-৪ ঃ 'The Hand book of Modern Sociology', by Zeldith

প্রশ্ন-৫ ঃ কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাস (Faith) গ্রহণ করার আদেশ করতে পারবে না।

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৬০ঃ১২, ২ঃ২৩২

# জি-৪১ দাম্পত্য সম্পর্ক ও সন্তানের অধিকার

**প্রশ্ন ঃ**

১. ইসলামী মতে মুসলিম দম্পতি কিভাবে স্বামীর উপর অর্পিত অধিকার ও দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করবে?

২. স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে তার সাথে মিলিত হতে স্ত্রী বাধ্য কি না?

৩. ইসলাম কি নারীকে ঘর গৃহস্থালীর সকল কাজ করতে বলে?

৪. শিশুর অধিকারের বিভিন্ন দিকগুলো কি?

৫. শিশুর জীবনের অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৬. শিশুর পিতৃ পরিচয় জানবার অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৭. শিশুর সযত্নে বড় হবার অধিকার বলতে কি বুঝায়?

**উত্তর ঃ**

## ১. স্বামীর অধিকার ও দায়িত্বের বাস্তব প্রয়োগ

ইসলাম নব বিবাহিত দম্পতিকে স্বামীর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও অধিকার যৌথভাবে পালনের শিক্ষা দেয়। যেমন ঃ

ক) স্ত্রীকে পরিবার ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সাথে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে সমতা কায়েম করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্বামীর অজ্ঞাতে অথবা অনুমতি ছাড়া তার ঘর ত্যাগ করা উচিৎ নয়। এই দায়িত্ব থেকে পরিবারের ভেতরে কিছু শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী সব সময়ে জানতে পারে তার স্ত্রী কোথায় আছে।

অবশ্য এটা এমন কোন বিধি নিষেধ নয় যা যৌক্তিক প্রয়োজনে স্ত্রীকে ঘরের বাইরে যেতে দেবেনা। ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাবার সুযোগ দিয়েছে। যেমন - ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য, আল্লাহর এবাদতের জন্য, সামাজিক প্রতিরক্ষায় অংশ নেবার জন্য ইত্যাদি। এ ছাড়া যে সব নিয়মিত কাজে একবার অনুমতি নিলেই চলে সেখানে প্রতিবার অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। যেমন– চাকরির উদ্দেশ্যে অফিসে যাওয়া, বাজারে যাওয়া, অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনের সেবায় যাওয়া ইত্যাদি।

খ) রাসূল (সঃ)-এর মতে স্ত্রীর উপর সব চেয়ে বেশি অধিকার স্বামীর। কাজেই বিয়ের পর যদিও তার পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় থাকবে তবুও যদি এমন পরিস্থিতি আসে যে স্বামীর প্রতি দায়িত্ব ও পিতা মাতার প্রতি দায়িত্বের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তখন স্বামীর প্রতি দায়িত্বই তার কাছে অগ্রাধিকার পাবে।

গ) যদি স্বামীকে ব্যবসায়িক বা চাকরির প্রয়োজনে কোথাও ভ্রমণে যেতে হয় তখন স্বামীর প্রয়োজনে স্ত্রীকেও সাথে যেতে হবে। কিন্তু যদি বিয়েচুক্তির সময় স্ত্রী এমন শর্ত লিখিয়ে নেয় যে, স্বামী নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারবেনা। অথবা স্ত্রী নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে বাধ্য নয় এবং স্বামী যদি এই চুক্তিতে সম্মত থাকে তবে সে তার সাথে ভ্রমণে যেতে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবেনা। যদি স্ত্রীর জন্য ভাড়া করা বা নির্মাণ করা বাড়ি ইসলাম বর্ণিত ন্যূনতম মানের না হয় তবে স্ত্রী সে বাড়িতে থাকতে অস্বীকার করতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে নাজেহাল করার ইচ্ছায় বাসা বদল করতে পারবে না।

ঘ) যদি স্ত্রীর চাকরি করা পরিবারের স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর হয় তবে স্বামী স্ত্রীকে চাকরি ছাড়তে অনুরোধ করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি বিয়ে চুক্তির সময় স্ত্রীর চাকরী করার শর্তে স্বামীর সম্মতি থাকে তবে স্বামী স্ত্রীকে চাকরী ছাড়তে বলতে পারবে না।

ঙ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের মেহমানদের সমাদর স্ত্রী করতে পারবে না।

চ) স্বামীর অনুমোদন ছাড়া তার কোন সম্পত্তি স্ত্রী বিক্রি করতে বা দান করতে পারবে না। অবশ্য স্বামী যদি কৃপণ হয় তবে তার সম্পত্তি থেকে তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় অর্থ স্ত্রী খরচ করতে পারবে।

ছ) যৌক্তিক কারণ ছাড়া স্বামীর বৈধ যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে স্ত্রী অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

## ২. স্বামীর যৌন মিলনের ইচ্ছা পূরণে স্ত্রীর দায়িত্ব প্রসঙ্গে

প্রায় সব ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'জন নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দেওয়া। সেই সাথে অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালন। কাজেই স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের জন্যই তার সাথীর মিলনের ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান অভদ্রতা। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পূরণে মুসলিম স্বামী যেমন বাধ্য তেমনি স্বামীর যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণে স্ত্রীও দায়িত্ববান থাকা প্রয়োজন। রাসূল (সঃ)-এর একাধিক হাদিসে এ বিষয়ে বলা আছে। কোন মুসলিম স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখতে বা নফল হজ্বে যেতে পারবে না। এই সব নফল এবাদত যেন তাদের অন্তঃরঙ্গ সম্পর্কের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

অবশ্য দৈহিক মিলনে স্ত্রীর বাধ্যবাধকতা স্বামীকে এই সুযোগ দেয় না যে সে তার ক্লান্তি বা অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনবে না। তাছাড়াও রোজার সময়, মাসিক ঋতুর সময়, সন্তান জন্মের পর স্ত্রী স্বামীকে মিলনে বিরত রাখবে। ইসলাম ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারকে কাঠোরভাবে বিরোধিতা করে। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈধ যৌন অধিকার প্রয়োগে কোন বাধা থাকা উচিৎ নয়। তাহলে পরিবারের বন্ধন দুর্বল হবে, স্বামী অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ হতে পারে।

## ৩. ঘর গৃহস্থালীর কাজ ও নারী

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফীসহ অধিকাংশ আইনবিদ বলেন যে, ঘরের কাজ করতে স্ত্রী বাধ্য নয়। তারা এ ব্যাপারে দ্বিতীয় সূরার ২২৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেন, সেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের উপর যা যা অধিকার আছে স্ত্রীদেরও তাদের স্বামীদের উপর একই রকম অধিকার আছে। এই আইনবিদগণ বলেন যে, ঘর গৃহস্থালীর কাজ বিয়ে চুক্তির অংশ নয়। কাজেই স্বামী এ ব্যাপারে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারেনা। ইমাম আহম্মদসহ অন্য আইনবিদরা এর বিরুদ্ধে বলেন। তারা বলেন দ্বিতীয় সূরার ২২৮ নং আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের উপর সমান অধিকার রাখেন। কিন্তু যেহেতু স্ত্রী ও গোটা পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব এককভাবে স্বামীর সেহেতু এর সাথে সমতা রক্ষা করার জন্যই ঘর গৃহস্থালীর কাজ স্ত্রীর। এতে স্ত্রীর মর্যাদা ও সমতা ক্ষুন্ন হয় না। তারা এর পক্ষে রাসূল (সঃ)-এর একটি ঘটনা বলেন, যেখানে তার কন্যা ফাতিমা (রাঃ) তাঁর কাছে ঘরের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলে একজন কাজের লোক চেয়েছিলেন। তখন রাসূল (সঃ) তাকে তা দেননি। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মেয়েদের ঘর গৃহস্থালীর কাজ করাকে রাসূল (সঃ) অসঙ্গত মনে করেননি। তবে এ কাজ মেয়েদের বাধ্যবাধকতা নাকি ঐচ্ছিক সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তর যাই হউক ইসলামে বিয়ে বন্ধনের লক্ষ্য হচ্ছে যে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে সব বিষয়ে সহযোগিতা করবে। এটা স্ত্রীর জন্য অন্যায় হবে যে, কর্মক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরে স্বামী ঘরের কাজ করবে। আর স্বামীর জন্য এটা অন্যায় হবে যদি সে ঘরের সব কাজ স্ত্রীর উপর চাপিয়ে নিজে অলস বসে থাকবে।

## ৪. সন্তানের অধিকারকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) জীবনের অধিকার

খ) পিতৃ পরিচয়ের অধিকার

গ) সযত্নে বেড়ে উঠার অধিকার

## ৫. শিশুর জীবনের অধিকার

মানুষের জীবন আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কাজেই কোন পিতা-মাতার এই ভাবার সুযোগ নেই যে, তাদের ইচ্ছামত সন্তান আসে। অনাগত সন্তানের জীবন নষ্টের অধিকার কারো নেই। সে জন্য ইসলামে দারিদ্র বা সন্তান ছেলে না মেয়ে এসব অযুহাতে গর্ভপাত, এম. আর. ও শিশুহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

## ৬. পিতৃ পরিচয়ের অধিকার

এ অধিকার শিশুকে নিজের পরিচয় জানার ও রক্ষা করার সুযোগ দেয়। তার জানার অধিকার আছে কে তার পিতা। যদি পিতৃ পরিচয় পাওয়া না যায় তবে মায়ের সূত্রে সে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

যাদের পিতা মাতা কারোরই পরিচয় জানা যায় না। (কুরআন তাদের) "তোমাদের ভাই" এবং "তোমাদের পোষ্য" এইভাবে ঘোষণা করে। এমন সন্তানদের যারা পালন করবে তারা তার পরিচয় গোপন করতে বা অন্য পরিচয় দিতে পারবে না। পাশ্চাত্যে প্রচলিত সন্তান দত্তক নেবার নামে মানুষের পরিচয় নষ্ট করার সুযোগ ইসলামে নেই।

## ৭. সযত্নে বেড়ে উঠার অধিকার

পুত্র কন্যা নির্বিশেষে যে কোন সন্তানের জন্মকে পিতা মাতা আনন্দের সাথে বরণ করবে। কারণ এটা আল্লাহর উপহার। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম এও বলে যে, আল্লাহর উপহারের জন্য আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শিশুর বয়স এক বা দু'সপ্তাহ হলে আত্মীয় পরিজনের সমাবেশ (আকীকা) করতে। এই আকীকা অনুষ্ঠানে সন্তানের নাম রাখা হয়। তার চুল কেটে চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপার মূল্য দান করা যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চা জন্মের পর যথাশীঘ্র খাসী বা দুম্বা বা ভেড়া জবাই করে আত্মীয় ও গরীবদের খাওয়ানো রাসূলের অন্যতম সুন্নত।

শিশু যখন বড় হতে থাকবে তখন পিতা মাতার পক্ষ থেকে দৈহিক, মানসিক ও বস্তুগত সকল যত্নের সে অধিকারী। যদি শিশুর নিজের সম্পত্তি থাকে অথচ পিতা মাতা গরীব সে ক্ষেত্রে তার ভরণপোষণের জন্য তার সম্পদ তারা ব্যবহার করতে পারবে। ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে জানার অধিকার তার আছে। তাকে নামাজ সহ অন্যান্য এবাদত শেখাতে হবে। ধর্মীয় পরিবেশে বড় করতে হবে। অবিশ্বাসীদের কবল থেকে দূরে রাখতে হবে। সমান ব্যবহার পাওয়া সব শিশুর অধিকার। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ স্বামীর কথায় স্ত্রীর চাকরী ত্যাগের বাধ্যবাধকতার একটি ব্যতিক্রম আছে। হানাফী মতে যদি মহিলা কোন ফরজে কেফায়ার দায়িত্বে (যেমন ধাত্রী, ডাক্তার ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে তবে সে স্বামীর কথায় কাজ নাও ছাড়তে পারে।

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ২ঃ২২৮

প্রশ্ন-৫ ঃ E. Westonmark, 'The Origin and Development of Moral Ideas' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে বাইবেলের সময় সন্তানের জীবনের উপর পিতার অধিকার ছিল। অর্থাৎ তিনি চাইলে তাদের হত্যা করতে পারতেন।

# জি - ৪২ পিতা-মাতার অধিকার

**প্রশ্ন ঃ**

১. পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন কি বলে?

২. পিতা মাতার অধিকার সম্পর্কে রাসূল (সঃ) কি বলেছেন?

৩. পিতা মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার বলতে কি বুঝায়?

৪. কোন অবস্থায় পিতা মাতার ভরণপোষণ সন্তানের দায়িত্ব? এটা কি নৈতিক দায়িত্ব নাকি আইনগত বাধ্যবাধকতা?

৫. যদি কারো পিতা মাতা মুসলমান না হয় তবুও কি তাদের ভরণপোষণ করতে হবে?

৬. যদি পিতা মাতা সন্তানের প্রতি দয়ালু না হয়, তবুও কি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে।

**উত্তর ঃ**

## ১. পিতা মাতার সাথে ব্যবহার সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা

কুরআন বেশ কয়েক জায়গায় পিতা মাতার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হতে বলা হয়েছে। প্রায় সব জায়গাতেই আল্লাহর এবাদতের পরেই পিতা মাতার সেবার কথা বলা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে ইসলামে মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহারের গুরুত্ব কত বেশি। একটি আয়াতে (১৭ঃ২৩-২৪) অত্যন্ত সুন্দরভাবে পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যের কথা এসেছে। বলা হয়েছে তাদের প্রতি দয়ালু হতে, এমন কোন শব্দ উচ্চারণ না করতে যা তাদের কষ্টের কারণ হয়। তাদের প্রতি কোন রকম অধৈর্য্য বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করতে। আরও বলা হয়েছে তাদের প্রতি সাহায্যের ডানা বাড়িয়ে দিতে (Lower the wing of humility)। এখানে 'ডানা' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাখি তার সন্তানকে আদর করতে তার পাখা নীচু করে দেয়। তেমনি পিতা মাতা বিশেষভাবে মা সন্তানকে সযত্নে লালন করেন। বার্ধক্যে তাদেরকে একইভাবে লালন সন্তানের দায়িত্ব।

## ২. পিতা মাতার অধিকার সম্পর্কে রাসূল (সঃ)

পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার সম্পর্কে রাসূলের শিক্ষা কুরআনের শিক্ষারই বিস্তৃতি। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম কাজ কি, উত্তরে তিনি বলেন, "সময় মত নামাজ পড়া, পিতা মাতার প্রতি ভাল এবং দয়ালু হওয়া এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" কাজেই দেখা যাচ্ছে পিতা মাতার প্রতি সদয় হওয়ার বিষয়টি নামাজ এবং জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মাঝে অবস্থিত। পিতা মাতার প্রতি ভাল ব্যবহারের পুরস্কার সম্পর্কে অনেক জায়গায় তিনি বলেছেন– যেমন এক হাদিসে তিনি বলেন যে,

যারা পিতা-মাতা ও আল্লাহর অনুগত তারা বেহেস্তের সর্বোচ্চ জায়গায় থাকবে। আরেক জায়গায় পিতা মাতার প্রতি দয়াকে জিহাদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন যারা তাদের সেবা করবে তার হজ্জের অথবা জিহাদের সমান পুরস্কার পাবে। তিনি আরো বলেছেন যে, পিতা মাতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নিহিত। যারা তাদের পিতা মাতার প্রতি সদয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি সদয়। পিতা মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যদি পিতা মাতা সন্তানের জন্য আগ্রহের সাথে দোয়া করে অথবা তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে নালিশ করে তবে আল্লাহ্ তার জবাব দেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, "তোমাদের পিতা মাতার প্রতি দয়ালু হও তা হলে আল্লাহ্ তোমাদের বার্ধ্যক্যে তোমাদের সন্তানদের তোমাদের প্রতি দয়ালু বানাবেন। আর তোমরা চরিত্রবান হও তাহলে তোমাদের স্ত্রীরাও সতী হবে।"

## ৩. পিতা মাতার প্রতি ভাল ব্যবহারের পন্থা

কুরআন এবং হাদিসে পিতা মাতার প্রতি ব্যবহারের আলোচনায় আরবী শব্দ 'বীর' ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে ভাল ব্যবহার; এটি একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ। 'বীর' শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। দয়া, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, ধৈর্য্য, সততা এই সবই বীর শব্দের প্রতিশব্দ, মুসলমানরা পিতা মাতার সাথে ব্যবহারে এই সব গুণের প্রয়োগ ঘটাবে। রাসূল (সঃ) বলেন যে, যারা পিতা মাতার দায়সারাভাবে সেবা করে, তারা 'বীর'-এর মত সেবা করছে না। সব সময় ভালবাসার সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং কখনও তাদের সাথে উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না।

রাসূল (সঃ)-এর কন্যা বিবি ফাতিমা (রাঃ) সব সময় রাসূল (সঃ)-এর সাথে শিশুর মত সরল ব্যবহার করতেন। যখনই রাসূল (সঃ) তাকে দেখতে যেতেন তখনই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চুমো দিতেন। এবং শ্রদ্ধার সাথে নিজের আসনে তাকে বসতে দিতেন। রাসূল (সঃ) ও একইভাবে তার সন্তানকে স্নেহ করতেন।

## ৪. পিতা মাতার ভরণপোষণ প্রসঙ্গে

তিনটি অবস্থায় পিতা মাতার ভরণপোষণ সন্তানের দায়িত্ব ঃ

ক) পিতা মাতা অক্ষম হলে এবং তাদের জীবন ধারনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে।

খ) তাদের চলার মতন জীবিকা তারা উপার্জন করতে না পারলে।

গ) সন্তানের তাদের ভরন পোষণের সামর্থ্য থাকলে। তার একদিন ও একরাতের পরিমাণ খাদ্য ঘরে অতিরিক্ত থাকলেই যে সামর্থবান বলে ধরা হবে।

যদি পিতা মাতা অভাবী হয় এবং তাদের ভরণপোষণের সামর্থ সন্তানের থাকে তখন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সহ তাদের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব তার। এমন কি

তাদের পিতা মাতার সেবা যত্নে নিয়োজিত কাজের লোকের ভরণপোষণের দায়িত্বও তারই। এই দায়িত্ব নৈতিক এবং আইনগত দু'টোই। একবার রাসূল (সঃ) এর কাছে এসে একজন বলল যে তার পিতা তার কিছু সম্পত্তি নিয়ে নিতে চায়। তখন রাসূল (সঃ) বলেন তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার। কাজেই কোন মুসলিম তাদের পিতা মাতা অথবা দাদা দাদীর সেবা যত্নে যেন কার্পণ্য না করে। যদি সে এই দায়িত্ব পালন না করে তবে আইন প্রয়োগ করে তাকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে হবে।

## ৫. অমুসলিম পিতা মাতার ভরণপোষণ প্রসঙ্গে

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল পিতা মাতা সন্তানের কাছ থেকে ভাল ব্যবহারের অধিকার রাখে। রাসূল (সঃ) এর সময় অনেক মুসলমানের পিতা মাতাই অমুসলিম ছিলেন। তবুও রাসূল (সঃ) তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের আনুগত্য করতে বলেছেন। শুধুমাত্র যখন তারা আল্লাহর বিধান এর পরিপনিন্থ আদেশ করবে তখন আনুগত্য করতে করেছেন। ৩১ নং সূরার ১৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে মুসলিমরা তাদের অমুসলিম পিতা মাতার সাথে কেমন ব্যবহার করবে। সেখানে এটা স্পষ্ট যে আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী বিষয় ছাড়া আর সব বিষয়ে পিতা মাতার অনুগত থাকতে হবে। কুরআন তাদের নিন্দা করে যারা অন্ধভাবে পিতৃ-পিতামহের বিশ্বাস আঁকড়ে থেকে ঈমান গ্রহণে অস্বীকার করে। "সেই দিনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো যেদিন কোন পিতা তার সন্তানের, আর কোন সন্তান তার পিতার জন্য কোন অনুরোধ করতে পারবে না।" কুরআন আরও বলে যে অমুসলিম পিতা মাতাকে সদয় সঙ্গ দিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকায় না যায়।

## ৬. পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি দয়ালু না হলে

একবার রাসূল (সঃ) পিতা মাতার প্রতি সদয় হবার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার নেবার কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, যারা পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে তাদের জন্য দোজখের দুই দরজাই খোলা থাকবে। এ সময় একজন রাসূলকে জিজ্ঞাসা করল, "হে রাসূল (সঃ) যদি তারা আমাদের প্রতি অন্যায় ও অন্যায্য আচরণ করেন, তবুও" রাসূল (সঃ) বললেন, "তারা মন্দ হলেও তাদের প্রতি সদয় থাক।" (তিনি এ কথা তিনবার বলেন)।

এটাও মনে রাখা দরকার যে বার্ধক্যের স্বাস্থ্যহানির কারণে পিতা-মাতা অধৈর্য ও খিটখিটে হতে পারেন। তাদের সহ্য ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। অল্পতেই রাগতে পারেন। কাজেই মুসলমানরা ধৈর্যের সাথে তাদের যত্ন করবে। তাঁদের প্রতি কোন কড়া শব্দ উচ্চারণ করবে না। রাসূল (সঃ) পিতা মাতার সাথে খারাপ ব্যবহারকারীকে 'খুনীর' সমপর্যায়ের বলেছেন। তিনি আরও বলেন, পিতা মাতার প্রতি নির্দয় ব্যক্তির আমল বিফলে যাবে এবং বেহেশত থেকে সে বঞ্চিত হবে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৩৬, ৬ঃ১৫১, ২ঃ৮৩, ১৯ঃ১৪, ১৯ঃ৩২

পিতা মাতার প্রতি সদয় আচরণের উদাহরণ হিসেবে যীশুর এবং জনের (ইয়াহিয়া) নাম এসেছে।

প্রশ্ন-২ ঃ রাসূল (সঃ) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, "আমি আল্লাহর পথে জেহাদ করতে চাই। সত্যের জন্য জীবন দিতে চাই। কিন্তু তা করতে পারছি না।" রাসূল (সঃ) জানতে চান যে তার পিতা মাতা জীবিত আছেন কিনা। ঐ ব্যক্তি জানান তার মা জীবিত আছেন। তখন রাসূল (সঃ) বলেন, "যাও এবং তাঁর সেবা করো, তুমি তাদের সমান পুরস্কার পাবে যারা হজ্ব করে ও জেহাদ করে।" অন্য হাদিসে তিনি বলেন, "মায়ের পায়ের দিকে খেয়াল রাখবে যাতে তাঁর সেবা করতে পারো।" আরেক হাদিসে তিনি বলেন, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত।

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ৩১ঃ১৫ এই আয়াতে বলা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা-পিতার আনুগত্য করা যাবে না। এই আয়াত তখন নাযিল হয় যখন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-র মুশরিক মা ঘোষণা দেন যে তাঁর ছেলে ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি আমরণ অনশন করবেন।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর কাছে জানতে চান যে তিনি তাঁর অমুসলিম মাকে সাহায্য করে যাবেন কিনা। জবাবে রাসূল (সঃ) বলেন, তুমি তাঁর প্রতি দয়ালু থাকবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে কারণ কুরআন কোন মুসলমানকে তাঁর অমুসলিম পিতা মাতার প্রতি সদয় হতে বারণ করেননি যদি না তারা মুসলমানদের প্রতি আগ্রাসী ও শত্রুভাবাপন্ন হন।

# জি-৪৩ আত্মীয় স্বজনের অধিকার

**প্রশ্ন ঃ**

১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি কি দায়িত্ব থাকে?

২. দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মীয়দের (Second degree relative) (অর্থাৎ স্ত্রী/স্বামী, মাতা-পিতা এবং সন্তান ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন) প্রতি মুসলমানদের কি দায়িত্ব আছে?

৩. যদি ঐ আত্মীয়রা তার প্রতি দয়ালু না হয় তাহলেও কি এসব দায়িত্ব বহাল থাকে?

৪. এসব কি শুধু নৈতিক দায়িত্ব নাকি এর আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে?

৫. কোন কোন অবস্থায় একজন মুসলমানের দ্বিতীয় পর্যায়ে আত্মীয়দের আর্থিক ভরণপোষণ করতে হয়?

৬. বিয়ে বিচ্ছেদ (তালাক) সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কি?

৭. এটা কি সত্য যে ইসলামে তালাক অতি সহজ বিষয়?

৮. তালাকের অধিকারের অপব্যবহার রোধে কোন ব্যবস্থা কি ইসলামে আছে?

**উত্তর ঃ**

## ১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি দায়িত্ব

রাসূল (সঃ) বলেন যে, যদি পিতা-মাতার অসমাপ্ত কাজ সন্তান করে দেয় তবে আল্লাহ তাদের (পিতা-মাতা) মাফ করে দিতে পারেন। সন্তানরা মৃত পিতা-মাতার জন্য যা করতে পারে ঃ

ক) তাদের অসমাপ্ত ওয়াদা রক্ষা করা।

খ) তাদের ঋণ পরিশোধ করা।

গ) জনগণ যেন তাদের পিতা-মাতার উপর কোন রাগ বা ক্ষোভ না রাখে তার ব্যবস্থা করা (অর্থাৎ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে তাদের কাছে মাফ চাওয়া)।

মাঝে মাঝে পিতা-মাতার কবর জেয়ারত করা এবং তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা উচিৎ। রাসূল (সঃ) বলেন মৃত্যুর পর মানুষের নতুন নেকীর পথ বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি ছাড়া, যথা ঃ

(i) যে কোন সদকায়ে জারিয়া যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে।

(ii) তার বিতরণ করা জ্ঞান থেকে যদি মানুষ উপকৃত হতে থাকে।

(iii) ধার্মিক ছেলেমেয়ে যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

## ২. দ্বিতীয় পর্যায়ের (Second degree) আত্মীয়দের প্রতি মুসলমানদের দায়িত্ব

কুরআন এবং হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের প্রতি সদয় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে হুশিয়ার করা হয়েছে।

## ৩. আত্মীয়রা সুসম্পর্ক না রাখতে চাইলেও তাদের প্রতি সদয় হতে হবে কি?

পিতা-মাতার সাথে আচরণের মতই আত্মীয়রা খারাপ ব্যবহার করলেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। রাসূল (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন, "আলী, আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের মহৎ কাজের কথা বলব? তা হচ্ছে আত্মীয়দের অথবা যে কেউ তোমার সাথে সম্পর্কছেদ করে তার সাথে সদয় ব্যবহার কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান কর। যে তোমাকে কষ্ট দেয় তাকে মাফ কর।"

## ৪. আত্মীয়দের অধিকার নৈতিক দায়িত্ব নাকি আইনগত বাধ্যবাধকতা?

আত্মীয়দের অধিকারের নৈতিক ও ধর্মীয় ভিত্তির বিষয়ে আইনবিদরা একমত। তাদের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব আছে কিনা এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। শাফেয়ী, মালেকী এবং জাফরী মাযহাব মতে আত্মীয়দের কল্যাণ করা নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। তবে প্রয়োজনে আর্থিকভাবে তাদের ভরণপোষণ করতে মুসলমানরা আইনগতভাবে বাধ্য নয়। বরং এমন দরিদ্র ব্যক্তির দায়িত্ব গোটা সমাজের। হানাফী এবং হাম্বলী মতে গরীব আত্মীয়দের আর্থিক সাহায্য করা মুসলমানদের আইনগত দায়িত্ব। এ দায়িত্বের পরিমাণ নির্ভর করবে আত্মীয়দের মধ্যে সম্পদের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কের ভিত্তিতে।

## ৫. যেসব অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ দায়িত্ব

আর্থিক সাহায্য পাওয়ার শর্ত ও অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

ক) সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যকারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান থাকতে হবে।

খ) সাহায্যপ্রার্থী আত্মীয়কে যথেষ্ট দরিদ্র (Needy) হতে হবে।

গ) যৌক্তিক কারণে উপার্জনে অক্ষম হতে হবে।

ঘ) মুসলিম হতে হবে। অবশ্য প্রথম ধারার (First Degree) আত্মীয়দের আর্থিক সুবিধা পেতে মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। আর সাধারণভাবে মুসলিম অমুসলিম সব দরিদ্রকেই সাহায্য করা উচিৎ। মুসলমানরা তাদের অবিবাহিতা কন্যা উপার্জনক্ষম হলেও তার ভরণপোষণ করতে বাধ্য।

## ৬. বিয়ে বিচ্ছেদ (তালাক) সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা

সমাজবিদরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় সব সমাজ ও সভ্যতার

ব্যর্থ বিয়ের সমাপ্তি দেবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই নিয়ম বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে চালু ছিল। কোন কোন সমাজে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু ভিন্ন ব্যর্থ বিয়ের বর বা কনের মুক্তির পথ ছিল না। তালাকের পর দম্পতির পুনর্মিলনের কোন সুযোগও ছিল না। আবার কোন কোন সভ্যতায় তালাক ছিল অতি সহজ বিষয়। এ বিষয়ে কোন বাধা ছিল না। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবরা কথায় কথায় স্ত্রী তালাক দিত। বর্তমানে এই ধারা যেন আবার ফিরে এসেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে একই দিনের মধ্যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করে আবার তালাক দেয়া সম্ভব।

এই দুই চরম পন্থার কোনটাই বৈবাহিক সমস্যার সমাধান নয়। বরং এগুলো নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। শুধু তালাকের পদ্ধতি অতি কঠিন করেই যে বিবাহ বন্ধনকে দৃঢ় করা যাবে তাও ঠিক নয়। তাহলে মানুষের মধ্যে আইন ভঙ্গের প্রবণতা আসবে। আবার এটাকে একেবারে সহজ করে দিলে পরিবার নামক ইনস্টিটিউটের অস্তিত্বই বিপর্যস্ত হবে। এ দুই চরমপন্থার মাঝে ইসলাম দেয় মধ্যপন্থা।

ইসলাম বিয়ে বন্ধনের পবিত্রতা ও গুরুত্ব ঘোষণা করে। সেটাকে স্থায়ী এবং স্থিতিশীল করতে চায়। তারপর ইসলাম এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে যে সব বিয়েই যে স্থায়ী হবে এমন নয়। ঘরের মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্ব বজায় রেখে উভয়ের মানসিক শান্তি ও ভারসাম্য নষ্ট করার চেয়ে এর বিচ্ছেদ শ্রেয়। ইসলাম তাই তালাককে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবেই অনুমতি দেয়; যদিও ইসলাম এটাকে নিরুৎসাহিত করেছে। রাসূল (সঃ) বলেন যে, "আল্লাহর অনুমোদিত কাজের মধ্যে তালাকই সবচাইতে অপ্রিয়।" অবশ্য তাঁর এই কথা সঙ্গত কারণে যারা তালাক দেয় তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ বৈবাহিক সম্পর্ককে স্থায়ী করবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারপরই ইসলামে তালাক অনুমোদিত।

## ৭. ইসলামে তালাক কি সহজ?

কবুল বলার মাধ্যমে মানুষ বিয়ে করে কিন্তু তার মানে কি এই যে শুধু এই একটি শব্দ উচ্চারণই বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা। বরং বিয়ের জন্য কত প্রস্তুতি কত আয়োজন করবার পর তার সমাপ্তি হয় কবুল উচ্চারণের মধ্যে। তেমনি 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' এই বাক্যও প্রযুক্ত হবে বিয়েকে টিকাবার সব প্রাণান্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর। এটাই ইসলামী নিয়ম। যদিও কিছু মুসলমান ইসলামের শিক্ষা না জেনে অথবা অমান্য করে তালাকের অপব্যবহার করছে। এসব অপব্যবহারের ঘটনাই অমুসলিমদের কাছে ইসলামী তালাক বলে মনে হয়। ফলে এই নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামের উপর কটাক্ষ করা হয়।

যদিও ইসলামে বিয়ে এবং তালাক কোনটাকেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলা হয়নি। মানুষের ভালর জন্যই তাদের আয়ত্বের মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইসলাম এ দু'টোর কোনটাকেই হালকাভাবে নেয়নি।

## ৮. তালাকের সম্ভাবনা কমানোর জন্য ইসলামে গৃহীত ব্যবস্থা

ইসলাম এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে তালাকের প্রেক্ষিত তৈরি না হয়। এর মধ্যে আছে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্ধারণের কিছু নির্দেশনা। স্বামী-স্ত্রীতে অমিল দেখা গেলে তা অতিক্রম করার উপদেশ। স্ত্রী বা স্বামী যে কোন একজনের ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা। সর্বোপরি তালাক বলার পর এটা পুরো কার্যকরী হবার আগে অন্তর্বর্তীকালীন সময় (ইদ্দত) দেয়া, যে সময়ে হয়তো স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হতে পারে।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-১ ঃ আল কুরআন ১৪ঃ৪০-১

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৪ঃ১, ৪৭ঃ২২

রাসূল (সঃ) বলেন, "যারা আল্লাহ এবং কেয়ামতে বিশ্বাস করে তারা যেন মেহমানের প্রতি আন্তরিক ও সহাস্য হয়, নীরব থাকে অথবা কথা বললে উত্তম কথা বলে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে।"

প্রশ্ন-৩ ঃ রাসূল (সঃ) বলেন, "আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয় যে তাদের আচরণের প্রতিক্রিয়া দেখায় বরং সেই যে আত্মীয়রা সম্পর্ক না রাখতে চাইলেও তা রক্ষা করে।"

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ৪ঃ২১

উদাহরণ স্বরূপ, স্বামী বা স্ত্রীর কেউ যদি ধর্মীয় দায়িত্ব অবহেলা বা অমান্য করতে থাকে তখন যদি এমন হয় যে এই অবহেলা সন্তানদের ঈমানও নষ্ট করতে পারে, তবে তালাকের বিষয় ভাবা যেতে পারে। ইসলামে তাল্যককে নিরুৎসাহিত করলেও অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেন, "যে নারী স্বামীকে তালাক দিতে প্ররোচিত করে, সে বেহেশতের সুবাস পাবে না।" আরেক হাদিসে তিনি বলেন, "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে কোন স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন নষ্ট করার চেষ্টা করে।"

# জি-৪৪ বৈবাহিক সমস্যা

**প্রশ্ন ঃ**

১. তালাক প্রতিরোধ করার জন্য ইসলামে কি কি ব্যবস্থা আছে?

২. স্ত্রী দোষী হলে স্বামী তাকে সংশোধনের জন্য কি করতে পারে?

৩. স্ত্রীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রহার (Chastisement) করার স্বামীর অধিকারে কি কি বিধি নিষেধ আছে?

৪. তালাক এবং Chastisement-এর মাঝে তুলনা করুন?

৫. স্বামী অপরাধ করলে স্ত্রী তাকে প্রহার করতে পারে কি?

৬. স্বামী স্ত্রী উভয়ে দোষ করলে কি করা হবে?

**উত্তর ঃ**

১. তালাক প্রতিরোধে এবং তালাকের সম্ভাবনা কমাতে ইসলাম কতগুলো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে ঃ

ক. পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় ধর্মীয় অনুভূতি, চরিত্র এবং পরস্পরের জন্য গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে যাচাই।

খ. স্বামী স্ত্রী উভয় তাদের পরিবারের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশিত পন্থায় পালন করবে।

গ. যদি পরস্পরের প্রতি কোন বিষয়ে অপছন্দ জন্ম নেয় তখন কেউ কারো ব্যাপারে কোন চরম সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে পারবে না।

## ২. স্ত্রী দোষী হলে স্বামীর সংশোধনের অধিকার

যদি স্ত্রী কোন বড় রকমের অপরাধ করে (যা কোনভাবেই হালকা করে দেখা যায় না বা ক্ষমা করা যায় না), এমন অপরাধ যা দু'জনের সম্পর্ক নষ্ট করে, পরিবারের স্থিতিশীলতাকে বিপর্যস্ত করে– ইসলামের পরিভাষায় এসব অপরাধকে 'নুশুজ' বলে। নুশুজ-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নৈতিক পদস্খলন, বিদ্রোহ, অবিবেচনাপ্রসূত কাজ, অসহযোগিতা ইত্যাদি। এ ধরণের পরিস্থিতিতে চতুর্থ সূরার ৩৪ নং আয়াতে স্ত্রীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বামীকে কতগুলো ব্যবস্থা নেবার অধিকার দেয়া হয়েছে। এগুলো হল ঃ

ক. কোমলভাবে বুঝানো- নিজের ভালবাসা ও আবেগ ব্যক্ত করে স্ত্রীকে পরিবার ভাঙার মত পরিস্থিতি থেকে সরে আসার আহ্বান জানানো। তাকে আল্লাহর ভয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার দায়িত্ববোধ জাগানোর চেষ্টা।

খ. বিছানা পৃথক করা– যদি স্ত্রী প্রথম পর্যায়ের ব্যবস্থায় সাড়া না দেয়। (শুধুমাত্র অযৌক্তিক স্বভাবের মেয়েরাই তা করবে), তবে কুরআন স্ত্রীকে দৈহিক সম্পর্ক থেকে সাময়িক ভাবে বঞ্চিত রাখতে স্বামীকে বলে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান ভালবাসা ও আকর্ষণ পরখ করা। আলাদা থাকার মাধ্যমে স্ত্রী পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হবে। এতে তার গর্ব অহংকার দূর হয়ে তার মধ্যে অনুশোচনা জাগতে পারে।

গ) সৎ উদ্দেশ্য আঘাত (Chastisement)-স্ত্রীকে সংশোধন করার শেষ চেষ্টা হিসাবে তাকে প্রতীকী প্রহার করার অনুমতি স্বামীর আছে। তবে এর কিছু নিয়ম ও বিধি নিষেধ আছে। এই ব্যবস্থা নেয়া যাবে যখন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সংশোধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই শেষ চেষ্টার সুযোগ কঠোর নিয়ম দিয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে যাতে স্বামী এর কোন অপব্যবহার করতে না পারে।

## ৩. সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে প্রহারের ব্যাপারে বিধি নিষেধ

প্রথমতঃ এ ধরনের প্রহার সত্যিকার যৌক্তিক কারণ ছাড়া করা যাবে না। স্ত্রীর মারাত্মক কোন অন্যায়ের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা অনুমোদিত। এই সুযোগ যে কোন রাগের বশে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার অধিকার স্বামীকে দেয় না। সংশোধনের প্রথম দু'টো ব্যবস্থা না নিয়ে এ কাজ করা যাবে না। তার উপর রাসূল (সাঃ)-এর হাদিসের ভিত্তিতে আইনবিদরা এ কাজের উপর কিছু কঠোর শর্ত দিয়েছেন যথা ঃ

ক. রাসূল (সাঃ)-এর মতে, কোন মুসলমান অপরের মুখে আঘাত করতে পারবে না।

খ. যদি শৃঙ্খলার মারাত্মক লংঘনও হয় তবুও কোন মুসলমান অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে এর জবাব দিতে পারবে না।

গ. স্ত্রীকে এমন ভাবে প্রহার করতে হবে যাতে তার গায়ে কোন দাগ না পড়ে অথবা কোন জখম না হয়।

এসব বিধি নিষেধ শুনে রাসূলের সাহাবী আতা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে স্ত্রীকে কি দিয়ে আঘাত করতে হবে। জবাবে রাসূল (সঃ) বললেন, "মেছওয়াক দিয়ে।" মেছওয়াক হচ্ছে দাঁত মাজায় ব্যবহৃত কাঠি যা টুথব্রাসের সমান আকারের। এই হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীকে প্রহারের বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রতীকী। এর উদ্দেশ্য স্ত্রীকে সচেতন করা যে সে অবিলম্বে সংশোধন না হলে তালাক অনিবার্য। এছাড়াও প্রায় সব আইনবিদ একমত যে, এই প্রহার বাদ দেয়াই উত্তম। বিশেষভাবে যেখানে এর বিরূপ ফল হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধনের এ প্রক্রিয়ার ফল ভাল হতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় স্ত্রী সুপথে আসলে কুরআন স্বামীকে আদেশ করে স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিতে এবং তার এই ভুলের কোন খোঁটা ভবিষ্যতে স্ত্রীকে না দিতে।

## ৪. তালাক এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রহারের তুলনা

তালাক এবং প্রহার দু'টোকেই ইসলামে প্রথম নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একেবারে উপায়হীন হলে অগত্যা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। রাসূল (সঃ) মুসলমানদের আদেশ করেন স্ত্রীদের প্রতি সদয় হতে। তিনি বলেন, "স্ত্রীরা হচ্ছে স্বামীর কাছে আল্লাহর আমানত, তারা যেন এই আমানতের কোন ক্ষতি না করে।" একবার কয়েকজন মহিলা তার কাছে এই নালিশ নিয়ে এল যে তাদের স্বামীরা তাদের প্রহার করে। তখন রাসূল (সঃ) বললেন যে, "এই স্বামীরা আমাদের মাঝে উত্তম নয়।" তিনি আরও বলেন, "তোমাদের মাঝে সেই উত্তম যে পরিবারের প্রতি উত্তম আর আমি আমার পরিবারের প্রতি উত্তম।" বস্তুত রাসূল (সঃ) তাঁর গোটা জীবনে কখনও তাঁর স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলেননি।

## ৫. স্বামী অন্যায় করলে স্ত্রীর অধিকার

বাস্তবে স্বামীরা শারীরিকভাবে স্ত্রীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী থাকে। ফলে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রহার করার সুযোগ বাস্তবিকই নেই। তাছাড়া যেহেতু স্বামী পরিবার প্রধানের দায়িত্বে সেহেতু সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্ত্রী তাকে প্রহার করলে উল্টো তালাকের সম্ভাবনাই বাড়বে। এতে প্রহারের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে। তারপরও যদি স্বামী সত্যিই অন্যায় করে এবং স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর হয় তবে তার বিষয়ে স্ত্রী নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে পারবে ঃ

ক. সে তাকে কোমলভাবে যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে পারবে।

খ. তার প্রতি স্বামীর বিরাগ এবং নিষ্ঠুরতার কারণ খুঁজে তা দূর করতে পারে। এক্ষেত্রে দু'পক্ষই ছাড় দিয়ে আপোষে আসতে পারে।

গ. সে বিচারকের কাছে নালিশ করতে পারে। বিচারক (মালেকী মতে) স্বামীকে সংশোধন হতে আদেশ করবে। স্বামী সংশোধিত না হলে বিচারক সাময়িকভাবে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে। এতেও স্বামী পথে না আসলে তাকে জেল বা দৈহিক শাস্তি দিতে পারে।

ঘ. সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেবার প্রক্রিয়া করতে পারে।

## ৬. স্বামী স্ত্রী দু'জনেই অন্যায় করলে

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্যায় করার অভিযোগ তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে চতুর্থ সূরার ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে তারা দু'জনে তাদের পরিবার থেকে অথবা বন্ধুদের থেকে বিচারের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবে। হানাফী এবং শাফেয়ী আইনবিদরা বলেন যে মধ্যস্থতাকারীরা শুধু সমঝোতার প্রস্তাব দিতে পারবে। আর ইবনে আব্বাস বলেন যে তারা যদি সমঝোতার কোন পথ না দেখেন তবে বিয়ে ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। যেহেতু ঐ আয়াতে বিয়ে ভাঙ্গার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি সেহেতু বোঝা যায় যে মধ্যস্থতাকারীরা শুধু সুপারিশ করতে পারবেন।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৪ঃ৩৪-৩৫

প্রশ্ন-৪ ঃ রাসূল (সঃ) স্ত্রীদের প্রহার করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা কি এতে লজ্জা বোধ করনা, যে তোমরা দিনে স্ত্রীদের প্রহার করে রাতে তাদের সাথে মিলিত হতে চাও!"

প্রশ্ন-৫ ঃ আল কুরআন ৯ঃ৭১ এই আয়াতে নারী পুরুষকে পরস্পরের সাহায্যকারী হিসেবে বলা হয়েছে। তারা সৎকাজে পরস্পরকে উৎসাহিত করবে।

আল কুরআন ৪ঃ১২৮।

প্রশ্ন-৬ ঃ যদিও কুরআন বলেছে এই মধ্যস্থতাকারী উভয়ের পরিবার থেকে আসবে তবুও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও একাজে লাগানো যাবে। কুরআন পরিবারের সদস্যদের কথা এজন্যে বলেছে যে তারা এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হবে এবং সমস্যা সম্পর্ক ভাল জ্ঞান রাখবে।

# জি-৪৫ বিয়ে বিচ্ছেদ (তালাক) -১

**প্রশ্ন ঃ**

১. সাধারণত এটা ধারণা করা হয় যে ইসলামে তালাকের একমাত্র অধিকার স্বামীর- এটা কি ঠিক?
২. কোন কোন পরিস্থিতিতে স্ত্রী এককভাবে স্বামীকে তালাক দিতে পারে?
৩. কোন কোন প্রেক্ষিতে একজন মুসলিম স্ত্রী কোর্টের মাধ্যমে স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারে?
৪. কখন স্বামী স্ত্রী যৌথ সম্মতিতে তালাক দিতে পারে?
৫. মুসলিম স্ত্রীদের স্বামীর মত তালাকের একক ও একচ্ছত্র অধিকার নেই কেন?
৬. ইসলামী আইনে স্বামী বা স্ত্রী কারোরই কোর্টের মাধ্যমে তালাক নেবার বাধ্যবাধকতা নেই কেন?
৭. কোন কোন অবস্থায় তালাক কার্যকরী হয়?
৮. কোন কোন রাগত অবস্থায় স্বামী কর্তৃক উচ্চারিত তালাক শব্দ কার্যকর হয়না?
৯. কোন সময় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না?

**উত্তর ঃ**

### ১. তালাকের অধিকার প্রসঙ্গে

ইসলামে স্বামীর তালাকের একক অধিকারকে কয়েকটি প্রেক্ষিতে স্ত্রীকে তালাক পাওয়ার একক অধিকার দিয়ে সমতা কায়েম করা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী আদালতের মাধ্যমেও তালাক প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। তাছাড়া স্বামী স্ত্রী পরস্পর সম্মতিতেও পৃথক হতে পারে। কাজেই অসুখী বিয়ে সম্পর্ক তালাকের মাধ্যমে শেষ করার কার্যত সমান অধিকারই স্ত্রীর আছে।

### ২. যেসব অবস্থায় স্ত্রী এককভাবে স্বামীকে তালাক দিতে পারে

ক. **আইসিমা**- বিয়ের সময় বা তারপর স্বামী তার তালাকের একক অধিকার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার নাম আইসিমা।
খ. **শর্তযুক্ত অধিকার–** এ ক্ষেত্রে কাবিননামা স্বাক্ষরের সময় স্ত্রী কিছু শর্ত আরোপ করতে পারে যা ভঙ্গ হলে সে তালাক দিতে পারবে।

### ৩. যেসব প্রেক্ষিতে স্ত্রী কোর্টের মাধ্যমে তালাক চাইতে পারে

ক. স্ত্রীকে ভরণপোষণ অক্ষম হলে অথবা অস্বীকার করলে (স্ত্রী যদি ধনী হয় তবুও তাকে পূর্ণ ভরণপোষণ দিতে স্বামী বাধ্য)।

খ. দুর্ব্যবহার (যার অন্তর্ভুক্ত আছে প্রহার করা, গালি গালাজ করা, অথবা তাকে অন্যায় কাজ করতে চাপ দেওয়া)।

গ. স্বামী পুরুষত্বহীন হলে (স্ত্রীর বৈধ যৌন চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে)।

ঘ. স্বামী উন্মাদ হলে অথবা তার দূরারোগ্য/ ছোঁয়াচে রোগ হলে

ঙ. দীর্ঘ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে ঃ

(i) যদি স্বামীর অবস্থান জানা যায়,.তবে তালাক কার্যকরী হবার পূর্বে তাকে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়।

(ii) যদি স্বামীর ঠিকানা জানা না থাকে, তবে স্ত্রীকে ৬ মাস থেকে ১ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে স্বামী ফিরে না আসলে সে স্বামী থেকে তালাক হয়ে যাবে।

চ. স্বামীর দীর্ঘ দিনের জন্য জেল হলে।

ছ. বিয়ের সময় স্বামী নিজের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিলে অথবা নিজের কোন দুর্বলতা গোপন করলে।

## ৪. পারস্পরিক সম্মতিতে তালাক

১. পারস্পরিক সম্মতিতে তালাকের দু'টো পদ্ধতি আছে ঃ

ক. মোবাররা– যেখানে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করতে পরস্পর সম্মত হয়। আর্থিক এবং অন্যান্য বিষয়ে তারা একমত হয়।

খ. খোলা তালাক (একতরফা তালাক)– যেখানে স্বামীর ব্যবহারে স্ত্রী অসুখী থাকে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে সে ভীত হয়। এ অবস্থায় স্ত্রী একতরফাভাবে স্বামীকে মোহরানার অর্থ ফেরৎ দিয়ে তালাক নিতে পারে।

### খোলা তালাকের শর্ত ঃ

(i) এই তালাক চাওয়ার যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে।

(ii) স্বামী এ তালাক মানতে বাধ্য।

(iii) কোন স্বামী মোহরানার টাকা ফেরৎ পাওয়ার লোভে স্ত্রীকে খোলা তালাক নিতে চাপ দিতে পারবেনা।

(iv) এই তালাক যে কোন সময় নেয়া যাবে।

## ৫. মুসলিম স্ত্রীদের একচ্ছত্র ও একক তালাকের অধিকার নেই কেন

ইসলামী আইন স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ব্যর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক অবসানে তালাক নেবার সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগের পদ্ধতিতে উভয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম স্ত্রীকে তালাকের নিঃশর্ত ও একক অধিকার দেয়নি কারণ এর কিছু ক্ষতিকর প্রভাব তার এবং

পরিবারের উপর পড়তে পারে। যেমন ঃ

ক. বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থায়িত্ব। স্বামীরা যেমন স্ত্রীদের আবেগ তাড়িত হয়ে তালাক দিতে পারে, মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ভুলের আশঙ্কা আরও বেশি। কাজেই যদি স্ত্রীর তালাকের একক অধিকার থাকত তবে আবেগের বশে সে তালাক দিয়ে পরে হয়ত আফসোস করত।

খ. স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তালাকের প্রতিক্রিয়ায় কষ্ট পায় (বিশেষ করে মানসিকভাবে)। তবে স্বামীকে এ কষ্টের অতিরিক্ত আর্থিক খরচের বোঝাও বইতে হয়। মোহরানার সমস্ত টাকা তাকে পরিশোধ করতে হয়। ইদ্দতকালীন সময়ে (যা তিন মাস থেকে ৯ মাস পর্যন্ত হতে পারে) স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে হয়। ছোট সন্তান যদি স্ত্রীর কাছে থাকে তবে তাদের ভরণপোষণ করতে হয়। কোন কোন আইনবিদের মতে স্ত্রীকে আরও এক বছরের (ক্ষতিপূরণ) ভরণপোষণ দিতে হয়। স্বামীর উপর এত আর্থিক লোকসানের বোঝা তার দ্বারা স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিরুদ্ধে একটি নিবারক (Deterrant) হিসেবে কাজ করে। যেহেতু মেয়েদের এমন আর্থিক লোকসানের আশংকা নেই সেহেতু তাদের নিঃশর্ত তালাকের সুযোগ দিলে এর অপব্যবহার হতে পারত। একক তালাকের অধিকার না থাকাটা মেয়েদের তালাক পাওয়ার সুযোগ কেড়ে নেয়নি। যৌক্তিক যে কোন প্রয়োজনে সে তালাক নিতে পারে।

## ৬ আদালতের মাধ্যমে তালাক

যদি স্বামী স্ত্রী দু'জনেই তালাকের ব্যাপারে সম্মত থাকে (যেমন, মুবাররা) তবে এ বিষয়ে আদালতের কিছুই করার নেই। ইসলামী আইন তালাক প্রক্রিয়াকে আদালতের আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতায় ফেলতে চায়না। আদালতের আর একটা অসুবিধে হচ্ছে যখনই কোন তালাকের বিষয় মোকদ্দমায় গড়ায় তখনই স্বামী-স্ত্রী দুই পক্ষ হয়ে যায়। তখন তর্কের খাতিরে তর্ক ও বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা উভয়ের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে পুনর্মিলনের সকল সুযোগ দূর করে দেয়। তালাক প্রক্রিয়ায় আইনগত বিষয় জড়িত হলে অবশ্যই আদালতে যেতে হবে। তবে সাধারণতঃ তালাক একটি ব্যক্তিগত বিষয়। যার সমাধান স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে হওয়াই উত্তম। না হলে পরিবারের সাথে জড়িত অনেক অপ্রিয় গোপন কথাও আদালতের মাধ্যমে চারিদিকে প্রচারিত হবে।

## ৭. তালাক কার্যকর হবার শর্ত ঃ

ক. স্বামী কর্তৃক তালাক শব্দের উচ্চারণ হতে হবে অত্যন্ত সচেতন ও সুস্থ মস্তিষ্কে। কেউ তাকে এ কাজে প্ররোচিত বা বাধ্য করলে চলবে না।

খ. মৌখিক, লিখিত অথবা দূত মারফত যেভাবেই তালাক দেয়া হোক তালাকের বিষয়টি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লিখিত হতে হবে।

গ. কতগুলো অবস্থায় তালাকের কথা উচ্চারণ করা যায় না। তালাক মৌখিকভাবে দিলেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তা অকার্যকর হয় ঃ

(i) স্বামী মদ বা ওষুধের প্রভাবে তালাক দিলে।

(ii) স্বামী যদি এ স্বভাবের হয় যে প্রায়ই স্ত্রীকে এ ধরনের কথা বলে যা সে আসলে বোঝায় না। তবে এ ধরনের স্বামী তালাকের কথা বললে তার কাফফারা হিসেবে ১০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে অথবা তিনদিন রোযা রাখতে হবে।

(iii) চরম আবেগ তাড়িত বা শোকাহত অবস্থায় যখন মানুষ বোঝে না যে সে কি বলছে।

## ৮. যে সব রাগান্বিত অবস্থায় তালাক হয় না

প্রখ্যাত আইনবিদ ইবনে আল কাইউম রাগান্বিত অবস্থার শ্রেণী বিভাগ করেছেন এভাবে ঃ

ক. চরম রাগের মুহূর্তে যখন মানুষ অর্থহীন কথা বলে বা সে জানেনা তার উচ্চারিত কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য। এসব সময়ে তালাকের কথা উচ্চারণ করলেও তা কার্যকর হবে না।

খ. মাঝারি ধরনের রাগ– সাধারণতঃ মানুষ রাগের সময়ই তালাক দেয়। তবে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া তালাকের কথা রাগত অবস্থায় উচ্চারণ করলে তালাক হবে।

গ. আর এক ধরনের রাগত অবস্থার কথা বলা হয়েছে যার বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত আছে। তা হচ্ছে যখন স্বামী রাগের মাথায় তালাক দিয়ে তারপর অনুতপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আইনবিদরা তালাককে অকার্যকর বলেন। কারণ–

(ii) রাসূলের একটি হাদিস আছে যে মানুষ রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হয় না।

(iii) এটা কুরআনের এক মূলনীতি যে আল্লাহ মানুষকে অনিচ্ছাকৃত কোন উচ্চারণের জন্য দোষী করবেন না।

(iii) এই মাঝারি ধরনের রাগকে মাদকাসক্ত অবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

(iv) ইসলামের বিয়ের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্ককে স্থায়ী করা। কাজেই এটা টিকিয়ে রাখার সব সুযোগ দম্পতিকে দিতে হবে।

## ৯. যে সব সময় তালাক দেয়া যায় না

মানুষ নিম্নলিখিত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না ঃ

ক. যখন স্ত্রীর মাসিক ঋতুস্রাব চলতে থাকে (যদিও এ সময় স্ত্রী খোলা তালাক দিতে পারেন)।

খ. মাসিক ঋতুস্রাব শেষে স্বামী যদি তার সাথে মিলিত হয়। এ অবস্থায় পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত তাকে তালাক দেয়া যাবে না।

গ. সন্তান জন্মের অব্যাবহিত পর (সাধারণতঃ সন্তান জন্মের পর একমাস)

এসব সময়ে তালাক দেয়া সুন্নাহ বিরোধী। আইনবিদরা এসব সময়ের তালাককে নাকচ করে দেন।

## সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-৪ ঃ আল কুরআন ২ঃ২২৯, ৪ঃ১৯

রাসূল (সঃ) সাবিত ইবনে কায়েসকে তাঁর স্ত্রীর মোহরানার অর্থ ফেরত নিয়ে তাকে বিবাহ বন্ধন মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন-৮ ঃ হাদিস, "শুধুমাত্র সচেতন ঐচ্ছিকভবে দেয়া তালাকই তালাক।"

# জি– ৪৬ বিয়ে বিচ্ছেদ (তালাক)-২

**প্রশ্ন ঃ**

১. কয়েকটি অবস্থায় তালাক নিষেধ কেন?
২. তালাক শব্দ উচ্চারণের সব পূর্বশর্ত মেনে তালাক দেয়া হলে তা কি সাথে সাথে কার্যকর হবে?
৩. তালাক এর পরে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে (ইদ্দত) স্ত্রী কোথায় থাকবে এবং কে তার ভরণপোষণ করবে?
৪. তালাকের পর স্ত্রী কি পুনর্বিবাহ করতে পারে?
৫. একই স্বামী তৃতীয়বারের মত স্ত্রীকে তালাক দিলে তাদের পুনর্মিলনের আর কোন সুযোগ কি থাকে না?
৬. তালাকের পর স্ত্রীর আর্থিক অধিকার ও সন্তানকে নিজের কাছে রাখার ইচ্ছার কোন স্বীকৃতি ইসলামে আছে কি?

**উত্তর ঃ**

## ১. কয়েকটি অবস্থায় তালাক নিষেধ কেন

মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তাদের তালাক দেয়া নিষেধ কয়েকটি কারণে–

ক. কুরআন মতে মেয়েরা এ সময় এমনিতেই একটু কষ্টের মধ্যে থাকে। এ অবস্থায় তাদের উৎকণ্ঠা ও দুঃখ আরও বাড়ানো হবে অমানবিক।

খ. এ সময় স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে না। অন্তরঙ্গ মিলনের সুযোগ না থাকার কারণেও স্বামীর মাথায় তালাকের মত চিন্তা আসতে পারে। তাই এই সুযোগ রদ করা হয়েছে।

এ সময়ের স্বামীর তালাকের ইচ্ছা ব্যক্ত করাও নিষিদ্ধ। সন্তান জন্মের অব্যাবহিত পর তালাক দেয়াও একই কারণে নিষিদ্ধ। তাছাড়া এ সময় একজন নারী এবং তার শিশুর দৈহিক ও মানসিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সময়েও স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে না।

মাসিক ঋতুস্রাবের পর স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে এই মিলনের ফলে সন্তান জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তী ঋতুস্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাক নিষেধ। স্ত্রী গর্ভবতী হবার বিষয়টি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে আরও সহজ করে দিতে পারে। তাছাড়া সন্তানের পিতৃ পরিচয়ও নিশ্চিত করা এর উদ্দেশ্য। গর্ভাবস্থায়ও কোন মহিলাকে তালাক দেয়া যাবে না। যদিও এ সময় তালাকের পরিকল্পনার কথা তাকে জানানো যাবে।

ইসলামী আইনে শুধু মাত্র মাসিক ঋতুস্রাবের পর নির্মল সতেজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন না করে তালাক দেয়া যাবে।

## ২. তালাকের পর অপেক্ষার সময় (ইদ্দত)

তালাক শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই তা কার্যকর হয়ে যায় না। এর পর ইদ্দত নামক অপেক্ষার সময় থাকে। এটা হচ্ছে মহিলাদের তিনটি মাসিক ঋতুস্রাবের সমান সময়

(তিন মাস) যদি এই তিন মাসে নারী সন্তান ধারণের বিষয়টি ধরা পড়ে তবে এটা নয় মাস পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। খোলা তালাকের ক্ষেত্রে অথবা মাসিক ঋতুস্রাবের পর পরই স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই যদি তালাক দেওয়া হয় তবে কোন ইদ্দত পালন করতে হয় না। এই ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি এমন কিছু হয়ে যায় তবে তালাক বাতিল হয়ে যায় এবং স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়।

## ৩. ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর আবাসন ও ভরণপোষণ

কুরআন মতে এটা নিশ্চিত যে, তালাকের পর ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রী তার পূর্বের বাড়িতেই অবস্থান করতে পারবে। তাকে জোর করে ঘর থেকে বের করা যাবে না। এমনকি তার নিজের পক্ষেও অহেতুক ঘর ছাড়া ঠিক নয়; এই সময় সে স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ ভরণপোষণ ও ভাল ব্যবহার প্রাপ্য। তালাকের পর স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে থাকার সুযোগ এবং স্বামীর কাছ থেকে তার ভরণপোষণ দেয়ার ইসলামের লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

ক. অপেক্ষার এই সময়টি স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার এক পরীক্ষা এবং এটা হয়ত তাদের পুনর্মিলন ঘটাতে পারে। যদি স্বেচ্ছায় এমন পুনর্মিলন ঘটে তবে স্বামী স্ত্রীকে নতুন করে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে না বা আদালতে কোন আবেদন করতে হবে না। যদিও এই পুনর্মিলনকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করাই উত্তম।

খ. এই অপেক্ষার সময়ে স্ত্রীর সন্তান ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

গ. সর্বশেষে এই অপেক্ষার সময়টি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সময় হিসাবে কাজ করে যা স্বামী স্ত্রীকে পৃথকভাবে নতুন জীবন শুরু করবার পূর্বে দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের সময় দেয়।

উল্লেখ্য যে এই অপেক্ষার সময় দম্পতি পরস্পরের স্বামী স্ত্রী হিসাবেই আইনত গণ্য হবেন। যদি এর মধ্যে দু'জনের যে কোন একজন মারা যান তবে অপরজন তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন।

## ৪. তালাকের পর পুনঃবিবাহ

তালাকের পর ইদ্দত শেষ হলে ইসলাম নতুন করে বিয়ের অনুমতি দেয়। ইসলাম তালাক প্রাপ্ত ব্যক্তির বিয়ের ব্যাপারে কোন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় না। যদিও অনেক সমাজেই এটাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। বরং ইসলাম প্রত্যেককে বিয়ে করে (অন্য ব্যক্তিকে অথবা আগের সাথীকে) নতুন জীবন শুরু করবার সুযোগ দেয়। যদি আগের স্বামীর সাথেই বিয়ে হয় তবে নতুন করে বিয়ে চুক্তি করতে হবে এবং মোহরানা দিতে হবে। এভাবে যে কোন দম্পতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার এ ধরনের পুনর্বিবাহের সুযোগ পাবে। ইসলাম যে কোন মূল্যে স্বামী স্ত্রীকে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চায়। সে জন্য স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনের এত সুযোগ এখানে রাখা হয়েছে।

### ৫. স্থায়ী তালাক

যদি কোন মহিলা তার স্বামী কর্তৃক তিনবার তালাক প্রাপ্ত হয় তবে তা হবে এক জটিল সমস্যা এটা তখন স্পষ্ট হয় যে, এই দম্পতির পুনর্মিলনের সুযোগ নেই অথবা তাদের যে কেউ বিয়েকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না। এ অবস্থায় তালাকের মর্যাদা রক্ষার্থেই এই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্থায়ী ভাবে শেষ হবে। তারা আর পুনরায় নিজেদের মধ্যে বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবেনা। যদি উক্ত স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয় এবং নতুন স্বামী যৌক্তিক ভাবে স্ত্রীকে তালাক দেন অথবা মারা যান তবে উক্ত মহিলা নতুন করে তার প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে মিলিত হতে পারবেন।

### ৬. তালাকের পর স্ত্রীর আর্থিক অধিকার ও সন্তানকে নিজের কাছে রাখা প্রসঙ্গে

বিয়ে হয়েছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হয়নি– এমতাবস্থায় যদি তালাক হয়ে যায়, তবে স্ত্রী মোহরানার অর্ধেক পাবে। অন্যথায় স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে ঃ

ক. মোহরানার পূর্ণ অংশ পাবে।
খ. বাগদান ও বিয়ের সময়ে প্রাপ্ত সকল উপহারাদি স্ত্রীর।
গ. ইদ্দতের সময়ে (৩ বা ৯ মাস) ভরণপোষণ পাবে।
ঘ. সন্তানকে স্তন্যপান করানোর সময়ে সন্তানের বাবা থেকে আর্থিক অধিকার পাবে।
ঙ. কিছু সান্ত্বনা উপহার (কারো মতে তা দিলে উত্তম, কিন্তু অন্যেরা বলেন যে এটা বাধ্যতামূলক)।

ইসলামী আইনে ছোট সন্তানের (সাধারণতঃ সাত বছরের কম বয়স হলে) তত্ত্বাবধান/ হেফাজত (Custody)-র দায়িত্ব মায়ের দিকে বেশি ঝুঁকে। কন্যাদের বা বিয়ে পূর্ব পর্যন্ত কন্যাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মায়ের হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত, যাতে মা তাকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে। তবে দু'টি শর্ত রয়েছে যথা ঃ

ক. মায়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যোগ্যতা ও ভাল সুনাম থাকা এবং
খ. মা অবিবাহিতা থাকা। এ শর্তটি এসেছে রাসূল (সঃ)-এর একটি হাদিস থেকে, সেখানে তিনি মায়ের বিবাহিতা হওয়া ও সন্তানের স্বার্থবিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন।

তবে সাধারণত (Custody) বা বাচ্চাদের হেফাজতকারী হিসেবে ইসলামে মা-কে অথবা তার নিকটের আত্মীয়দেরকে (যদি মা-কে না পাওয়া যায় একাজে) উত্তম হিসেবে বিবেচনা করেন।

### সূত্র নির্দেশিকা ঃ

প্রশ্ন-২ ঃ আল কুরআন ৬৫ঃ৬, ২ঃ২২৮, ৬৫ঃ৪, ৩৩ঃ৩৯

প্রশ্ন-৩ ঃ আল কুরআন ৬৫ঃ৬, ৬৫ঃ১

প্রশ্ন-৬ ঃ আল কুরআন ২ঃ২৩৭, ২ঃ২৩৬, ২ঃ২৪১

যেখানে উল্লেখ আছে যে, স্বামীকে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে 'মতন' উপহার প্রদান করবে/ বা করতে হবে।

## দি পাইওনিয়ার-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেন : 'ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরি ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীনের (ইসলাম) জ্ঞান লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার অধিবাসীদের সতর্ক করত, যেন তারা অনৈসলামিক নীতি পরিত্যাগপূর্বক সঠিক নীতি অবলম্বন করতে পারে' (সূরা তওবা, আয়াত-১২২)। রাসূল (সঃ) বলেছেন : 'আল্লাহ যার মাধ্যমে কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।' এছাড়া কুরআনের আরও অনেক আয়াত এবং রাসূল (সঃ)-এর হাদিস ইসলামের জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের তাগিদ দিয়েছে। দুঃখজনক হলো সীমাহীন গুরুত্বের তুলনায় এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ অপর্যাপ্ত। মিডিয়ার একটি অংশ কর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যার বিপরীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে মানবতার সামনে যুক্তিগ্রাহ্য ও সুস্পষ্ট করতে যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার সেটি দেয়া হচ্ছে না। অথচ ইসলামের অগ্রগতি ও সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে বর্তমান বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপর। এ বাস্তবসম্মত প্রয়োজনের তাগিদেই মূলতঃ *দি পাইওনিয়ার*-এর পথচলা শুরু। এক যুগ ধরে প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী ছাত্র-যুবকদের নিয়ে কাজ করে বর্তমানে *দি পাইওনিয়ার* সুধীমহলের নিকট একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন হিসেবে সুপরিচিত।

ইসলামের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন, মৌলিক গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, মুসলিম বিশ্বের প্রধান লেখকদের প্রধান পুস্তকসমূহের অনুবাদ প্রকাশ *দি পাইওনিয়ার*-এর লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া *দি পাইওনিয়ার* পড়া, লেখা ও দাওয়াতী কাজ (Read Read Read, Write Write Write, Dawah Dawah Dawah)-কে শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেছে। গোঁড়ামিমুক্ত মধ্যমপন্থা নীতির চর্চা, ইসলামী মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা সৃষ্টি, নারী অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সচেতনতা এবং প্রকৃত মানবাধিকারের দাবির প্রতি উচ্চকিত হওয়া - এসকল কারণে *দি পাইওনিয়ার*-এর কার্যক্রমের পরিধি বেড়েছে। বর্তমান বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে *দি পাইওনিয়ার* মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তৌফিক কামনা ও জনগণের সহানুভূতি আশা করে।

## দি পাইওনিয়ার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. Gender Issue : An Islamic Approach
Editor : Md. Mahmudul Hasan

২. ইসলামের সামাজিক বিধান
জামাল আল বাদাবী
অনুবাদ : ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম

৩. মুহম্মদ আসাদ : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

৪. ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিধান
জামাল আল বাদাবী
অনুবাদ : ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম

৫. জামাল উদ্দীন আফগানী : নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ
সম্পাদনা : কাহহিদ-উর-রহমান